একশত
বৈজ্ঞানিক
আবিষ্কারের
কাহিনী
সুধাংশু পাত্র

একশত
বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী

সুধাংশু পাত্র

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

উৎসর্গ

বিজ্ঞানের প্রথম পাঠকদের

আমাদের প্রকাশিত এই লেখকের অন্যান্য বই

ভারতের মহাকাশ গবেষণা ও অগ্নি
পশুপাখী ও পতঙ্গদের গপ্‌পো
সভ্যতার আদিপর্বের আবিষ্কার ও তৎপরতা
বিজ্ঞানের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত
জীবজগতের বিস্ময়
পদার্থ বিজ্ঞানের সহস্র জিজ্ঞাসা
মহাকাশ বিদ্যা ও কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থা
বিজ্ঞানী প্রসঙ্গ
বিজ্ঞানী চরিতকথা
বিজ্ঞানের অমর প্রতিভা
মনের মতো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের গপ্‌পো
ভৌগোলিক আবিষ্কার ও অভিযান
ছোটদের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা
বিশ্ব পরিবেশ ও মানুষ
জীবনের জয়যাত্রায় মানুষ
আজকের বিজ্ঞান-জিজ্ঞাসা
বিজ্ঞানের সহজপাঠ
খাদ্য, পুষ্টি ও পরমায়ু
মহাসাগরের মহাবিস্ময়

ভূমিকা

পাঠকদের কাছে আমার 'আবিষ্কারের কাহিনী' বইটি একদিন যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছিল। কিন্তু অসুবিধাবশত বইটির পুনর্মুদ্রণ যথাসময়ে হতে পারেনি। তাছাড়া বইটিতে প্রথম মুদ্রণের ত্রুটি কিছু ছিল।

বর্তমান সংস্করণে বইটির কতকগুলো কাহিনীর কিছুটা পরিবর্তন করা হয়েছে। কয়েকটি পরিত্যাগ করা হয়েছে এবং কিছু কাহিনী যুক্তও করা হয়েছে। পূর্বের ত্রুটিগুলিকে যথাসম্ভব সংশোধন করে 'একশত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী' নামে প্রকাশ করায় 'দেজ পাবলিশিং'-এর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।

বৈজ্ঞানিক তথ্যের দিক থেকে যাতে ত্রুটি না থাকে তার জন্য যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবু অসাবধানতাবশত যদি কোন ত্রুটি থেকে গিয়ে থাকে এবং সহৃদয় পাঠকমণ্ডলীর দৃষ্টিগোচরে আসে, তাহলে তাঁরা ত্রুটিটুকু উল্লেখ করে পত্র লিখলে বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং পরবর্তী সংস্করণে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবো তাঁদের ঋণ।

বিনীত
লেখক

কালিন্দী, মেদিনীপুর।

সূচীপত্র

✪ উদস্থিতিবিদ্যার সূত্র ✪

যীশুখ্রীষ্টের জন্মের প্রায় আড়াইশ' বছর আগেকার কথা।

গ্রীস দেশে সাইরাকিউস নামে একটি রাজ্য ছিল। সেখানকার রাজার নাম ছিল হিয়ারো। হিয়ারো যেমন ছিলেন খেয়ালী, তেমনই ছিলেন খুঁতখুঁতে।

কাউকে বড় একটা বিশ্বাসও করতেন না।

একবার হিয়ারোর মাথায় খেয়াল চাপলো, ভারি চমৎকার একটা সোনার মুকুট গড়াবেন। কিন্তু কাকে দেবেন এই ভার!

অনেক খুঁজে এবং অনেক ভেবে চিন্তে শেষ পর্যন্ত এক বুড়ো স্যাকরাকে মুকুট তৈরির ভার দিলেন। যথাসময়ে স্যাকরা মুকুটও দিয়ে এলো এবং মুকুট পছন্দও হল রাজার। কিন্তু সেই যে সন্দেহ—স্যাকরা সোনার সঙ্গে খাদ মেশায়নি তো!

খুব করে ভাবলেন রাজা। তারপর বন্ধু আর্কিমিদিসকে ডেকে পাঠালেন। বন্ধু আসতেই তাঁর হাতে মুকুটটা দিয়ে বললেন—শুনেছি, স্যাকরারা নাকি মহা ঠগ! সোনা দেখলে খাদ মেশানোর জন্য তাদের নাকি হাত নিসপিস করে! দেখুনতো মুকুটটাতে কত খাদ মিশিয়েছে! তবে হ্যাঁ, ভাঙা চলবে না। ওটা আমার ভারি পছন্দ।

মহাফাঁপরে পড়লেন আর্কিমিদিস। খাঁটি সোনা চেনার কোন উপায় তাঁর জানা ছিল না। তবু সরাসরি 'না' বলতে পারলেন না তিনি। বললেন—সোনার খাদের পরিমাণ নির্ণয় করার বিদ্যে আমার জানা নেই মহারাজ! তবে কয়েকটা দিন সময় পেলে একটা উপায় হয়ত খুঁজে বার করতে পারবো। ঈষৎ হেসে রাজা বললেন—ঠিক আছে! আমি আপনাকে একমাস সময় দিলাম। তবে হ্যাঁ, না পারলে কিন্তু শাস্তি আপনাকে নিতেই হবে। আর কৃতকার্য হলে অবশ্যই আপনাকে পুরস্কৃত করবো।

গোমড়া মুখে বাড়ী ফিরলেন আর্কিমিদিস।

দিন যায়। নির্দিষ্ট দিনটি যত কাছে এগিয়ে আসতে থাকে ততই তাঁর চিন্তা আরও বেড়ে ওঠে। সে কী চিন্তা! খেতে বসার সময় ভাবেন, ঘুমোতে গেলে ভাবেন, এমনকি কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলেও অন্যমনস্ক হয়ে পড়েন। ভাবতে ভাবতে এই ক'দিনে আর্কিমিদিসের শরীরটা শুকিয়ে যেন দড়ি হয়ে গেল।

রোজ একটা বড় চৌবাচ্চার জলে স্নান করতেন আর্কিমিদিস। সেদিনও চৌবাচ্চার জলে নেমে মুকুটের কথা ভাবছিলেন তিনি। হঠাৎ চৌবাচ্চার জলের আয়তন দেখে বিদ্যুৎপ্রবাহের মত একটা বুদ্ধি এসে গেল মাথায়। ভাবলেন,

জলে নামার ফলে চৌবাচ্চার জল অনেক উপরে উঠে গেছে। নিজেকে হালকাও মনে হচ্ছে অনেকখানি! অতএব কোন কিছুকে জলে ডোবালে সে নিশ্চয়ই কিছু না কিছু জল অপসারণ করবেই! আবার বস্তুর ওজনের সঙ্গে তার দ্বারা অপসারিত জলের ওজনের তুলনা করলে নির্ঘাৎ বস্তুটির ঘনত্ব নির্ণয় করে নেওয়া যাবে!

আনন্দে হাততালি দিতে দিতে একরকম লাফ দিয়ে চৌবাচ্চা থেকে নেমে এলেন আর্কিমিদিস। তারপর ছুট, ছুট, ছুট—বেদম ছুট—সেই রাজসভার দিকে। ছুটতে ছুটতে পরনের ভিজে কাপড়খানা কখন রাস্তায় খসে পড়লো, তাতেও হুঁস হলোনা তাঁর। মুখে চিৎকার "ইউরেকা", "ইউরেকা"। অর্থাৎ "আমি পেয়েছি", "আমি পেয়েছি"।

চিৎকার শুনে ছুটে এলেন রাজা। বন্ধুর দিগম্বর মূর্তি দেখে রাজা খুব একচোট হেসে নিলেন মনে মনে। ভাবভোলা বন্ধুটিকে ভালভাবেই তিনি চিনতেন। তাই কিছু না বলে পাশের অনুচরটিকে কী একটা সঙ্কেত করলেন। অনুচরটি তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে একখানা কাপড় এনে জড়িয়ে দিল আর্কিমিদিসের কোমরে। আর এতক্ষণে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন আর্কিমিদিস।

এবার আর্কিমিদিস করলেন কী! সোনার মুকুটটিকে নিলেন এবং তাকে ওজন করে ও পরে জলে ডুবিয়ে অপসারিত জলের ওজন নিলেন। এবার দু ওজনের তুলনা করে ঘনত্ব নির্ণয় করলেন মুকুটের। তারপর কিছু পরিমাণ খাঁটি সোনাকে অনুরূপ জলে ডুবিয়েও সোনার ঘনত্ব নির্ণয় করে নিলেন।

সেদিন রাজার মুকুটের এইভাবে মীমাংসা হয়ে গেল। এবং বিজ্ঞানের কাছে ধরা পড়লো এক মহাসত্য। সত্যটি হলো, "কোন বস্তুকে সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে জলে অথবা অন্য কোন তরলে নিমজ্জিত করালে বস্তু তার নিজের আয়তনের সমান জলে কিংবা তরল অপসারণ করবে। নিমজ্জিত করানোর ফলে বস্তুর যে পরিমাণ ওজনের হ্রাস হয়, অপসারিত জলের ওজনও ঠিক ততখানি।

এই মহাসত্য একরকম আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করে আর্কিমিদিস বিজ্ঞানে অমর হয়ে আছেন। ঐ সূত্রটির জন্যই তাঁকে অভিহিত করা হয় "স্থিতিবিদ্যার জনক" নামে।

✪ দোলকের দোলনকাল ✪

এক ছিলেন তরুণ। বয়স সতের কী আঠার, রোজ বিকালে গির্জায় যেতেন প্রার্থনা করতে। প্রার্থনা শেষ হতে রাত হয়ে যেতো।

যে সময়কার কথা বলা হচ্ছে, সে সময় বৈদ্যুতিক বাতির আবিষ্কার হয়নি। রাতে আলো জ্বালাতে হলে হয় লণ্ঠনের সাহায্য নিতে হতো, নতুবা মোমবাতি

জ্বালাতে হতো। রাত্রিকালে বড় বড় প্রাসাদে, কোন উৎসবে ও অনুষ্ঠানে, গির্জায় প্রভৃতিতে—যেখানে প্রচুর লোকসমাগম হতো সেখানে আলোকমালায় সুসজ্জিত করা হতো ঝাড়লণ্ঠন দিয়ে। কাচের তৈরি, দেখতে ভারি সুন্দর। চারপাশে অনেকগুলো গ্লাসের ভেতরে মোমবাতি জেবলে বসিয়ে দেওয়া হতো।

তরুণটি যে গির্জায় প্রার্থনা করতে যেতেন, সেখানেও ছিল একটা ঝাড় আলো। দড়ি দিয়ে কাড়কাঠ থেকে ঝুলে থাকতো সেটি। তরুণটি প্রতিদিন দেখতেন, সন্ধ্যার আঁধার নেমে এলেই গির্জার একজন কর্মী ঝাড়টি ধীরে ধীরে মেঝেতে নামাতেন। তারপর মোমবাতিগুলোকে জেবলে যথাস্থানে বসিয়ে দিয়ে পুনরায় উপরে তুলে দিতেন। ঐ সময়টা ঝাড় দোল খেতো এবং বিশ্রী একধরনের শব্দ ছড়াতো।

এই ব্যবস্থায়, অর্থাৎ ঝাড়ের দোল খাওয়া এবং ক্যাঁর-ক্যাঁর শব্দ ছড়ানোতে রপ্ত হয়ে উঠেছিলেন তরুণটি। সেদিন কী খেয়াল হলো তাঁর! কর্মীটি ঝাড় তুলে দিয়ে গেলে হাঁ করে একবার তাকালেন উপরের দিকে। দেখলেন, ঝাড়টা দুলে একটা বিশেষ দূরত্বে এসে পুনরায় বিপরীত দিকে ফিরে যাচ্ছে। বিপরীতে এসেও থেমে যাচ্ছে না—কিছু দূরত্ব অতিক্রম করার পর আবার পূর্বের মতই হচ্ছে।

ঝাড়টার ঐ দোলার ছন্দ তরুণটির মনকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেললো। তাঁর যেন মনে হলো, ঝাড়টা ওপাশে দিয়ে ফিরে আসতে প্রতিবারে একই সময় ব্যয় করছে। তাঁর ধারণাটা ঠিক কিনা জানার জন্য তরুণটি এবার হাতের নাড়ি টিপে দেখলেন। সত্যই তাই! প্রতিটি দোলন সম্পন্ন হতে একই সংখ্যকবার নাড়ির ধুকধুকানি হচ্ছে।

প্রার্থনা সেদিন মাথায় উঠলো তরুণটির। ছুটে এলেন বাড়ীতে এবং কোত্থেকে কতকগুলো ছোট বড় সীসের বল এনে সরু সরু সুতোয় বেঁধে দোলাতে আরম্ভ করলেন। পরিশেষে সিদ্ধান্তে এলেন, সুতোর দৈর্ঘ্য ঠিক থাকলে ভারি কিংবা হালকা যে কোন ধরনের বলকে দোলালে একবার দোলন সম্পূর্ণ করতে একই সময় লাগে।

এই তরুণটি আর কেউ নন, স্বয়ং গ্যালিলিও। যাঁকে গতিবিদ্যার জনক নামে অভিহিত করা হয়। আর ঐ ঘটনাটি তুচ্ছ হলে কী হবে, ঘটনাকে অবলম্বন করে গ্যালিলিও যা আবিষ্কার করে গেছেন—তা বিজ্ঞানে একটি চিরস্থায়ী সম্পদ হয়ে আছে।

✪ মরা ব্যাঙের নাচ ✪

অনেকদিন আগেকার কথা।

ইতালির বলোনা শহরে বাস করতেন এক অধ্যাপক। নাম তাঁর লুইজি গ্যালভানি। তার পত্নী লুসিয়া ছিলেন অত্যন্ত রুগ্না। প্রায়ই অসুখে ভুগতেন

এবং দারিদ্র্যের জন্য লোকজন না রেখে গ্যালভানি নিজেই স্ত্রীর সেবা শুশ্রূষা করতেন।

ইতালির লোক ব্যাঙের স্যুপ খেতে বেশ ভালবাসেন। অসুস্থা স্ত্রীকে খাওয়ানোর জন্য একদিন গ্যালভানি তাঁর গবেষণাগারে টেবিলটার উপর ছুরি দিয়ে সোনা ব্যাঙের ছালটা ছাড়াচ্ছিলেন। পাশে পড়েছিল স্থির তড়িৎ উৎপাদনের সরঞ্জাম। (সেদিনের বিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র ঘর্ষণজাত তড়িতের সন্ধান পেয়েছিলেন। আর ঐ কারণে গ্যালভানি ঘর্ষণের ফলে উৎপন্ন তড়িৎকে নিয়ে পরীক্ষা করতেন।)

ব্যাঙের ছাল তোলা শেষ হওয়ার পর ব্যাঙ ও ছুরিটাকে টেবিলের উপর ফেলে রেখেই কী একটা কাজে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন গ্যালভানি। তাঁর আসতে একটু বিলম্ব হওয়ায় লুসিয়া ভাবলেন, স্বামীকে আর কষ্ট দেওয়া কেন? ব্যাঙটাকে কেটেকুটে নিজেই রান্নাটা চাপিয়ে দেবেন। নিজেকে বেশ একটু সুস্থ বলেও মনে হচ্ছিল তাঁর।

ঘরে ঢুকে ব্যাঙটাকে তুলতে গিয়ে চমকে উঠলেন লুসিয়া। একী? মরা —ছাল ছাড়ানো ব্যাঙের পা দুটো থর থর করে কাঁপছে কেন? বিস্ময়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেলেন লুসিয়া। তবে কী ব্যাঙটা মরেনি এখনও! নাকি গবেষণা পাগল তাঁর স্বামী ঐ মরা ব্যাঙটাকে দিয়ে কোন পরীক্ষা করছেন?

একটু অপেক্ষা করে গেলেন লুসিয়া। স্বামী ফিরে আসতে ব্যাপারটা খুলে বললেন এবং ঘরে নিয়ে গিয়ে দেখালেনও।

গ্যালভানি ব্যাপারটা দেখে নিজেই প্রথমটায় কেমন যেন হতচকিত হয়ে গেলেন। তারপর মনে মনে স্থির করলেন, নিশ্চয়ই বিদ্যুতের জন্যই এই ব্যাপারটা ঘটছে।

কয়েকদিন ধরে একরকম খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে মরা ব্যাঙ নিয়ে পরীক্ষায় মেতে উঠলেন গ্যালভানি। একসময় একটা মরা ব্যাঙের ছাল ছাড়িয়ে এবং তাকে নুন জলে ভিজিয়ে তামার তারে বেঁধে ঝুলিয়ে রাখলেন। তলায় রাখলেন একটা লোহার মোটা তার। কাছে আর একটা লোহার রডকে এমনভাবে আটকালেন—যাতে একটু হাওয়া পেলেই ব্যাঙের পা দুটো দুলে লোহার রডকে স্পর্শ করতে পারে। এবার গ্যালভানি লক্ষ্য করলেন, ব্যাঙের পা যতবারই লোহাকে স্পর্শ করছে ততবারই দূরে ছিটকে পড়ছে। (ব্যাঙের ভিজে পা, লোহার রড ও তামার তার—এই তিনটি একত্রে একটা তড়িৎকোষ গঠন করেছিল বলে অনুরূপ ঘটনাটি ঘটেছিল।)

গ্যালভানি পরীক্ষায় কৃতকার্য হলেন বটে, কিন্তু কারণ ব্যাখ্যা করতে পারলেন না। তবে একটা খেয়াল চেপে বসলো তাঁর মাথায়। যেখানে-সেখানে, রাস্তা-ঘাটে, স্কুলে কলেজে, ছেলে-বুড়ো সবার সামনে ব্যাঙ নাচিয়ে মজা দেখাতে শুরু করলেন। লোকে হাঁ করে দেখতো বটে, কিন্তু মনে মনে ভেবে নিল গ্যালভানির মাথাটা নির্ঘাৎ খারাপ হয়ে গেছে। আড়ালে আবডালে

অনেকেই বিদ্রূপ করলেন "ব্যাঙ-নাচানো অধ্যাপক।"

গ্যালভানি কিন্তু ওসব কথায় কান দিতেন না। কেবল মনের খেয়ালে ব্যাঙই নাচাতেন। আর এই পরীক্ষার যে কতখানি গুরুত্ব তাও নির্ণয় করার প্রয়োজন মনে করেননি তিনি। এমনকি সেদিনের কোন বিজ্ঞানীও ঐ পরীক্ষাটি নিয়ে মাথা ঘামাননি।

এরপর কেটে যায় বেশ কয়েকটা বছর। ধীরে ধীরে গ্যালভানির সুখের সংসার ভেঙে পড়ে। লুসিয়া মারা গেলেন। সে শোক ভুলতে না ভুলতে তাঁর উপর শুরু হয় রাজনৈতিক ঝড়। শোকে দুঃখে ভেঙে পড়লেন গ্যালভানি। আর নিজের মন থেকেই কখন হারিয়ে গেল তাঁর সেই ব্যাঙ নাচানো পরীক্ষাটি।

একদিন মৃত্যুবরণ করলেন গ্যালভানি। কিন্তু পরীক্ষাটি অমর হয়ে রইল। তাঁর মৃত্যুর বেশ কয়েক বছর পরে তড়িৎ নিয়ে গবেষণা করতে করতে বিজ্ঞানীদের মনে পড়লো গ্যালভানির সেই ছোট্ট পরীক্ষাটির কথা। হাতেনাতে পরীক্ষাটি করতেই বিস্মিত হলেন তাঁরা। বুঝতে পারলেন, তড়িৎবিজ্ঞানের এক নতুন সম্ভাবনার দ্বার উদ্ঘাটন করে গেছেন গ্যালভানি, তখনই তাঁর পরীক্ষাটিকে অনুসরণ করে আবিষ্কৃত হল তড়িৎকোষ। অতঃপর শুরু হয়ে গেল তড়িতের যুগ।

আজ তড়িৎ মানুষের ক্রীতদাসে পরিণত হয়েছে। তড়িৎ ছাড়া মানুষের যেন আর একমুহূর্তও চলে না। বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে, তড়িতের স্বর্ণযুগ শুরু হওয়ার মূলে আছে গ্যালভানির পত্নীপ্রেমের ছোট্ট কাহিনীটুকু এবং তাঁর খেয়ালি মনের ফসল মরা ব্যাঙ নাচিয়ে সবাইকে দেখানো।

✪ তাপগতি বিদ্যা ✪

মিউনিক শহরে অস্ত্রশালায় কামান তৈরি করতেন এক ইঞ্জিনিয়ার। একদিন কামানের নল তৈরির জন্য একখানা ধাতব পাতকে তুরপুন দিয়ে ছ্যাঁদা করতে গিয়ে দেখলেন, ছ্যাঁদা করার সময় তাপ উৎপন্ন হচ্ছে। ভদ্রলোক চিন্তিত হলেন একটু।

চিন্তিত হওয়ার কারণ অবশ্য ছিল। ততদিন পর্যন্ত বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, তাপ হচ্ছে এক ধরনের সূক্ষ্ম পদার্থকণা। কাল্পনিক এই পদার্থ কণার নাম দেওয়া হয়েছিল ক্যালরিক। তাপ আদান-প্রদানের ক্ষেত্রে সেকালে যে সংজ্ঞাটি তাঁরা নির্ধারণ করেছিলেন, সেটি হলো—কোন বস্তুতে ক্যালরিক প্রবেশ করলে সে বস্তু হবে উত্তপ্ত আর যে বস্তু থেকে ক্যালরিক বেরিয়ে যাবে সেটি হবে শীতল।

তাঁরা আরও মনে করতেন, ক্যালরিক কণিকা অতিক্ষুদ্র। ওকে দেখা

যায় না এবং এর কোন ওজনও নেই।

মিউনিক শহরের সেই ইঞ্জিনিয়ারটি তাপের উপরোক্ত সংজ্ঞাটি জানতেন বলেই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি মনে মনে প্রশ্ন করলেন, তাপ যদি অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পদার্থকণা হয়, তাহলে ছ্যাঁদা করার সময় এত প্রচুর তাপ কেমন করে আসে।

সংজ্ঞাটির সত্যতা যাচাই করতে এবার প্রবৃত্ত হলেন ইঞ্জিনিয়ারটি। তিনি এবার করলেন কী! একটা ধাতুর পাতকে ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে রেখে ছ্যাঁদা করতে শুরু করলেন। দেখলেন, অল্প পরেই জল উত্তপ্ত হয়ে উঠলো। তারপর তুরপুন পরিবর্তন করে ভোঁতা তুরপুন দিয়ে ছ্যাঁদা করলেন। এবার দেখলেন, উৎপন্ন তাপের পরিমাণ আরও বেশী।

ইঞ্জিনিয়ারটির কেমন যেন ধারণা হলো, তাপের যে সংজ্ঞাটা আছে—একেবারে ভুল। অর্থাৎ ক্যালরিকের প্রবাহে তাপের আদান-প্রদান ঘটেনা। একমাত্র ঘর্ষণেই তাপের উৎপত্তি হয়।

ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোকটি তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীমহলে প্রচার করলেন—বিজ্ঞানীদের দেওয়া ক্যালরিক মতবাদ সম্পূর্ণরূপে ভ্রান্ত। ক্যালরিক নামের কোন পদার্থ পৃথিবীতে নেই। আসলে ঘর্ষণেই তাপের উদ্ভব হয়।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু মেনে নিতে পারলেন না তাঁর কথা। এতকাল ধরে কত বড় বড় লোক যাকে স্বীকার করে এসেছেন, তা কি কখনও ভুল হতে পারে? কিন্তু সেই ইঞ্জিনিয়ার ভদ্রলোক! পরীক্ষার সাহায্যে যা তিনি সত্য বলে প্রমাণ করেছেন—তাকে তিনি অস্বীকার করেন কেমন করে? অতএব শুরু হয়ে গেল বাকবিতণ্ডা।

সেকালে ডেভি নামে এক নামকরা বিজ্ঞানী ছিলেন। দেশ-বিদেশে ভয়ানক নাম ডাক ছিল তাঁর। তিনি কিন্তু ঐ সামান্য ঘটনাটিকে অবহেলা না করে চিন্তাভাবনা শুরু করে দিলেন। ভেবে দেখলেন, ঘর্ষণে অবশ্যই তাপের সৃষ্টি হয়। যে কোন দুটো বস্তুকে এমনকি দুটো হাতের চেটোকে ঘর্ষণ করলে গরম হয়ে উঠে। পাথরে পাথর ঘষলেতো আগুন পর্যন্ত বেরিয়ে আসে। তাহলে?

এবার ডেভি বিষয়টাকে নিয়ে নিজেই শুরু করে দিলেন পরীক্ষা। তিনি করলেন কী, দুখানা বরফের টুকরো নিয়েই ঘষতে শুরু করলেন। দেখা গেল, বরফের ঘর্ষণেও তাপ উৎপন্ন হচ্ছে এবং বরফ জলে পরিণত হচ্ছে। তখনই তাঁর মনে এলো, বিজ্ঞানীদের দেওয়া ক্যালরিক মতবাদ যদি সত্য হতো তাহলে বরফের ঘর্ষণে কিছুতেই তাপ সৃষ্টি হতে পারতো না। কেননা বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বরফের মধ্যে ক্যালরিক প্রবেশ করতে পারেনা বলেই ঠাণ্ডা।

ডেভি এবার সেই ইঞ্জিনিয়ারটির মতবাদকে কেবল সমর্থন করলেন না, একটি সূত্রও রচনা করলেন। সূত্রটিতে উল্লেখ করলেন, ঘর্ষনের ফলে যে কোন

বস্তুর অণু বা পরমাণুর গতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং ঐ বর্ধিত গতিশক্তিই বস্তুতে তাপশক্তি সঞ্চারিত করে। সেই প্রথম তিনিই বললেন "তাপ একপ্রকার শক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়।"

ডেভির কথা কিন্তু কেউ অবিশ্বাস করতে পারলেন না। অনেকেই এগিয়ে এলেন গবেষণার জন্য। ফলে একদিকে যেমন উপরোক্ত সত্যটি প্রতিষ্ঠিত হলো, অপরদিকে তেমনই নতুন নতুন সত্য উদ্ঘাটিত হলো। তাদের মধ্যে জেমস প্রেস্কট জুলের সিদ্ধান্তই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ঐ জুলের সূত্রটি আবিষ্কারের পরেই তাপবিজ্ঞানে আলোড়নের সূচনা হয় এবং "তাপগতি বিদ্যা" নামে একটি নতুন শাখার উদ্ভব হয়।

তাপগতি বিদ্যা তাই মিউনিক শহরের সেই ইঞ্জিনিয়ার এবং তাঁর সেই ছোট্ট পরীক্ষাটির অবদান। চোখ দুটো খুলে রাখলে এবং প্রচলিত ধারণাকে অন্ধভাবে স্বীকার না করে যাচাই করার মনোভাব রাখলে কত মহৎ আবিষ্কার যে হতে পারে তার প্রমাণ সেই ইঞ্জিনিয়ার—যাঁর নাম স্যার রামফোর্ড।

✪ চুম্বক ও তড়িৎপ্রবাহের সম্পর্ক ✪

১৮০০ খ্রীস্টাব্দের কথা।

কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তড়িৎবিজ্ঞানের জনৈক অধ্যাপক ছাত্রদের তড়িৎ সম্বন্ধে বোঝাচ্ছিলেন আর হাতের কাছে যন্ত্রপাতি রেখে ছেলেদের নানারকমের পরীক্ষাও দেখাচ্ছিলেন।

একসময় পরীক্ষা করে দেখানোর কাজ শেষ হলো। কিন্তু টেবিলের উপর সরঞ্জামগুলো—তথা একটি বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্র, লম্বা একখানা তামার তার এবং একটি কম্পাস তেমনই পড়ে রইল টেবিলে।

অধ্যাপক এবার শুরু করলেন বক্তৃতা দিতে। একসময় বক্তৃতা দিতে দিতে একেবারে তন্ময় হয়ে পড়লেন যেন। বোধ করি তন্ময়তার মধ্যে কখন আপন অজান্তেই কম্পাসটা দূর থেকে সরিয়ে এনে রেখেছিলেন ঐ তামার তারটার নিচেই। যেহেতু কিছুক্ষণ আগেই পরীক্ষা করে দেখছিলেন এবং তারটি বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকায় বিদ্যুৎ প্রবাহ তখনও চলছিল।

ক্লাসের ঘণ্টা শেষ হলো। এবার ক্লাস ছাড়ার কথা। বক্তৃতা শেষ করে যন্ত্রপাতির দিকে মন দিলেন অধ্যাপক। কিন্তু এ কী! কম্পাসের দিকে চোখ পড়তে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন যেন।

কম্পাসে থাকে চুম্বক শলাকা এবং এটি সবসময় উত্তর দক্ষিণে প্রলম্বিত অবস্থায় থাকে। কিন্তু অধ্যাপক দেখলেন, শলাকাটি উত্তর দক্ষিণে না থেকে তারের সমান্তরালে অবস্থান করছে। দ্বিতীয় কোন শক্তিশালী চুম্বকও নেই সেখানে। তাহলে কেমন করে এমন অসম্ভব সম্ভব হলো?

অবশ্য এখানে উল্লেখ করতে হয় যে, বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ন—অতি সাধারণ এক আধটু পরিবর্তনও তাঁদের চোখে ধরা পড়ে এবং সে সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করেন।

তাই, চুম্বকের কাঁটাটা কেন উত্তর দক্ষিণে না থেকে তারের সমান্তরালে থাকলো সে সম্বন্ধে দস্তুর মত গবেষণাই শুরু করে দিলেন অধ্যাপক। বুঝতে পারলেন, কোন পরিবাহী তারের ভেতর দিয়ে যতক্ষণ বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় ততক্ষণ ঐ তারটিও একটি শক্তিশালী চুম্বকে পরিণত হয়ে যায়। প্রবাহ বন্ধ করলে তারমধ্যে আর চুম্বকের গুণ থাকে না।

এই সত্যটিকে তড়িৎবিজ্ঞানে একটি যুগান্তকারী আবিষ্কাররূপে গণ্য করা হয়। পরের দিকে এই আবিষ্কারটিকে অবলম্বন করে মানবসভ্যতা বহু গুরুত্বপূর্ণ জিনিস লাভ করেছে—যা সভ্যতাকে এগিয়ে দিয়েছে অনেকখানি। অথচ সত্যটি আবিষ্কৃত হয়েছে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে—সেই কোপেনহেগেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকটির দ্বারা। নাম তাঁর উরস্টেড।

✪ টেলিগ্রাফ ✪

এক ছিলেন চিত্রকর।

রাতদিন ঘরের কোণে বসে থাকতেন আর আপন মনে একের পর এক কেবল ছবিই এঁকে যেতেন।

একবার কী খেয়াল হলো তাঁর! ছবি আঁকা ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন দেশভ্রমণে। উদ্দেশ্য, বিভিন্ন জায়গার প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী উপভোগ করা যাবে, নানা দেশের জনজীবনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া যাবে এবং সেরা সেরা চিত্রশালাগুলিও পরিদর্শন করা যাবে।

ঘুরতে ঘুরতে একটি বছর কেটে গেল। বৎসরান্তে লণ্ডন থেকে জাহাজে করে ফিরলেন বাড়ীর দিকে।

জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে ছিলেন এক মাঝবয়সী ভদ্রলোক। চিত্রকর রোজই দেখতেন, ভদ্রলোক সামনে অদ্ভুত অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি পেতে দিয়ে কী সব করেন আর তন্ময় হয়ে ভাবেন।

বেশ কৌতুহলী হলেন চিত্রকর এবং কৌতুহল দমন করতে না পেরে একদিন গায়ে পড়ে আলাপ করলেন ভদ্রলোকটির সঙ্গে।

ভদ্রলোকের বাড়ী ফ্রান্সে। নাম জ্যাকসন। পেশায় তিনি ডাক্তার হলে কী হবে, ডাক্তারী করা ছেড়ে দিয়েছেন অনেক আগে। এখন বিদ্যুৎকে নিয়ে মেতে উঠেছেন গবেষণায়।

চিত্রাকর এবং গবেষক উভয়েই পাশাপাশি হলেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে একেবারে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন। অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি দেখে চিত্রকর বায়না ধরলেন, কয়েকটা পরীক্ষা তাঁকে দেখাতেই হবে।

জ্যাকসনও এক সমঝদার ব্যক্তিকে লাভ করে খুশি হলেন এবং অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে পরীক্ষাগুলি করে দেখালেন। আনন্দে পুলকিত হলেন চিত্রকর। জানালেন, আরও—আরও পরীক্ষা দেখতে চান তিনি।

এমন আগ্রহী দর্শক বোধ হয় আগে কখনো লাভ করেননি জ্যাকসন। তাই বিদ্যুৎ সম্বন্ধে বক্তৃতা ও পরীক্ষা দুইই চললো। একসময় লোহার তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎকে পাঠিয়ে জ্যাকসন দেখালেন, লোহার তারটা সঙ্গে সঙ্গেই চুম্বকে পরিণত হয়ে গেল। কিন্তু প্রবাহ বন্ধ করার সাথে সাথে চুম্বকের গুণ একটুও অবশিষ্ট রইল না।

এবার চিত্রকর বিস্ময়ে অভিভূত হলেন। জিজ্ঞাসা করলেন—লোহার তারটা যদি খুব—খুব বড় হতো তাহলে কী হতো ?

জ্যাকসন হেসে বললেন—তার যত লম্বা হোকনা কেন বিদ্যুতের দ্বারা পরিব্যাপ্ত হতে খুব একটা দেরী হতো না।

চিত্রকরের ভাবপ্রবণতা বেড়ে গেল। উদাস দৃষ্টিতে জ্যাকসনের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—লম্বা তারের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎকে পাঠানো যায়, মুখের কথাকে বা কোন শব্দকে পাঠানো যায় না ?

জ্যাকসন গম্ভীর হলেন। বললেন—কেন পাঠানো যাবে না ? আপনি নিজেই একবার চেষ্টা করে দেখুন না কেন ?

কথাটা খুব মনে ধরলো চিত্রকরের। বাড়ী এসে আর ছবি আঁকায় মন দিলেন না। কোথায় পড়ে রইলো রঙ, তুলি, কাগজ ইত্যাদি। তার জায়গায় ঘরকে ভরিয়ে ফেললেন লোহার তার, তামার তার, স্ক্রু, পেরেক, চুম্বক, হাতুড়ি, ব্যাটারি প্রভৃতি দিয়ে। সময়মত খাওয়া নেই, বন্ধুদের সঙ্গে কথাবার্তা নেই, অষ্টপ্রহর কেবল ঠুকঠাক আর খুটখাট। সবাই ভেবে নিল, চিত্রকরের মাথাটা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে।

এদিকে জিনিসপত্র কিনতে কিনতে চিত্রকর ফতুর হয়ে গেলেন। হাতে পয়সাকড়ি নেই, কিন্তু যন্ত্র না হলে গবেষণা চলবে কেমন করে ? তখন বাধ্য হয়ে নিজের হাতেই যন্ত্রপাতি তৈরি করতে হলো।

চিত্রকরের সেই অতন্দ্র সাধনা কিন্তু ব্যর্থ হলো না। একদিন আপন উদ্ভাবিত যন্ত্রের মাধ্যমে তারের ভিতর দিয়ে সঙ্কেত প্রেরণে সমর্থ হলেন। সে সঙ্কেত খুব বেশী দূরে প্রেরণ করতে পারলেন না বলে পুনরায় গবেষণা করতে হলো। শেষে রিলে পদ্ধতি আবিষ্কারের মাধ্যমে দূরকে নিকট করলেন। শুরু হলো বিজ্ঞানের জয়যাত্রা।

সাধনায় সিদ্ধিলাভ করার পর চিত্রকর তৎকালীন মার্কিন সরকারের শরণাপন্ন হলেন। অনুরোধ রাখলেন, আর্থিক আনুকূল্য লাভ করলে তিনি বহু দূরবর্তী জায়গায়ও নিমেষের মধ্যে খবর প্রেরণ করতে পারবেন।

সরকার এই মহান আবিষ্কারকে স্বাগত জানালেন এবং প্রথম কিস্তিতে মঞ্জুর করলেন ত্রিশ হাজার ডলার। ঐ অর্থে চিত্রকরটি তখন ওয়াশিংটন থেকে বাল্টিমোর পর্যন্ত খবর পাঠানোর জন্য লাইন টেনে নিয়ে গেলেন। এইটিই

পৃথিবীর প্রথম টেলিগ্রাফের লাইন।

খবরের সঙ্কেত প্রথম প্রেরণ করেছিলেন চিত্রকর নিজেই। সঙ্কেতটি ছিল "ঈশ্বরের অনুগ্রহে সম্ভব হলো।" নিমেষের মধ্যেই সঙ্কেতটি ওয়াশিংটন থেকে পৌঁছে গিয়েছিল বাল্টিমোরে। সেই প্রথম দূরত্বকে বধ করলো মানুষ এবং চিত্রকর পরিচিত হলেন জগৎপূজ্য বিজ্ঞানীরূপে।

এই চিত্রকর আর কেউ নন, টেলিগ্রাফের আবিষ্কর্তা স্যার স্যামুয়েল মোর্স।

✪ টেলিফোন ✪

ষোল বছরের এক তরুণ। বোষ্টন শহরে এক ধনীর বাড়ীতে গৃহশিক্ষকের কাজ করতেন।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, সে সময় সবেমাত্র টেলিগ্রাফ আবিষ্কৃত হয়েছে, অথচ টেলিগ্রাফের মাধ্যমে কেবলমাত্র খবরের সঙ্কেতকে পাঠিয়ে মানুষ সন্তুষ্ট থাকতে পারছেনা। চাইছে, মানুষের কণ্ঠস্বরকে সোজাসুজি প্রেরণ করতে। তাই অনেকেই শুরু করে দিয়েছেন গবেষণা।

তরুণ গৃহশিক্ষকটির বিজ্ঞানের প্রতি যথেষ্ট আগ্রহ ছিল এবং টেলিগ্রাফের কথা তিনি ভালভাবেই জানতেন। তাঁরও একদিন ইচ্ছা হল, তারের মাধ্যমে মানুষের কথাকে প্রেরণ করা যায় কিনা সে বিষয়ে পরীক্ষা করতে।

তরুণটির কিন্তু আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। অথচ গবেষণার নেশা ছিল প্রবল। অনেক ভেবে চিন্তে যাঁর বাড়ীতে শিক্ষকতা করতেন, একদিন তাঁকেই অনুরোধ জানালেন।

ভদ্রলোকের মনটি ছিল ভাল। তিনি তরুণটিকে না বলতে পারলেন না। বিনা ভাড়ায় নিচের তলায় একটা ঘর দিলেন, সেইসঙ্গে কিছু টাকাকড়িও।

তরুণটি এবার হাতে স্বর্গ পেলেন যেন। বাজার থেকে কিনে আনলেন বৈদ্যুতিক ব্যাটারী, লোহা ও তামার পাত, নানা ধরনের তার, পেরেক, ইত্যাদি হরেক রকমের জিনিস। ভদ্রলোকের দেওয়া টাকা তো নিঃশেষ হলোই, অধিকন্তু নিজের যা ছিল সম্বল—তাও গেল ফুরিয়ে।

দিন যায়। তরুণের গবেষণায় এতটুকুও ছেদ পড়ে না। মাসের পর মাস, বছরের পর বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল তবুও গবেষণায় বিরাম নেই বা উৎসাহেও এতটুকু ভাঁটা পড়ে না। হয়ত খেয়ালও ছিল না তাঁর। খেয়াল হলো সেদিন —যেদিন ঘরের মালিক বললেন ঘর ছেড়ে দিতে।

তরুণটি এবার দিশেহারা হয়ে উঠলেন। সত্যই তো, কয়েকবছর গত হয়ে গেছে। এতকাল ভদ্রলোকের ঘরের প্রয়োজন ছিলনা, আজ তাঁর দরকার হয়েছে। ঘর ছাড়তেই হবে তাঁকে। কিন্তু কী করবেন তিনি?

তরুণটির তখন কানাকড়িও অবশিষ্ট নেই। একমাত্র মনের জোরকে সম্বল করে বোস্টন শহরে একটি ঘর ভাড়া করে উঠে এলেন। যত বন্ধু-বান্ধব ছিলেন—সবাইকে আর্থিক সাহায্যের জন্য জানালেন অনুরোধ। সৌভাগ্যক্রমে লাভ করলেন এক গবেষণাপাগল বন্ধুকে। প্রচুর টাকা-পয়সার মালিকও ছিলেন বন্ধুটি।

দুই তরুণ পুনরায় নিমগ্ন হলেন গবেষণায়। ততদিনে অবশ্য পূর্বের তরুণটি অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা হয়েছিল, অতি অল্প-কালের মধ্যেই সাফল্য আসবে। এবার সহযোগী লাভ করে কাজটা দ্রুত অগ্রসর হতে লাগলো।

একদিন একটি লম্বা তারের দু প্রান্তে পাতলা লোহার পাতকে ভালভাবে বেঁধে, তার উপর তামার তার জড়ালেন। দু প্রান্তে থাকলেন দুই তরুণ গবেষক। তারপর তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠিয়ে এক পাশের এক তরুণ কথা বললেন এবং অপরে শুনলেন। দেখা গেল, শব্দটা বড্ড ক্ষীণ। ব্যাপারটা মনঃপূত না হলেও উৎসাহ লাভ করলেন। নিশ্চিন্ত হলেন এই ভেবে যে, মানুষের কণ্ঠস্বরকেও দূরে প্রেরণ করা সম্ভব হবে।

পুনরায় পুরোদমে শুরু হলো গবেষণা। কতদিন পরে সার্থক হলো তাঁদের উভয়ের প্রচেষ্টা। আবিষ্কৃত হলো টেলিফোন। এই টেলিফোনে প্রথম বার্তা বিনিময় করেছিলেন সেই দুই তরুণ একটা বাড়ীর উপরতলা ও নীচের তলা থেকে।

অধ্যবসায়ী সেই তরুণটির নাম আলেকজাণ্ডার গ্রেহাম বেল। টেলিফোন আবিষ্কার করে তিনি কিন্তু জীবদ্দশায় আদৌ সুখ্যাতি অর্জন করতে পারেননি। বরং সবাই ব্যঙ্গ করেছিলেন তাঁকে। বাজে একটা খেলনা বলে উপহাস করতেও বাঁধেনি কারুর। বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ যাঁরা—তাঁরা হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, লোকটা বলে কী! মানুষের মুখের কথাকে শ শ মাইল দূরে পাঠিয়ে দেবে! লোকটার মাথায় গোলমাল নেই তো?

কিন্তু আজ! টেলিফোন ছাড়া এক মুহূর্তও মানুষের চলে না। বিজ্ঞানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদানরূপে স্বীকৃত এবং গ্রেহাম বেলও চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন বিজ্ঞানে।

✪ ব্যারোমিটার ✪

একবার এক ভদ্রলোক খুব গভীর একটা কূপ খননের জন্য কিছু লোককে নিয়োগ করেছিলেন। লোকগুলো মাটি খুঁড়তো আর চুঁইয়ে আসা জলটাকে পাম্প বসিয়ে উপরে বার করে দিতো। তারপর আবার খুঁড়তো মাটি। অনেক-অনেক গভীর করতে হবে তো!

বহু সমস্যার কথা আলোচনা করেন। মহাকাশে মহাকাশ স্টেশন নির্মাণ করার কৌশল ও পরিকল্পনা তাঁরই মস্তিকপ্রসূত। পুস্তকখানি মহাকাশ সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু বিজ্ঞানীদের মনে অদ্ভুত এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। অপরাপর বিজ্ঞানীদের মতবাদও নতুন করে পরীক্ষা করার চেষ্টা হয় এই সময়। অবহেলিত জিওলকভস্কি এবং পেলতোরির বক্তব্যগুলোও আলোচিত হল। এবার আরম্ভ হল যৌথভাবে রকেট চর্চা। যোগ দিল বড় বড় বিজ্ঞান সংস্থা। ওবের্থের সহযোগিতায় এবং ফন ব্রাউন ভিল্লিয়েই প্রমুখ বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় V. F. R. নামে এক জার্মান সংস্থা এক উন্নত ধরনের রকেট তৈরি করেন।

ঠিক সেই সময় ইউরোপের আকাশে ঘনিয়ে উঠে দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমরের কালো মেঘ। যুদ্ধের প্রয়োজনে রকেট থেকে জন্ম নিল ক্ষেপনাস্ত্র। ওবের্থ প্রমুখ বিজ্ঞানীরা রকেট চর্চা থেকে দূরে সরিয়ে নিলেন নিজেদের। কিন্তু ফন ব্রাউন সহায়তা করলেন হিটলার গোষ্ঠীকে। একদিন তৈরি হল মারাত্মক ক্ষেপনাস্ত্র— নাম ভি-২। ক্ষেপনাস্ত্রটির ওজন ছিল চোদ্দ টন। পাঁচ মিনিটে ২০০ মাইল পথ অতিক্রম করে এক টন বিস্ফোরক ঢেলে এল। চারিদিকে সৃষ্টি হল দারুণ উত্তেজনা ও আতঙ্ক।

ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহৃত হলেও ভি-২ রকেটই আধুনিক মহাকাশজয়ী রকেটের পূর্ব পুরুষ। এই রকেটটি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে একশ মাইল উপরে উঠতে পেরেছিল।

যুদ্ধের চাকা একদিন ঘুরে গেল। মার্কিন সৈন্যরা রকেট ঘাঁটি অধিকার করে কিছু রকেট এবং প্রধান রকেট নির্মাতা ফন ব্রাউনকে স্বদেশে চালান দিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মার্কিন দেশে সুরু হল মহাকাশ বিজয়ের নবোদ্যম। নেতা হলেন সেই ফন ব্রাউন। এদিকে সোভিয়েত বিজ্ঞানীরাও সুরু করলেন রকেট চর্চা। দু'দেশের পৃথক পৃথক চেষ্টায় একে একে উৎক্ষিপ্ত হতে লাগল রকেট এবং রকেটের মাথায় স্থাপন করা হল মহাকাশযান।

বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখলেন, পৃথিবীর টানকে অতিক্রম করতে হলে রকেটের গতিবেগ হতে হবে ঘণ্টায় ৪০,২৫০ কিলোমিটার। এতদিনে যে রকেট তাঁদের হাতে এল তার গতিবেগ পৃথিবীর আকর্ষণ বলকে ছিন্ন করতে পারে। কিন্তু মহাকাশে মানুষ প্রেরণ করা যাবে কেমন করে?

আবার ভাবতে বসলেন বিজ্ঞানীরা। পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন মহাকাশযান তৈরি করার। কিন্তু গঠন তার কেমন হবে, মনুষ্যবাসের পরিবেশই বা তার মধ্যে সৃষ্টি করা যাবে কিভাবে?

অনেক ভেবে শেষে ঠিক করলেন, যদি পৃথিবীর পরিবেশটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলে কোন অসুবিধা হবে না। ভাবনার কিন্তু এইখানে শেষ নয়। পৃথিবীকে বায়ুমণ্ডল এবং ধূলিকণা ঘিরে রেখেছে বলে পৃথিবী পৃষ্ঠে গরম ও ঠাণ্ডা কোনটিই অতিরিক্ত নয়। উপরের দিকে যতই যাওয়া যাবে ততই ঠাণ্ডা বাড়বে। সূর্যরশ্মি পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত হয়ে সংলগ্ন বায়ুমণ্ডল ও ধূলার সমুদ্রকে গরম করে রেখেছে। উপরের দিকে বায়ু কিংবা ধূলা বালি কিছুই নেই।

অক্সিজেনও নেই।

শুধু কী তাপমাত্রার পার্থক্য? মহাকাশে ভ্রমণ করার আরও আছে হরেক রকমের বিপদ। সূর্যের আলট্রা ভায়োলেট রে, কসমিক রে প্রভৃতি কত ক্ষতি-কারক রশ্মি, উল্কাপাতের ভয়, বায়ুহীনতা, কত কী? তাছাড়া কাউকে যদি মাসের পর মাস মহাকাশে ঘুরে বেড়াতে হয় তাহলে একঘেয়েমি অবশ্যই আসবে। তার উপর আছে তীব্রবেগে উপরে ওঠার সমস্যা।

অনেক কথা ভাবতে হল বিজ্ঞানীদের। শেষে ঠিক করলেন রকেটের মধ্যে এমন একটা প্রকোষ্ঠ তৈরি করতে হবে যার মধ্যে যাত্রীদের আহার-নিদ্রা, নিশ্বাস-প্রশ্বাস সবই যেন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের চাপে হয়।

এখন প্রশ্ন হল, কী দিয়ে তৈরি করা যাবে প্রকোষ্ঠটি? এমন কোন্ পদার্থ আছে, যার তাপ সহনক্ষমতা অসাধারণ? তার উপর সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মির প্রভাবমুক্ত এবং বায়ুহীন পরিবেশে চলতে থাকলেও ভেতরের বায়ুর চাপে প্রকোষ্ঠটি ফেটে যাবে না?

এ সমস্যারও সমাধান করলেন বিজ্ঞানীরা। অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর সঙ্কর দিয়ে তৈরি করা হল বিশেষ প্রকোষ্ঠ। সেই সঙ্কর ধাতুটির তাপ সহন ক্ষমতা অসাধারণ এবং অ্যালুমিনিয়াম অপেক্ষা একশ গুণ শক্ত। নিশ্ছিদ্র সেই প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে রাখা হল ১৫২ মিলিমিটার পারদের চাপের সমান অক্সিজেন গ্যাস। ১৫২ মিলিমিটার চাপে কেন অক্সিজেন রাখা হল তার একটা কারণ আছে।

আমরা স্বাভাবিক বায়ুর চাপকে ৭৬০ মিলিমিটার পারদে প্রকাশ করে থাকি। কিন্তু বায়ুতে অবস্থিত একমাত্র অক্সিজেন ছাড়া আর কোন গ্যাস আমাদের শ্বাস ক্রিয়ার জন্য ব্যবহৃত হয় না। সেই অক্সিজেন আবার বায়ুতে মাত্র এক পঞ্চমাংশ রয়েছে। ৭৬০ কে ৫ দিয়ে ভাগ করলে হয় ১৫২ মিলিমিটার চাপে কেবলমাত্র অক্সিজেনকে রাখলে আমাদের শ্বাস ক্রিয়ার কোন অসুবিধা হবে না।

মহাকাশচারীদের যে পোষাক দেওয়া হল, তাতেও থাকল অক্সিজেন। তাঁদের শ্বাস ক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন কার্বনডাই-অক্সাইডকে রাসায়নিক উপায়ে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থাও হল। পরিশেষে খাওয়ার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা করলেন বিজ্ঞানীরা। সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে তৈরি করা হল ছোট ছোট পিল অথবা কাগজের মোড়কে রাখা পেস্ট। ওতে আমাদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় প্রোটিন, স্নেহ, শর্করা, খনিজ ও ভিটামিন সব কিছুর ভাগ ঠিক করে দেওয়া হল। সুবিধে হল এই যে, অতি সামান্য অংশ খেলেই কাজ চলে যায়। পেট ভরানোর প্রয়োজন হল না। হৃৎপিণ্ড, রক্ত-সঞ্চালন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় শারীরিক প্রক্রিয়াগুলির যাতে বিঘ্ন সৃষ্টি না হয় সে পরিবেশেরও ব্যবস্থা করা হল।

এত সমস্ত কাণ্ড করেও বিজ্ঞানীরা প্রথম প্রথম মহাকাশযানের মধ্যে মানুষ পুরে মহাকাশে উৎক্ষেপন করেন নি। সর্বপ্রথম খালি মহাকাশ যান, তারপর কুকুর, বানর প্রভৃতিকে পাঠিয়েছিলেন। তারপরে যখন পরীক্ষায় সম্পূর্ণ সফল হলেন, তখনই প্রেরণ করেছিলেন মানুষকে।

মহাকাশযান—বিভিন্ন যন্ত্রপাতি সম্বলিত পৃথিবীর পরিবেশযুক্ত একটি শক্ত

কয়েকদিন খোঁড়ার পরে ভয়ানক অসুবিধায় পড়লো খননকারীরা। এবার পাম্প ঠেকিয়ে তলা থেকে একটুও জল বাহিরে আনা গেল না। লোকগুলো অসুবিধার কথা জানাতে ভদ্রলোক কারণটা সম্বন্ধে খুব করে ভাবলেন, দু-দশ জনকে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ ধরতে পারলেন না।

ভদ্রলোক তখন অনেক ভেবে চিন্তে একদিন হাজির হলেন তখনকার সেরা বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর কাছে। গ্যালিলিও তখন অতি বৃদ্ধ। তার উপর অন্ধ হয়ে পড়েছেন এবং কোন কিছুকে নিয়ে ভালভাবে চিন্তা করার ক্ষমতাও হারিয়েছেন। তাই প্রিয় শিষ্য টরিসেলিকেই কারণটা অনুসন্ধানের জন্য ভার দিলেন।

গুরুর কথানুযায়ী টরিসেলি সেইদিনই যাত্রা করলেন ভদ্রলোকের সঙ্গে। কূপ দেখলেন, নানা ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালালেন, শেষে দড়িতে পাথরের টুকরা বেঁধে এবং সেটিকে কূপের ভেতরে নামিয়ে গভীরতাও মাপলেন। দেখলেন, কূপের গভীরতাটা চৌত্রিশ ফুটের চেয়ে কিছু বেশী।

টরিসেলিও দেখেশুনে খুব কম বিস্ময়বোধ করলেন না। বারে বারে একই প্রশ্ন তাঁর মনে এলো, কেন চৌত্রিশ ফুটের বেশী গভীরতা থেকে পাম্প দিয়ে জল তোলা যাচ্ছে না ? কোথায় রয়েছে এর প্রতিবন্ধক ?

ভাবতে ভাবতে একসময় তাঁর মনে এলো, এই ব্যাপারটার মূলে হয়ত বায়ুর চাপের কোন ক্রিয়া আছে। তা না হলে জল কেন উপরে উঠবেনা ? অপরদিকে চৌত্রিশ ফুট গভীরতা পর্যন্ত জল তুলতে কোন অসুবিধা তো হচ্ছে না! কিন্তু কেমন করে হদিশ পাওয়া যাবে!

অনেক ভেবেচিন্তে টরিসেলি একমিটার লম্বা এবং একমুখ খোলা কাচনল নিলেন। নলটিকে ভর্তি করলেন জলের চেয়ে প্রায় সাড়ে তেরগুণ ভারী তরল পারদকে দিয়ে। তারপর নলটিকে একটি পারদপূর্ণ পাত্রে উপুড় করে দিয়ে খাড়াভাবে ধরে রাখলেন।

এবার সত্যই আশ্চর্য হলেন টরিসেলি। নলের ভেতরের পারদটা ভর্তি হয়ে থাকলো না বা সম্পূর্ণভাবে নেমেও পড়লো না। ধীরে ধীরে নেমে আসতে আসতে ছিয়াত্তর সেণ্টিমিটার উচ্চতায় একেবারে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল।

টরিসেলি এবার বুঝতে পারলেন, বায়ুমণ্ডল পৃথিবীর উপর যে চাপটা প্রদান করছে সেই চাপ ছিয়াত্তর সেণ্টিমিটার পারদস্তম্ভকে ধরে রাখতে পারে। যেহেতু জলের চেয়ে পারদ ১৩·৬ গুণ ভারী, তাই ১৩·৬ × ৭৬ সেণ্টিমিটার বা ৩৪ ফুট উচ্চ জলস্তম্ভকে যে ধরে রাখতে সক্ষম। আর ঐ কারণেই সাধারণ পাম্প ৩৪ ফুটের মধ্যেই কাজ করতে সক্ষম।

উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে টরিসেলির মনে বায়ুর চাপ নির্ণয় করার পরিকল্পনা আসে। বায়ুর চাপ সব সময় সমান থাকে কিনা, কিংবা পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ঐ চাপ কেমন, পাহাড়ের উপর কিংবা খনিগর্ভে চাপের তারতম্য ঘটে কিনা, ইত্যাদি জানার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং তখনই

তৈরি করেন চাপমাত্র যন্ত্র বা ব্যারোমিটার। এই যন্ত্রটির প্রধান উপকরণ হচ্ছে সেই পারদ পাত্র এবং তার উপর উপুড় করে রাখা পারদ ভর্তি এক মিটার লম্বা একটা সরু কাচের নল। ওটিকে যাতে সহজে বন্ধ করা যায় বা স্থির ভাবে রেখে দেওয়া যায়, তার জন্য যান্ত্রিক কতকগুলো ব্যবস্থা থাকে মাত্র।

✪ রঞ্জন রশ্মি ✪

বিদ্যুতের যুগ তখন শুরু হয়ে গেছে। শহরে শহরে জ্বলছে বৈদ্যুতিক বাতি এবং কলকারখানা ও ধাতু নিষ্কাশনে এন্তার বিদ্যুৎকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে বৈদ্যুতিক বাতিকে আরও গুণসম্পন্ন করার জন্য বিজ্ঞানীরা তখনও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

প্লুকর নামে এক বিজ্ঞানী একবার ভাবলেন, লম্বা নলের ভিতরে তড়িৎদ্বার মাধ্যমে বিদ্যুৎ পাঠালে এবং নলের ভেতর থেকে বায়ুকে বার করে আনলে কী অবস্থা হয় একবার দেখতেই হবে।

প্লুকর ভাবা মাত্রই শুরু করে দিলেন গবেষণা। প্রথমত লক্ষ্য করলেন, নলের ভেতরের বায়ুর চাপটা স্বাভাবিক বায়ুচাপ অপেক্ষা একটু কম হতেই তড়িৎদ্বারের ঔজ্জ্বল্য বেড়ে উঠলো। বেশ বিস্মিত হলেন তিনি এবং আরও বায়ুর চাপকে কমিয়ে আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন।

এবার কিন্তু বেশ অদ্ভুত অদ্ভুত ঘটনা চোখে পড়লো তাঁর। যে চাপ হ্রাসের ফলে তড়িৎদ্বারের ঔজ্জ্বল্য বেড়ে উঠেছিল, তার চেয়ে কিছুটা কম চাপ হতে দেখা গেল এক রক্তাক্ত আভা ধনাত্মক তড়িৎদ্বার থেকে ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার পর্যন্ত ব্যাপ্ত হয়ে গেল। আরও চাপ কমানোর ফলে আলোর রেখা ভিন্ন ভিন্ন টুকরায় ভেঙে পড়লো।

প্লুকর তাঁর গবেষণার কথা বিজ্ঞানী মহলে প্রচার করলেন। যাঁরা শুনলেন তাঁরাই আশ্চর্যবোধ করলেন এবং প্লুকর অপেক্ষাও আরও কম চাপে পরীক্ষাটি করে দেখতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। ক্রুকস, ফ্যারাডে, মৈসন প্রভৃতি কত বিজ্ঞানী মেতে উঠলেন পরীক্ষাটি নিয়ে এবং আরও বহু তথ্য আবিষ্কারও করলেন। শেষ পর্যন্ত ওঁদের পরীক্ষা থেকে জানা গেল, নলের ভেতরের বায়ু নিষ্কাষণ যখন শেষ সীমায় এসে যায় তখন নলের ভেতরের আলোর রেখাগুলি ক্রমশ বিকীর্ণ হতে হতে একেবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। অর্থাৎ বিদ্যুৎ প্রবাহ সত্ত্বেও নলের ভেতরটা অন্ধকার হয়ে থাকে অথচ নলের দেওয়ালের গায়ে ঈষৎ সবুজ এক উজ্জ্বল আলোর প্রভা ফুটে উঠে। আর এই আলো কেবল ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার থেকেই নির্গত হয়।

এই আশ্চর্যজনক ঘটনার কিন্তু ব্যাখ্যা সেদিন কেউ প্রদান করতে পারেননি। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন, কোন এক অজ্ঞাত কারণে এই রশ্মি ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার

বা ক্যাথড থেকে আপনা হতেই নির্গত হয়। জার্মান বিজ্ঞানী গোল্ডস্টাইন এই অদ্ভুত আলোক রশ্মিটির তখন নামকরণ করেন "ক্যাথড রশ্মি।"

বিজ্ঞানীদের অভিধানে অবশ্য অসম্ভব বলে কোন কথা নেই। বরং যেইখানে অসম্ভবের গন্ধ পান সেইখানে উৎসাহ অনুভব করেন বেশী। তাই সেই অসম্ভব ব্যাপারটাকে নিয়ে গবেষণা করতে আরো বহু প্রতিভা হলো নিয়োজিত। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন উজবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডব্লিউ রঞ্জেন।

একদিন একটা বড় কাচের বাল্বের দুটি প্রান্তে দুটি তাড়িৎদ্বার যোগ করে এবং তার ভেতরে বিদ্যুৎ পাঠিয়ে ঐ ক্যাথড রশ্মিকে নিয়ে গবেষণা করছিলেন রঞ্জেন। এক সময় বাহিরে যাওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ায় বাল্বটিকে চালু অবস্থায় বাক্সের মধ্যে পুরে রেখে যেতে মনস্থ করলেন।

বাক্সে পুরতে যাবেন এমন সময় কাছে বেরিয়াম প্ল্যাটিনোসায়ানাইড মাখানো একটি পর্দার উপর চোখ পড়লো তাঁর। দেখলেন, পর্দার উপর ঝলমল করছে এক অত্যুজ্জ্বল আলোর আভা। খুবই অবাক হলেন তিনি। মনে প্রশ্ন এলো, বাল্বের মধ্যে কোন দৃশ্যমান আলো নেই, অথচ পর্দায় আলো আসে কেমন করে।

কৌতুহলী হয়ে নিজের ডান হাতটা ধরলেন পর্দার সামনে। এবার পর্দার উপর ভেসে উঠলো কালো ছায়া। কিন্তু সে ছায়া হাতের ছায়া নয়—হাতের ভেতরের হাড়গুলোই ঝলমল করতে লাগলো পর্দায়।

বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন রঞ্জেন। একসময় বুঝতে পারলেন আকস্মিকভাবে তিনি এমন এক আলোকরশ্মি আবিষ্কার করে ফেলেছেন—যার প্রকৃতি সাধারণ আলো থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আরও পরীক্ষা করে বুঝতে পারলেন, কাগজ, চামড়া প্রভৃতির ভেতর দিয়ে সাধারণ আলোকরশ্মি যেতে না পারলেও এই রশ্মি অবাধে ভেদ করে চলে যেতে পারে।

বাহিরে সেদিন আর যাওয়া হলো না রঞ্জেনের। আগের পরীক্ষাগুলির পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে একসময় আবিষ্কার করলেন রঞ্জেন, ক্যাথড রশ্মির নলে তড়িৎ মোক্ষণ ঘটালে বেরিয়াম প্ল্যাটিনো সায়ানাইডের পর্দা থেকে প্রতিপ্রভ আলো নির্গত হয়। এমনকি নলটিকে কালো কাগজ দিয়ে ঢেকে ফেললেও রশ্মি নির্গমন ক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

এই রশ্মিটির রহস্য কিন্তু উদ্ঘাটন করতে পারেননি রঞ্জেন। তাই নামকরণ করেছিলেন "X Ray" বা অচিন রশ্মি নামে। বীজগণিতে যেমন অজ্ঞাত কোন রাশিকে ইংরেজী X অক্ষর দিয়ে সূচিত করা হয়, এই-রশ্মিটিকেও ঠিক সেইভাবে সূচিত করা হয়েছিল।

আবিষ্কারের সময় রশ্মিটির স্বরূপ উদ্ঘাটিত না হলেও ওর ব্যবহারিক দিকটার দিকে সবারই দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছিল এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা-ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছিল। অথচ ওর প্রকৃত স্বরূপ নির্ণয় করা হয়েছে অনেক পরে।

✪ ট্রানজিস্টার ✪

ইংরেজী ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী উইঙ্কলার একটি নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কার করেন। নিজ মাতৃভূমির নামানুসারে পদার্থটির নামকরণ করেন জার্মেনিয়াম।

নতুন পদার্থ জার্মেনিয়ামকে নিয়ে অতঃপর শুরু হয় গবেষণা। শেষে দেখা গেল, পদার্থটি সিলিকন ও টিনের সগোত্র। তড়িৎ পরিবাহিতার ক্ষেত্রে এর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। এটি কাচ, অভ্র ইত্যাদির মত একেবারে কুপরিবাহী নয়, আবার তামা, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি ধাতুর মত উত্তম পরিবাহীও নয়। দুয়ের প্রায় মাঝামাঝি। তাই সেদিন ওকে চিহ্নিত করা হয়েছিল অর্ধ-পরিবাহীরূপে।

এরপর কেটে যায় ২৫ বছরেরও বেশী কাল। দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধ শুরু হয়ে গেলে বেতার গ্রাহক যন্ত্রে রেডিও ভাল্বের পরিবর্তে ওকে ব্যবহার করার জন্য বিজ্ঞানীরা সচেষ্ট হয়ে উঠলেন।

এর একটা কারণ অবশ্য ছিল। বিজ্ঞানীরা অনেক আগেই ঘোষণা করেছিলেন, অর্ধপরিবাহী জার্মেনিয়ামকে রেডিও ভাল্বরূপে ব্যবহার করা চলবে। জগদীশচন্দ্র বসু, মার্কনি প্রভৃতি বিজ্ঞানী চেষ্টাও করেছিলেন ওকে কাজে লাগাতে। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছিলেন, এবার প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার চলতে থাকায় খরচ কমানোর জন্য অনেকেই আগ্রহী হয়ে উঠলেন এবং গবেষণা শুরু হলো নানা জায়গায়। অবশেষে রেডিও ভাল্বের পরিপূরক হিসাবে জার্মেনিয়ামকে প্রথম ব্যবহার করে সাফল্য অর্জন করলেন ডঃ জন বার্ডিন এবং জন ওয়াল্টার ব্রাটাইন নামে দুজন মার্কিন বিজ্ঞানী। এইটিই হচ্ছে আদি ট্রানজিস্টার।

বার্ডিন ও ব্রাটাইনের সেই ট্রানজিস্টার ছিল এক টুকরা জার্মেনিয়ামের কেলাসের ভেতরে মাত্র দুটুকরা সরু সরু তার। ভেতরে তার দুটিকে সংযুক্ত করা ছিল না, অথচ সংযোগস্থলের মধ্যে দূরত্ব ছিল অত্যন্ত অল্প—এক মিলিমিটারের দশভাগের একভাগের মত। যদিও সেদিন ঐ ট্রানজিস্টার রেডিও ভাল্বের চাহিদা পুরোপুরি মেটাতে সক্ষম হয়নি তবুও এই প্রথম বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন, পূর্বের গবেষকদের ধারণা সম্পূর্ণ অভ্রান্ত এবং উন্নত গবেষণার মাধ্যমে ওকে অবশ্যই রেডিও ভাল্বের উপযোগী করা যাবে।

এবার বিজ্ঞানীদের মধ্যে যেন একটা আলোড়ন শুরু হয়ে গেল। যেন একটা প্রতিযোগিতা—কে আগে উদ্ভাবন করবেন! ১৯৪৯ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী সকলের গবেষণা আরও একধাপ এগিয়ে দিল ট্রানজিস্টারকে। অবশেষে ১৯৫১ সালে বহু বিজ্ঞানীর বহু গবেষণালব্ধ ফল থেকে সত্য-সত্যই আবিষ্কার হলো প্রকৃত ট্রানজিস্টার। আর রেডিও ভাল্বের দরকার হলোনা, সে কাজ ছোট্ট ও হালকা একটুকরা ট্রানজিস্টার সম্পন্ন করলো।

বর্তমানে ট্রানজিস্টারের অভাবনীয়ভাবে উন্নতি হয়েছে। চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হতে আছে নানা জাতীয় ট্রানজিস্টার। অনেকে আবার

সিলিকনকে ঐ কাজে প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কিন্তু জার্মেনিয়ামের একটা বড় গুণ হচ্ছে, ওর মত এত বিশুদ্ধ পদার্থ খুব কমই পাওয়া যায়। এত বিশুদ্ধ যে, হাজার কোটি জার্মেনিয়াম পরমাণুর সঙ্গে মাত্র একটি অন্য পদার্থের পরমাণু মিশে থাকে কিনা সন্দেহ। তাই জার্মেনিয়াম হচ্ছে ট্রানজিস্টার তৈরির কাজে আদর্শ মৌল।

✪ বেতার তরঙ্গ ও বেতার বার্তা ✪

আজকের দিনে "বেতার তরঙ্গ" কথাটির সঙ্গে প্রায় সবারই পরিচয় আছে। ওর দ্বারা মানুষ কত অসম্ভবকে সম্ভব করেছে। পরীক্ষাগারে উৎপন্ন করছে আর তারই মাধ্যমে দূরে খবর পাঠাচ্ছে। এমনকি সুদূর নক্ষত্রপৃষ্ঠ থেকে খবর সংগ্রহ করারও এটি একটি প্রধান হাতিয়ার। অথচ এটি আবিষ্কৃত হয়েছে একরকম অপ্রত্যাশিত ভাবে এবং আবিষ্কারের পরে এর প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে গবেষণা হয়েছে দীর্ঘকাল। পরিশেষে বহু গবেষণাকে অবলম্বন করে অসাধ্যকে সাধন করেছে ঐ বেতার তরঙ্গ—বিজ্ঞানের রাজ্যে এক বিরাট বিস্ময়।

চমকপ্রদ ওর কাহিনীর সূত্রপাত ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে। মার্কিন ইঞ্জিনিয়ার ইয়ানস্কী একদিন কানে ইয়ার-ফোন লাগিয়ে কী সব পরীক্ষা করছিলেন। এমন সময় তাঁর কানে হঠাৎ ভেসে এলো এক ধরনের হিস্‌হিস্‌ শব্দ। চারদিকে শব্দের কোন উৎস না থাকায় বেশ একটু অবাক হলেন ইয়ানস্কী।

ইয়ানস্কী উক্ত শব্দের উৎস নির্ণয়ে যত্নবান হলেন। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে অনুসন্ধান চালিয়ে ব্যর্থ হলেন তিনি। তখন উপায় না দেখে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী মহলে খবরটা প্রচার করলেন।

অতি সাধারণ একটি ঘটনা, একটা অতি ক্ষীণ হিস্‌হিস্‌ শব্দ তথাপি বিজ্ঞানীরা অবহেলা করলেন না। অনেকে এগিয়ে এলেন গবেষণা করতে, কিন্তু কেউই ওর উৎস নির্ধারণ করতে পারলেন না। শুধু কেউ কেউ বললেন, এই শব্দটা পার্থিব কোন শব্দ নয়।

১৮৮৩ সাল। জার্মান বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েলও গবেষণা করেছিলেন ঐ শব্দকে নিয়ে এবং আলোক তরঙ্গকে নিয়ে। তিনিই প্রথম ঘোষণা করলেন, শব্দটি বহির্বিশ্ব থেকে আগত এক ধরনের শক্তি তরঙ্গ। ১৮৮৭ সালে আর এক জার্মান বিজ্ঞানী হার্ৎস শব্দটির উৎসস্থল খুঁজতে গিয়ে পরিচিত হলেন বেতার তরঙ্গের সঙ্গে—যাকে তিনি ল্যাবরেটারিতে উৎপাদন করতেও সমর্থ হলেন।

প্রকৃতপক্ষে ম্যাক্সওয়েল এবং হার্ৎসের গবেষণাবলী থেকেই বেতার তরঙ্গের উৎস এবং এর গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রথম অবহিত হলো মানুষ। জানা গেল, মহাকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীর দেহ থেকে সব সময় উত্থিত হচ্ছে এক ধরণের স্পন্দন।

সেই স্পন্দন ঢেউয়ের আকারে বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। হার্ৎস আরও প্রমাণ করেন, এই তরঙ্গ এক ধরণের শক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই শক্তি আলো এবং তাপ শক্তির সমগোত্রীয়। তফাৎটা হচ্ছে, আলো এবং তাপকে আমরা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে অনুভব করতে পারি কিন্তু ওকে ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করা যায় না। অদৃশ্য সেই শক্তি তরঙ্গকে তখনই নাম দেওয়া হয়েছিল বেতার তরঙ্গ।

বেতার তরঙ্গকে নিয়ে এবার বিজ্ঞানী মহলে গবেষণার হিড়িক পড়ে গেল। একে একে উদ্‌ঘাটিত হলো আরও বহু তথ্য। জানা গেল, মেঘে বিদ্যুৎস্ফুরণের সময় তাপ ও আলোর সঙ্গে সঙ্গে বেতার তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রদের দেহাভ্যন্তরে যে সব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটে চলেছে তার ফলেও নির্গত হচ্ছে বেতার রশ্মি এবং এরাও তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়ছে মহাবিশ্বে।

পরের দিকে আরও প্রমাণিত হলো, বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য আলোক রশ্মির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অপেক্ষা বেশী হলেও কম্পাঙ্ক কম। আর ঐ কম কম্পাঙ্কের জন্যই ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয়।

বেতার তরঙ্গ সম্বন্ধে গবেষণা করে আরও কয়েকটি অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শোনালেন বিজ্ঞানীরা। প্রথমত তাঁরা জানালেন, ঐ তরঙ্গকে যন্ত্রের দ্বারা সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং কোন বৈদ্যুতিক গ্রাহক যন্ত্রের দ্বারা সেই তরঙ্গকে পুনরায় ধরাও যেতে পারে। দ্বিতীয়ত বেতার তরঙ্গের উপর আলো কিংবা শব্দের ছাপ ফেলে বহুদূরে এগিয়ে দেওয়া যেতে পারে এবং গ্রাহক যন্ত্রের মাধ্যমে তাদের বেতার তরঙ্গ থেকে পৃথক করে নেওয়া যেতে পারে।

বেতার তরঙ্গের পরবর্তী ঐ গুণদুটো বিজ্ঞানীদের খুবই উৎসাহী করে তোলে এবং অনেকেই বিনা তারে বেতার তরঙ্গের মাধ্যমে বহু দূর দূরান্তরে খবর প্রেরণের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেন। মুখের কথাকে বিনা তারে পৃথিবীর এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত চালান করে দেওয়া যাবে— এ কী কম আশ্চর্যের কথা!

বহু দেশের বহু বিজ্ঞানী এবার বসে গেলেন বিনা তারে সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করতে। শেষ পর্যন্ত এই প্রত্যাশাকে ১৯০১ সালে পূরণ করলেন ইতালীয় বিজ্ঞানী মার্কনি। কোন তারের যোগাযোগ ব্যতীত মুখের কথাকে ইংলিশ চ্যানেলের ওপাশে পার করে দেওয়ায় "বেতার বার্তা আবিষ্কারকের মর্যাদা লাভ করলেন মার্কনি এবং একরকম রাতারাতি জগৎপূজ্য হলেন।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, বিনা তারে সংবাদ প্রেরণ একমাত্র মার্কনির দ্বারা সম্ভবপর হয়নি। বহু বিজ্ঞানীর বহু গবেষণাকে অবলম্বন করে মার্কনি সফল হয়েছেন। এই পর্যায়ে ভারতীয় বিজ্ঞানী আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর অবদানও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বেতার তরঙ্গকে নিয়ে তিনি দীর্ঘকাল গবেষণা করেছিলেন এবং বিনা তারে শব্দ প্রেরণের কৌশলও আবিষ্কার করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, পরাধীন ভারতের বিজ্ঞানী বলে যথা সময়ে তাঁর আবিষ্কারের কথাকে প্রচার করতে পারেননি। তাই পরে

আবিষ্কার করেও যশোমাল্যে ভূষিত হয়েছেন মার্কনি।

পরের দিকে বেতার তরঙ্গকে নিয়ে আরও গবেষণা হয়েছে এবং বহু মূল্যবান তথ্য জানা গেছে। শেষোক্ত পর্যায়ে ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহার অবদান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

এবার আমাদের প্রায় সবারই পরিচিত ঐ বেতার যন্ত্র বা রেডিও সেটের কথায় আশা যেতে পারে। ঐ যন্ত্রের মাধ্যমে ঘরে বসে আমরা দেশ-দেশান্তরের খবর শুনতে পাই, শুনতে পাই গান, বাজনা, নাটক, কথিকা, ভাষণ ইত্যাদি কত কী! এটি একদিকে যেমন শিক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম, অপরপক্ষে তেমনই অবসর বিনোদনের একটা বড় উপকরণও। কিন্তু জন্মলগ্নে, এটি এমন ধরণের ছিলনা। পরবর্তীকালে বিজ্ঞানীদের নিরলস সাধনার ফলই আজকের আকাশবাণী। এমনকি আবিষ্কারক মার্কনিও ওর উন্নতির জন্য সারাজীবন প্রাণপাত পরিশ্রম করে গেছেন।

আকাশবাণী থেকে আমরা যা কিছু শুনতে পাই, সেগুলো প্রচারের এক একটি কেন্দ্র আছে। কেন্দ্রে থাকে প্রেরক যন্ত্র। যন্ত্রের সাহায্যে প্রথমে সৃষ্টি করা হয় উচ্চ হারের বিদ্যুৎ স্পন্দন—যা বেতার তরঙ্গ ছাড়া অন্য কিছু নয়। প্রেরক যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে আকাশতার বা এ্যারিয়াল। যে কথা বা গান বাজনাকে প্রচার করা হবে তাকে আগে রেডিও ভাল্বের দ্বারা বিবর্ধিত করা হয়। অতঃপর সেই বিবর্ধিত শব্দকে যন্ত্রের মাধ্যমে উৎপন্ন বেতার তরঙ্গের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়। অবশেষে এ্যারিয়ালের সাহায্যে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

আমরা জানি, পৃথিবীকে ঘিরে যে বায়ুমণ্ডলটা রয়েছে তার সবচেয়ে উপরের স্তরের নাম আয়নমণ্ডল। পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল ঊর্ধ্বে উক্ত স্তরটি বিদ্যমান। এত উচ্চ বলে সেখানকার বায়ুকণা অত্যন্ত বিরল এবং সেই বিরল কণিকাগুলো আবার সূর্য থেকে আগত কতকগুলো রশ্মির দ্বারা আয়নিত। অর্থাৎ রশ্মিগুলি বিরলভাবে অবস্থানকারী অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতির পরমাণু থেকে ইলেকট্রনকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে একটা ভয়াবহ স্তরে রূপান্তরিত হয়ে আছে। আর ঐ কারণে উপরের আয়নমণ্ডল নামক স্তরটি একটি তড়িৎ পরিবাহী স্তরের সৃষ্টি করেছে।

আকাশবাণীর কেন্দ্র থেকে যে বেতার তরঙ্গকে প্রেরণ করা হয়, সেটি ঊর্ধ্বে আয়নমণ্ডলে বাধা পেয়ে প্রতিফলিত হয় পৃথিবী পৃষ্ঠে। আমরা আমাদের গ্রাহকযন্ত্রের মাধ্যমে সেই প্রতিফলিত বেতার তরঙ্গকে ধরে থাকি এবং গ্রাহক যন্ত্রের যান্ত্রিক ব্যবস্থায় তরঙ্গের উপর ছাপ দেওয়া শব্দকে আবকল শুনতে পাই।

বেতার তরঙ্গের গতিবেগ আলোকের গতিবেগের সমান। অর্থাৎ সেকেণ্ডে এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। যান্ত্রিক পদ্ধতিতে উৎপন্ন বেতার তরঙ্গকে চল্লিশ মাইল ঊর্ধ্বে আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে সময় অবশ্য কিছুটা ব্যয় হয়। কিন্তু সে সময়টা এত নগন্য যে, কোন সূক্ষ্ম অনুভূতিশীল

যন্ত্র ছাড়া পরিমাপ করা যায় না। সময়টা এক সেকেণ্ডের ভগ্নাংশ মাত্র। অপরপক্ষে বিভিন্ন কেন্দ্রগুলি বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করে। তাই একই জায়গায় সব কেন্দ্রের অনুষ্ঠানে তালগোল পাকায় না।

✪ টেলিভিশন ✪

বিনা তারে শব্দ প্রেরণ কৌশল আবিষ্কৃত হওয়ার পর বিজ্ঞানীরা চিন্তা করতে শুরু করেন, উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করলে হয়ত ছবিকেও বহু দূরবর্তী জায়গায় চালান করা যেতে পারে। যন্ত্রের মাধ্যমে মানুষের গলার স্বর শোনা যাবে, সেই সঙ্গে দেখা যাবে তার অবয়বখানা—কী মজাইনা হবে এখন!

এই উদ্দেশ্যে সেদিন অনেকেই শুরু করেছিলেন গবেষণা। প্রথম দূরবর্তী স্থানে কেবলমাত্র ছবি পাঠাতে সক্ষম হয়েছিলেন বিশিষ্ট জার্মান বিজ্ঞানী ফর্ণ। ১৯২২ সালে বিনা তারে ইতালি থেকে বৃটিশ যুক্তরাজ্যে কতকগুলো ছবিকেই শুধু প্রেরণ করেছিলেন। বক্তার কণ্ঠস্বর সহ তার প্রতিমূর্তিকে পাঠাতে সক্ষম হননি।

এই ঘটনার মাত্র দুবছর পরে ১৯২৪ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী রেঞ্জার আর একটু এগিয়ে যান। তিনি বিশেষ দক্ষতার সঙ্গে আটলাণ্টিক মহাসাগরের এপার থেকে ওপারে কতকগুলো ছবিকে দর্শকের সামনে উপস্থাপিত করতে সমর্থ হন। ওদের এই প্রচেষ্টাগুলিকে ঠিক ঠিক টেলিভিশন বলা যায় না, তবে টেলিভিশনের সূচনা বলা যেতে পারে। কথিত আছে, সেকালে ইংলণ্ডের বেতার কেন্দ্রগুলো রেঞ্জারের পদ্ধতিতে ছবি আদান প্রদান করতো।

আজকের টেলিভিশন বলতে আমরা যা বুঝি, তার প্রথম প্রবর্তন হয়েছিল ইংলণ্ডে—১৯২৭ সালে। আবিষ্কর্তার নাম জন লোগি বেয়ার্ড। ভদ্রলোক ছিলেন স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী। অপরাপর অনেকের মত তিনিও এ বিষয়ে গবেষণা করতেন। শেষপর্যন্ত টেলিভিশন তাঁর হাতেই ধরা দিয়েছিল।

বেয়ার্ড অবশ্য প্রথমে খুব দূরে কোন মানুষ বা কোন দৃশ্যাবলীকে প্রেরণ করতে সমর্থ হননি। প্রথম যে পরীক্ষাটি দেখিয়ে ছলেন তখন দূরত্বটা ছিল কয়েকশ গজ মাত্র। তাঁর পরীক্ষার জায়গা থেকে কিছু দূরে একটি ঘরের মধ্যে দর্শকদের বসিয়েছিলেন। দর্শকদের সামনে ছিল একটা যন্ত্র ও একটা পর্দা। তারপর পরীক্ষাগারে চলে যান। এক সময় দর্শকরা দেখতে পায় সিনেমার পর্দার মত সচল মানুষের মূর্তি। সেদিন সত্য সত্যই বিস্মিত হয়েছিলেন দর্শকরা এবং টেলিভিশন আবিষ্কারের গৌরবও লাভ করেছিলেন বেয়ার্ড।

অতঃপর ঐ বেয়ার্ডই গবেষণার মাধ্যমে টেলিভিশনের আরও উন্নতি করেন।

ফলে দূরত্বকে আরও কিছুটা বাড়াতে সক্ষম হন। অতঃপর মার্কিন বিজ্ঞানী জোরকিন বেয়ার্ডের পদ্ধতির কিছুটা পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেন। আর ঐ জোরকিনের পদ্ধতি অবলম্বন করেই আমেরিকার রেডিও কর্পোরেশন প্রথম টেলিভিশন প্রদর্শনের সূচনা করে। আজকের টেলিভিশন ঐ পদ্ধতিরই উন্নত রূপ।

টেলিভিশন পদ্ধতিতে চিত্র উপস্থাপনার মূলে আছে আমাদের চোখের সামান্যতম ত্রুটি। কোন বস্তুকে আমাদের চোখের সামনে ধরলে সেটি সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কে অনুভূতি জাগাতে সক্ষম হয় না। এক সেকেণ্ডের প্রায় সাত ভাগের একভাগ সময় ব্যয়িত হয় অনুভূতি জাগাতে এবং তখনই বস্তুকে আমরা দেখতে পাই। যদিও সময়টা অতি স্বল্প তবুও ঐ স্বল্প সময়ের মধ্যে কোন একটি ছবিকে উপস্থাপিত করলে এবং সেই ছবিটিকে সরিয়ে নিয়ে তার জায়গায় অপর একটি ছবিকে উপস্থাপিত করলে আমাদের চোখ কিছুতেই ধরতে পারে না। ঐ ত্রুটিটুকু আছে বলেই সম্ভব হয়েছে টেলিভিশন।

এবার টেলিভিশন প্রদর্শনের পদ্ধতিটির সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল এবং যে পদ্ধতিতে বেয়ার্ড প্রথম টেলিভিশন প্রদর্শন করেছিলেন সেই পদ্ধতিটিরই বর্ণনা করা হলো এখানে।

বেয়ার্ড মূল যে যন্ত্রটির সাহায্যে গ্রহণ করেছিলেন সেটির নাম ফটো ইলেকট্রিক সেল। গোটা ছবিটাকে সরাসরি চালান করার চেষ্টা না করে ছবিকে বা কোন দৃশ্যকে কতকগুলো ভাগে ভাগ করেছিলেন। ছবি বা দৃশ্যের কোন বিন্দুতে আলো ফেলে যদি সে আলোককে ফটো ইলেকট্রিক সেলে পাঠানো যায় তাহলে সেই বিন্দুর আলো তার ক্ষমতা অনুযায়ী বিদ্যুৎ প্রবাহে রূপান্তরিত হবে। এই সত্যকে কাজে লাগিয়ে বেয়ার্ড সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অসংখ্য ছিদ্রবিশিষ্ট একটা গোলাকার ধাতব চাকতিকে ব্যবহার করেছিলেন। সেই চাকতিটিকে আবার ছবির উপর রেখে অতি দ্রুত ঘোরানোর ব্যবস্থা করেছিলেন এবং আর্কল্যাম্প থেকে আগত আলোকরশ্মিকে লেন্সের সাহায্যে চাকতির উপর ফেলেছিলেন। সেই আলো চাকতির ছিদ্রপথে গিয়ে ছবির উপর পড়েছিল।

যেহেতু চাকতিটিকে অতি দ্রুত ঘোরাবার ব্যবস্থা ছিল এবং ঘোরাবার এমন ব্যবস্থা ছিল যে আলো ছবির উপর প্রতিটি ছিদ্রের ভেতর দিয়ে ক্রমিক পর্যায়ে পর পর গোটা ছবিটাকে আলোকিত করেছিল। ছবির বিভিন্ন বিন্দু থেকে যে আলো নির্গত হয়েছিল, তার পরিমাণ ছিল বিভিন্ন। কম শক্তির আলো ফটো ইলেকট্রিক সেলে কম শক্তির বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করেছিল এবং বেশী শক্তির আলো সৃষ্টি করেছিল বেশী শক্তির বিদ্যুৎপ্রবাহ। ভিন্ন ভিন্ন শক্তি সম্পন্ন সেইসব বিদ্যুৎপ্রবাহকে বেতার প্রেরক যন্ত্রের দ্বারা উৎপন্ন উচ্চহারের বিদ্যুৎস্পন্দনের উপর চাপিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছিল মিশ্র বিদ্যুৎ তরঙ্গ। আর এখানেও ব্যবহার করা হয়েছিল প্রেরক যন্ত্র, আকাশ তার এবং মাইক্রোফোন।

দৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে গান-বাজনা কিংবা কথাকে প্রেরণ করার জন্য বেয়ার্ড

দ্বিতীয় একটি প্রেরক যন্ত্র, একটি আকাশতার এবং একটি মাইক্রোফোনের ব্যবস্থা রেখেছিলেন—ঠিক সেই বেতার প্রেরকযন্ত্রের মতই।

একই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল গ্রাহক যন্ত্রের ক্ষেত্রেও। এক্ষেত্রে যে আকাশতারের ব্যবস্থা ছিল তাতে ধরার ব্যবস্থা হয়েছিল প্রেরকযন্ত্র কর্তৃক প্রেরিত মিশ্র বিদ্যুৎ তরঙ্গ। এখানকার প্রধান কাজ ছিল মিশ্র বিদ্যুৎ তরঙ্গ থেকে কম ও বেশী শক্তি সম্পন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহকে পৃথক করে নেওয়া এই উদ্দেশ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহকে বিশেষ একধরণের বায়ুশূণ্য টিউবের ভেতর দিয়ে চালনা করা হয়েছিল।

প্রেরক যন্ত্রের মত গ্রাহকযন্ত্রেও একটি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট ধাতব চাকতিকে ঘোরাবার ব্যবস্থা ছিল। টিউব থেকে আলোক রশ্মি এখানেও চাকতির ছিদ্র পথে চালিত হয়ে পূর্বের মত পরপর ক্রমিক পর্যায়ে পর্দার উপর পড়েছিল। গান ও কথাকে শোনার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল বেতার গ্রাহকযন্ত্র, আকাশতারও মাইক্রোফোন।

জোরিকিনের পদ্ধতিতে প্রেরক যন্ত্রে ফটো ইলেকট্রিক সেলের পরিবর্তে ইকনোস্কোপ নামে যন্ত্র এবং গ্রাহক যন্ত্রে বায়ুশূন্য টিউবের পরিবর্তে কিনোস্কোপ নামে আর একটি যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছিল। বর্তমানে উক্ত পদ্ধতিকেই অনুসরণ করা হয় তবে উন্নত হয়েছে অনেকখানি।

টেলিভিশনের উন্নতি সম্ভব হয়েছে অর্থিকন, ইমেজ অর্থিকন, টিভিকন প্রভৃতি যন্ত্র আবিষ্কারের মাধ্যমে। উক্ত যন্ত্রগুলি ব্যবহারের ফলে ছবি বা দৃশ্যের সুস্পষ্ট রূপতো পাওয়া যায়ই অধিকন্তু স্বাভাবিক রঙও দেখা যায়। তবে টেলিভিশনের পর্দার উপর খুব বড় আকারের ছবি পাওয়া এখনও সম্ভবপর হয়নি।

টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে গ্রাহক যন্ত্রের দূরত্ব অধিক হলে ছবি অস্পস্ট হয়ে উঠে। এর কারণ, প্রেরক যন্ত্র থেকে ১০ সেণ্টিমিটারের কম তরঙ্গ দৈর্ঘ্যর হ্রস্ব-তরঙ্গের মিশ্র বিদ্যুৎস্পন্দনের সৃষ্টি করা হয়। হ্রস্ব তরঙ্গের অসুবিধা অনেক। সাধারণত আয়নমণ্ডলে প্রতিফলিত হয়ে এগুলি খুব বেশী দূরে যেতে পারে না। তাই রিলে ব্যবস্থা করতে হয়। এই কাজে বর্তমানে কৃত্রিম উপগ্রহদের নিয়োগ হয়েছে এবং হচ্ছে।

✪ ফনোগ্রাফ ✪

বার বছরের এক বালক রেলগাড়ীতে খবরের কাগজ ফেরি করে বেড়াতো। একবার স্টেশন মাষ্টারের ছোট্ট ছেলেকে নিশ্চিত ট্রেন দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করায় কৃতজ্ঞ স্টেশন মাষ্টার বালকটির সাহসিকতার জন্য টেলিগ্রাফ অফিসে একটা কাজ জুটিয়ে দিয়েছিলেন।

টেলিগ্রাফ অফিসে খবরের কাগজের জন্য রাতে আসতো নানা ধরণের খবর। প্রচুর খবর সংগ্রহ করতে হতো বলে যাঁরা রাতে কাজ করতেন তাঁরাই বেতন

বেশী পেতেন। বালকটি একসময় বুঝতে পারলো, রাতে কাজ না করতে পারলে পদোন্নতির আশা নেই।

রাতে যাঁরা কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে একজন প্রৌঢ় ছিলেন। বালক তাঁকেই ধরে বসলো শেষ পর্যন্ত। বললো—রাতে আপনার হয়ে আমিই কাজটা করে দেবো।

ভদ্রলোক সহজেই সম্মত হয়ে গেলেন। আর বালকটিও দিনে ও রাতে উভয় সময়ে শুরু করলো কাজ করতে।

দিন যায়। বালকটিও ধীরে ধীরে ঐ কাজে রপ্ত হয়ে উঠে এবং রাতে করারও সুযোগ পায়। কিন্তু বাহিরের অফিস থেকে ঐ অফিসে যে ভদ্রলোকটি খবর পাঠাতেন, তিনি বদলি হয়ে গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন নতুন এক ভদ্রলোক। ইনি খুব দ্রুত খবর পাঠাতেন বলে বালকের বেশ অসুবিধা হতে লাগলো।

বালকটি কোন কিছুতে হার মানার পাত্র ছিল না। বুদ্ধি করে দুটি পুরোন মোর্সের টেলিগ্রাফ যন্ত্র সংগ্রহ করলো। যেহেতু খবর আসতে টরে টক্কার মাধ্যমে। তাই বালকটি একটি যন্ত্রে খুব পাতলা কাগজের ফালি কেটে পরিয়ে দিয়ে অফিসের মূল যন্ত্রের সঙ্গে জুড়ে দিল। ফলে খবর আসায় আপনা হতে ঐ পাতলা কাগজটার উপর দাগ পড়ে গেল।

খবরের শেষে বালকটি ঐ কাগজটাকে বার করে নিয়ে অপর যন্ত্রটিতে পরিয়ে কাগজকে ধীরে ধীরে টানতে শুরু করলো। দেখলো, শব্দের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে।

খুব খুশি হলো বালক। এবার থেকে রাতে আর কষ্ট করে জেগে থাকার দরকার হলো না। কাগজগুলোকে খুলে নিয়ে ধীরে সুস্থে খবর সংগ্রহ করতে লাগলো এবং নির্ভুলও হলো।

এইভাবে চলেছিল বেশ কিছুকাল। তারপর একদিন এলো আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচনের পালা। চারদিকে ভয়ানক সাড়া। প্রতিদিনের খবর সংগ্রহের জন্য প্রতিটি মানুষ উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। আর বিভিন্ন মহল থেকে খবরও তেমনই আসছে প্রচুর। যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকায় বালকটির কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। কিন্তু হঠাৎ একদিন যন্ত্র তার বিগড়ে গেল। পরদিন কোন খবর আর দিতে পারলোনা বালক।

চারদিকে পড়ে গেল হৈ চৈ। সাংবাদিক থেকে আরম্ভ করে কর্মচারীরা সবাই ছুটে এলেন। বুঝতে পারলেন, বালকটির নিতান্ত ছেলেমানুষীর জন্য এমন কাণ্ডটি ঘটে গেছে। ঊর্ধ্বতম কর্তৃপক্ষ বালকটিকে ক্ষমা করলেন না। বালকের গাফিলতি মনে করে সেইদিনই তাকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন।

কী আর করে বালক! নতুন চাকরির চেষ্টা করলেন, কিন্তু কেউ তাকে গ্রহণ করলো না। বাধ্য হয়ে টো টো করে ঘুরতে ঘুরতে একদিন এলো নিউইয়র্ক শহরে। ততদিনে হাতে আর একটিও পয়সা নেই। পথে পথে

ঘুরে বেড়ায়, চাকরির অনুসন্ধান করে এবং রাতকাটায় এক বন্ধুর কাছে।

একদিন বন্ধুর মুখে শুনলো, নিউইয়র্ক শহরের বড় টেলিগ্রাম অফিসের প্রধান যন্ত্রটি খারাপ হয়ে গেছে। দেশের যতসব ইঞ্জিনিয়াররা ব্যর্থ হয়ে গেছেন এবং ম্যানেজার পড়েছেন মহা দুর্ভাবনায়।

বালকটি কৌতূহলী হয়ে উঠলো। পরদিন বন্ধুকে না জানিয়ে সোজা উপস্থিত হলো ম্যানেজারের কাছে এবং অনুরোধ রাখলো একটিবার বিগড়ে যাওয়া যন্ত্রটির কাছে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

ম্যানেজার বুঝি মনে মনে হেসেছিলেন অল্প বয়স্ক এই তরুণটিকে দেখে। তবু না বলতে পারলেন না তিনি। নিয়ে গেলেন যন্ত্রটির কাছে।

বালকটি বেশ কিছুক্ষণ ধরে যন্ত্রটিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। তারপর পুট করে কোথায় কী যে করেছিল, সঙ্গে সঙ্গে চালু হয়ে গেল যন্ত্র।

বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন ম্যানেজার। আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন বালককে এবং সেই দিনই বালকটিকে নিয়োগ করলেন অফিসের পরিদর্শক রূপে।

এই বালকটি আর কেউ নয়, স্বয়ং টমাস আলভা এডিসন। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েও ভুলতে পারেননি সেদিনের—সেই মোর্সের টেলিগ্রাফ যন্ত্রের দ্বারা শব্দ নকল করার ব্যাপারটা। বত্রিশ বছর বয়সে আর একটি বড় টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করার সময় পূর্বের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করেছিলেন এক বিশেষ যন্ত্র। ঐ যন্ত্রটিতে একটি সিলিন্ডারের গায়ে পাতলা কাগজ জড়িয়ে রাখতেন আর খবরে সঙ্কেত আপনা হতে লিপিবদ্ধ হয়ে যেতো। পরে সুবিধামত সঙ্কেতগুলিকে উদ্ধার করে নিতেন।

সেই সময় হঠাৎ তাঁর মনে আসে, যন্ত্রের শব্দকে যদি লিপিবদ্ধ করা যায়, তাহলে মানুষের কণ্ঠস্বরকেই বা ধরে রাখা যাবে না কেন?

এ বিষয়ে বেশ কিছুকাল পরীক্ষা চালালেন এডিসন। অবশেষে একদিন করলেন কী! একখানা খুউব পাতলা চামড়াকে একটা গোলাকার আংটার সঙ্গে টান টান করে বাঁধলেন। চামড়ার তলায় সুদৃঢ়ভাবে আটকালেন সুক্ষ্ম অগ্রভাগ বিশিষ্ট একটি লোহার পিনকে। আর পিনের তলায় ধরলেন মোম মাখানো একফালি কাগজ।

এবার চামড়ার উপর মুখ এনে মুখে শব্দ করলেন "লু-উ-উ।" সেই-শব্দে চামড়াটা ওঠানামা করতেই মোম মাখানো কাগজের উপর পিনের অগ্রভাগ ওঠা-নামা করলো এবং দাগ কেটে গেল।

একটা বিশেষ যন্ত্রকে এডিসন পূর্ব থেকে প্রস্তুত করে রেখেছিলেন। দাগ-কাটা কাগজটাকে এবার যন্ত্রে পরিয়ে দিয়ে নিজ হাতেই ওর প্রান্তদেশ ধরে টানতে শুরু করলেন। দেখলেন, অস্পষ্ট হলেও শব্দটিকে উদ্ধার করা গেল। তাঁর এই পরীক্ষার তারিখটি ছিল ১৮৭৭ সালের ১৮ই জুলাই।

অতঃপর এডিসন যন্ত্রটির উন্নতি সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। পরিশেষে ঐ যন্ত্রই ফোনোগ্রাফের রূপ প্রস্তুত হয়। আর এই ফোনোগ্রাফের সাহায্যেই

প্রথমে মানুষের কণ্ঠস্বরকে ধরে রাখা সম্ভব হয়েছিল। গান, বাজনা, বক্তৃতা ইত্যাদিকেও রেকর্ড করে নেওয়া হতো। বর্তমানে উক্ত ব্যবস্থার আরও উন্নতি হয়েছে। এখন বড় বড় ডিস্কের মত রেকর্ডের পরিবর্তে টেপ রেকর্ডের প্রচলন হয়েছে। তবে সে আমলের ডিস্ক রেকর্ড যে একেবারে অচল হয়ে গেছে এমন নয়।

এখানে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় যে, এডিসন যখন গলার স্বরকে যন্ত্রের মাধ্যমে ধরে রাখার ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিলেন—সেদিন কিন্তু কেউ বিশ্বাসই করতে পারেনি। বরং বিদ্রূপ করে বলেছিল এ কেবল এডিসনের একটা পাগলামি ছাড়া অন্য কিছু নয়। যন্ত্র কী কখনও মানুষের গলার স্বরকে নকল করতে পারে? না গলার স্বরকে ধরে রাখতে পারে? তাই যদি হবে, তাহলে মানুষ কেন?

✪ বাষ্পের শক্তি ✪

জেমস নামে একটি ছোট ছেলে ছিল। বড্ড রোগা বলে মা তাঁকে কোন সময় কাছ ছাড়া করতেন না। এমনকি বিদ্যালয়েও পাঠাতেন না— পাছে অন্যান্য ছেলেরা তাকে মারধোর করে কিংবা রাস্তায় কোন অঘটন ঘটিয়ে ফেলে।

ছেলেটিও মায়ের আদর পেয়ে পেয়ে একেবারে ঘরকুনো হয়ে উঠেছিল। অষ্ট-প্রহর মায়ের চারপাশে ঘুর ঘুর করতো, নয়ত চুপচাপ বসে থাকতো।

একদিন একটা বড় লোহার কেটলিতে জল গরম করছিলেন মা। কেটলির মুখে ছিল একটা ঢাকনা। বালক জেমস রান্নাঘরে মায়ের কাছেই বসেছিল। একসময় সবিস্ময়ে দেখলো, কেটলির ঢাকনাটা আপনা হতেই ওঠানামা শুরু করলো এবং ভেতর থেকে সাদা সাদা ধোঁয়া ঢাকনা ঠেলে বেরিয়ে আসতে লাগলো।

বয়স তখন বেশ কম। তবু বালকটি বুঝতে পারলো, ভেতরের জলীয় বাষ্পের চাপের জন্যই ঢাকনাটা ওঠানামা করছে। হঠাৎ তার মনে আসে বাষ্পের শক্তির কথা। ভাবতে শুরু করে, যদি খুব বেশী বাষ্পকে ব্যবহার করা যায়, তাহলে নিশ্চয়ই ওর সাহায্যে অনেক ভারি কাজ সম্পন্ন করা যাবে।

বাষ্পের সেই শক্তির কথা মনে একবারে গেঁথে গেল জেমসের। বড় হয়ে কারিগরি বিদ্যায় ডিপ্লোমা লাভ করে গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন যন্ত্র মেরা-মতের কাজে যোগদান করেন তখন তাঁর হাতে পড়ে নিউকোমেন নামে এক কর্ম-কারের তৈরি একটি ষ্টীম ইঞ্জিনের মডেল। তখনই তাঁর ছেলেবেলায় দেখা বাষ্পশক্তির কথা মনে পড়ে যায় এবং আত্মনিয়োগ করেন বাষ্পীয় ইঞ্জিনের উন্নতি সাধনে।

জেমসের সে সাধনা ব্যর্থ হলো না। একদিন আবিষ্কার করলেন এক নতুন

ধরণের ষ্টীম ইঞ্জিন—যার আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে সারা ইউরোপে একটা প্রচণ্ড ভাবে সাড়া পড়ে গিয়েছিল।

এই জেমস আর কেউ নন, প্রখ্যাত যন্ত্রশিল্পী এবং ষ্টীম ইঞ্জিনের আবিষ্কর্তা জেমস ওয়াট। প্রকৃত পক্ষে পৃথিবীতে যন্ত্রযুগের সূচনা হয়েছে এঁরই হাতে। আর এর পেছনে আছে ছেলেবেলার সেই ছোট্ট ঘটনাটুকু। ছোট্ট যে ফেলনা নয়, অতি সাধারণ ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে মহাবিপ্লবের সূচনা হতে পারে-তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত জেমস ওয়াট।

✪ রেল ইঞ্জিন ✪

জেমস ওয়াট উদ্ভাবিত বাষ্পীয় ইঞ্জিন যখন চারদিকে প্রবল আলোড়ন তুলেছিল তখনই কারও কারও মনে আসে, ঐ বাষ্পীয় ইঞ্জিনের সাহায্যে অবশ্যই গাড়ীকে টানা যেতে পারবে। কিন্তু কেমন ধরণের সেই গাড়ী হবে? কেমন করে গাড়ীতে ইঞ্জিন বসানো থাকবে এবং কেমন করে ইঞ্জিনের সাহায্যে চাকা ঘোরানো যাবে ইত্যাদি নিয়ে শুরু হয়ে গেল জল্পনা কল্পনা।

ফ্রান্সে নিকোলাস কুনো নামে ছিলেন এক ইঞ্জিনিয়ার। ইঞ্জিনের সাহায্যে গাড়ী চালানো—যেন পেয়ে বসলো তাঁকে। শেষে একদিন আবিষ্কার করলেন একটি তিন চাকার গাড়ী। পেছনে বয়লার রেখে বয়লারের বাষ্পকে নিয়োগ করলেন চাকা ঘোরানের কাজে।

কুনোর দীর্ঘকালের প্রচেষ্টা সফল হলো। ঘণ্টায় চারমাইল গতিবেগ নিয়ে চলতে শুরু করলো গাড়ী। উৎসাহিত কুনো একদিন দু-একজন বন্ধুকে নিয়ে চেপে বসলেন গাড়ীতে। কিন্তু দুর্ভাগ্য কুনোর! গাড়ী চলতে চলতে একসময় ধাক্কা খেল রাস্তার ধারে একটা দেওয়ালের গায়ে। বয়লার গেল ফেটে এবং কুনো সহ যাত্রীরা ছিটকে পড়লেন।

আঘাত গুরুতর না হওয়ায় সেদিন প্রাণে রক্ষা পেয়েছিলেন সবাই। তবে সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ায় আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন অনেকে। ধারণা হয়েছিল, গাড়ী একটা বিপজ্জনক জিনিস। ওতে আরোহণ করলে যে কোন সময়ে বেঘোরে প্রাণটা যাবে।

কুনোর ঐ গাড়ী চালানোর ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত সরকার অবধি গড়িয়েছিল এবং সরকার ও জনমতের চাপে গাড়ী তৈরির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারি করে-ছিল। আর বেচারা কুনো! তাঁর গাড়ীটাকে বাজেয়াপ্ত করা হয়নি, তাঁকেও পুরে দেওয়া হয়েছিল জেলখানার ভেতরে।

কুনোর পরে আর একজন ইঞ্জিনিয়ার আর একটি বিশেষ ধরণের গাড়ীর ইঞ্জিন তৈরী করেছিলেন। ইঞ্জিনিয়ারটির নাম উইলিয়ম মার্ডক। এটি ছিল কুনোর ইঞ্জিনের চেয়ে অনেক উন্নত এবং এটিকে রেল ইঞ্জিনের প্রাথমিক রূপ বলা যায়।

গাড়ীর প্রতি জনসাধারণের ভীতির জন্য মার্ডক দিনের বেলায় তাঁর ইঞ্জিনকে বার করতে সাহস করেননি। নিশুতিরাতে সবাই যখন গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন ছিল, ঠিক সেই সময় মার্ডক বার করেছিলেন ইঞ্জিনকে। কিন্তু ইঞ্জিনের প্রচণ্ড শব্দে স্থানীয় সমস্ত মানুষের ঘুম ভেঙ্গে গিয়েছিল। তারা জেগে ওঠে দেখে, ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসতে ফুঁসতে কুচকুচে কালো, বিরাট দৈত্যের মত কী একটা গণগণে আগুন এবং রাশি রাশি গাঢ় ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে আসছে?

দেখা মাত্রই শিউরে উঠেছিল সবাই। কোন এক শয়তানের কীর্তি মনে করে তারা ঘরের দোর বন্ধ করে কাঁপতে শুরু করেছিল।

এদিকে ইঞ্জিনটা যখন বড় রাস্তা বেয়ে গির্জার কাছে এসে পড়লো তখন পাদ্রী সাহেবেরও ঘুম ভেঙ্গে গেল। তিনি ধরে নিলেন, দেশের মানুষের মধ্যে অনাচার এসেছে। তাই তাদের শায়েস্তা করার জন্য ঈশ্বর প্রেরণ করেছেন শয়তানকে। আর শয়তান মশাল জেবলে পথ পরিক্রমা করছে। ঈশ্বরকে সন্তুষ্ট করতে না পারলে অচিরে পৃথিবীটা একেবারে ধ্বংস হয়ে যাবে।

একটিবার মাত্র পথ পরিক্রমা করে মার্ডক ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেন। কিন্তু সে রাতে কেউ আর ঘুমোতে পারলেন না। ভোর হতে এখানে সেখানে জটলা বেঁধে রাতে দেখা সেই ভয়ঙ্কর শয়তানের কথাই আলোচনা করতে লাগলেন সবাই। আর শয়তানটা কোথায় আত্মগোপন করে আছে—তা জানার জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলো।

শেষে আবিষ্কৃত হলো, কাজটা শয়তানের নয়—মার্ডকের। তখন পাদ্রী সাহেব ধরে নিলেন, মার্ডকের দেহেই শয়তান ভর করেছে এবং ঐ মার্ডককে শয়তান মুক্ত করতে না পারলে দেশের চরম সর্বনাশ হবে।

মার্ডকের পরিণাম কুনোর মত না হলেও, গাড়ী আর চালাতে পারলেন না তিনি। কিন্তু যাঁরা এ বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করতেন তাঁরা বুঝতে পারলেন, ইঞ্জিনের দ্বারা প্রচুর মালপত্রকে বহন করে নিয়ে যাওয়া আদৌ কষ্ট সাধ্য ব্যাপার নয়। তাছাড়া অনেক অনেক শক্তিশালী করে গড়ে তোলা যায় ইঞ্জিনকে। তাই জনগণের রোষ এবং সরকারের রোষকে তুচ্ছ করেও গবেষকরা গোপনে গোপনে চালিয়ে গেলেন গবেষণা।

কেটে গেল আরও কতদিন। একসময় ইংলণ্ডের ম্যাঞ্চেস্টার থেকে লিভারপুল পর্যন্ত পাতা হলো রেল লাইন। উদ্দেশ্য ছিল, লোহার পাতের উপর দিয়ে ঠেলা গাড়ীতে করে একটু সহজে বহে নিয়ে যাবে কয়লাকে। সেখানকার কয়লার খনিতে কাজ করতেন এক ইঞ্জিনিয়ার। নাম তাঁর জর্জ স্টিফেনসন। তিনি কর্তৃপক্ষকে জানালেন, যদি আর্থিক আনুকূল্য লাভ করেন তাহলে ইঞ্জিনের সাহায্যে তিনি অল্প সময়ে শ শ টন কয়লাকে যথাস্থানে পেঁছে দিয়ে আসতে পারবেন। শত শত মানুষ এবং শত শত ঠেলাগাড়ীর দরকার হবে না।

কর্তৃপক্ষ ভেবে দেখলেন, স্টিফেনসন যদি কৃতকার্য হন তাহলে প্রচুর খরচ বেঁচে যাবে এবং লাভের অঙ্কটা দাঁড়াবে বিশগুণ। তাই নির্দেশ দিলেন

স্টিফেনসনকে এবং কিছু অর্থও বরাদ্দ করলেন।

স্টিফেনসন একসময় গাড়ী তৈরি করে ইঞ্জিন জুড়ে দিলেন। দিনও স্থির হয়ে গেল। আর কথাটাও রটে গেল চারদিকে। শত শত টন কয়লাকে বোঝাই করে ছুটবে গাড়ী—সে আবার কেমন গাড়ী! দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার দর্শক ছুটে এলো সেই অদ্ভুত ও অত্যাশ্চর্য গাড়ীটিকে দেখার জন্য। পথের দুপাশে জনতার ভিড় একেবারে উপচে পড়লো।

যথাসময়ে স্টিফেনসন গাড়ীতে স্টার্ট দিলেন। হুস হুস করে ধোঁয়া ছড়াতে ছড়াতে এগিয়ে চললো গাড়ী। পথের দুপাশের জনতাকে সাবধান করে দেওয়ার জন্যে সামনে লাল নিশানা হাতে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন এক অশ্বারোহী। কিন্তু গাড়ীর গতি ধীরে ধীরে এমন বেড়ে উঠলো যে, ঘোড়া তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারলো না। বাধ্য হয়ে অশ্বারোহীকে পথ ছেড়ে দিতে হলো। আর নির্দিষ্ট সময়ের ঢের আগেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেল গাড়ী।

ফেরার পথে দর্শকদের আগ্রহাতিশয্যে স্টিফেনসন বহুজনকে গাড়ীতে করে নিয়ে এসেছিলেন। গাড়ীর এমন তীব্র গতি দেখে সবাই সেদিন বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। গতির যে একটা আনন্দ আছে, তাও সেদিন প্রথম মানুষ বুঝতে পেরেছিল।

এমন গতি সম্পন্ন গাড়ীতে সেকালে মানুষ কিন্তু সহজে মেনে নিতে পারেনি। ভীত হয়ে উঠেছিলেন প্রতিটি মানুষ। এমনকি পার্লামেণ্টের সদস্যরাও শঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, রাস্তায় ইঞ্জিন চলাচল করলে পথের দুপাশের গ্রামগুলো পুড়ে ছাই হয়ে যাবে, গরু-বাছুর কাটা পড়বে, পুকুরের জল দূষিত হয়ে উঠবে এবং মাঠে ফসল ফলবে না। খনির মালিক এবং স্টিফেনসনের সর্বনাশা বুদ্ধির জন্য বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল সারাদেশ। দ্বিতীয়বার যাতে এই গাড়ীকে স্টিফেনসন বার করতে না পারেন তার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যও সরকারের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল।

কিন্তু গাড়ী চালানো বন্ধ রাখা হয়নি। ধীরে ধীরে সবাই মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে রেলগাড়ীর প্রচলন সেই থেকেই।

কোথায় ফুটন্ত জলের কেটলি, কোথায় সেই জেমস ওয়াটের বাষ্পীয় ইঞ্জিন, আর কোথায় সেই লৌহ তুরঙ্গ! আশ্চর্য নয় কী!

✪ মোটর গাড়ী ✪

মোটর গাড়ীর আদিরূপ সেই নিকোলাস কুনোর তিন চাকার গাড়ীটি। তাই সরকার সেদিন গাড়ীটিকে বাজেয়াপ্ত করলেও বর্তমানে তাকে সযত্নে রাখা হয়েছে ফ্রান্সের যাদুঘরে।

ফ্রান্স নিজের দেশে গাড়ী তৈরিকে নিষিদ্ধ করে দিলেও সংবাদটা ফ্রান্স ছেড়ে অন্যান্য দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। যাঁরাই উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন তাঁরাই লেগে পড়লেন গাড়ী তৈরি করতে। শেষ পর্যন্ত ডঃ নিকলাউস অটো নামে এক জার্মান ইঞ্জিনিয়ার একদিন বানিয়ে ফেললেন কুনোর মতই আর একটি তিন চাকার গাড়ী। আর এই গাড়ীকে চালাতে গিয়ে কোন দুর্ঘটনা না ঘটায় এবং গতিবেগ বেশী হওয়ায় বহু জনের দৃষ্টি পড়ে গাড়ীটির উপর। ধনীরা চাইলেন, এমনি একটি গাড়ী পাওয়ার জন্যে। আর অটোসাহেবও জুড়ে দিলেন ব্যবসা।

অটোসাহেবের পর সেই তিন চাকার গাড়ীর আরও উন্নতি সাধন করেছিলেন কার্লবেঞ্জ নামে আর এক জার্মানি ভদ্রলোক। কথিত আছে, কার্লবেঞ্জ গাড়ী তৈরি করে নিজে চালাতে সাহসী হননি। ফেলেই রেখেছিলেন ঘরে। একদিন অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাঁর দুই বালকপুত্র গাড়ী চালাতে শুরু করেন এবং প্রায় দুশ' কিলোমিটার পথ পরিক্রমা করে ফিরে আসে বাড়ীতে।

শোনা যায়, ছেলেদের বাড়ী ফেরার আগেই বেঞ্জ সাহেব ফিরে এসেছিলেন এবং গাড়ী ও দু-দুজন ছেলেকে ঘরে না দেখে একেবারে পাগলের মত হয়ে উঠেছিলেন। পরে ছেলেরা বাড়ী ফিরলে তিনি নাকি তাদের ভয়ানকভাবে মারধোরও করেছিলেন।

যাই হোক বেঞ্জের গাড়ীর পরীক্ষা এইভাবেই হয়ে যায়। পরে মাথা ঠাণ্ডা হলে বেঞ্জ সাহেব গাড়ীটি সম্বন্ধে নতুন করে চিন্তা ভাবনা শুরু করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই জুড়ে দেন গাড়ী তৈরির ব্যবসা।

চার চাকার গাড়ী প্রথম তৈরি করেন ডেমলার সাহেব। ইনিও ছিলেন এক ইঞ্জিনিয়ার এবং জাতিতে ছিলেন জার্মানি। প্রথম জীবনে কাজ করতেন অটোসাহেবের কারখানায়। পরে নিজেই শুরু করেন গাড়ীর ব্যবসা। পেট্রোল ইঞ্জিন ব্যবহার করে গাড়ীর গতিকে অনেকখানি বাড়াতে পেরেছিলেন তিনি এবং তাঁর গাড়ী অতি অল্পদিনের ভেতরে দেশ-বিদেশে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছিল। চাহিদা এত বেড়ে উঠেছিল যে, ডেমলার সাহেবের একার পক্ষে সরবরাহ করা সম্ভব হলোনা। তখন ডেমলার সাহেবই ডেকে আনলেন বেঞ্জ সাহেবকে এবং উভয়ের যৌথ উদ্যোগে স্থাপিত হলো বিরাট এক কারখানা। ঐ কারখানা যেসব গাড়ী তৈরি করলো তাদের নাম দেওয়া হলো "মার্সিডিজ বেঞ্জ" গাড়ী। ডেমলার সাহেবের মেয়ে মার্সিডিজ এবং বেঞ্জ সাহেবের নিজের নাম জুড়ে অনুরূপ নামকরণ করা হয়েছিল। আজও এ নাম চলে আসছে।

মোটর গাড়ীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করেছেন "হেনরি ফোর্ড।" একমাত্র অধ্যবসায়ের ফলে অত্যন্ত দারিদ্র অবস্থা দেখে বিশ্বের এক শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারক ও ধনীরূপে পরিচিত হতে পেরেছিলেন। আজকের দিনে বাস, লরি, ট্যাক্সি, ইত্যাদি নানাধরণের যে সব গাড়ী আমরা দেখতে পাই—ওদের সব কিছুর রূপকার হেনরি ফোর্ড। তাঁর অসাধারণ কীর্তির জন্য বলা হয় "হেনরি ফোর্ড মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে চাকার উপর স্থাপন করে গেছেন।"

✪ সাইকেল ✪

সাইকেল তৈরির ইতিহাস এক আধ বছরের নয়। প্রায় শ' তিনেক বছরের প্রচেষ্টায় সাইকেল লাভ করেছে তার প্রকৃত রূপ। এমনও অনেকে মনে করেন, ইতালির রেনাসাঁস যুগের প্রখ্যাত চিত্রকর ও প্রযুক্তিবিদ লিওনার্দো দ্যাভিঞ্চি সাইকেলের প্রথম পরিকল্পনা করেছিলেন।

দু চাকার গাড়ী বা সাইকেলের সাহায্যে দ্রুত যাতায়াত করতে এবং হাঁটার কষ্ট লাঘব করতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে সব প্রচেষ্টা চলছিল সে সব কাহিনী ভালভাবে জানা যায় না। তবে দু চাকার গাড়ীর তৈরির চেষ্টা যে কেউ করেন নি এমন কথা জোর দিয়ে বলা যায় না। যতদূর জানা গেছে, তাতে মনে হয় সপ্তদশ শতাব্দির মধ্যভাগে এবং একেবারে শেষ দশকে জাঁ থীসন এবং দ্য সিওরাক নামে দুজন ফরাসী ভদ্রলোক দু-চাকাওয়ালা গাড়ী তৈরি করেছিলেন। ঐ গাড়ীগুলিকে অবশ্য ঠিক ঠিক সাইকেল বলা যাবে না। কারণ, ওদের সামনে ও পেছনে দুটো চাকা থাকলেও চাকা দুটিকে একটি লম্বা কাঠের দণ্ডের দুপাশে এমন দৃঢ়ভাবে আটকানো হয়েছিল যে-চাকাগুলো ভালভাবে ঘুরতে পারতো। দণ্ডের মাঝখানে ছেঁড়া নেকড়ার ফালিকে জড়িয়ে "সিটের" ব্যবস্থা করেছিলেন ভদ্রলোক। হাতল, ব্রেক, প্যাডেল ইত্যাদি কিছুই ছিল না। শুধু হাতলের বদলে ছিল একটা লম্বাটে ধরণের কাঠের ফালি। ঐ কাঠের ফালিকে ধরে মাটিতে পা ঠেকিয়ে মাঝে মাঝে সামনে ঠেলা দিতেন। তাতে চাকা দুটো ঘুরতে ঘুরতে কিছুটা পথ এগিয়ে যেতো। শোনা যায়, সেই সিভরাক নিজের তৈরি ঐ সাইকেল ছাড়া এক পাও হাঁটতেন না।

দ্য সিভরাকের দেখাদেখিই অনেকে সাইকেল তৈরী শুরু করেন। বলা বাহুল্য, সে সব সাইকেল সিভরাকের অনুকরণ ছাড়া কিছুই ছিল না। পরবর্তী প্রায় একশ বছর কাল ওর তেমন জনপ্রিয়তাও ছিল না। তবে ওর উন্নতির প্রতি অনেকে যত্নবান হয়েছিলেন এবং কিছুটা নতুনত্ব আনিয়েছিলে কাল ভেইজিন নামে এক ইংরাজ ভদ্রলোক ও ব্যারন ভন ড্রাইস নামে জনৈক জার্মান। গতিবেগ বাড়ানোর জন্য ওঁরা নানারকম পরীক্ষা-নিরিক্ষাও চালিয়েছিলেন। কেউ দুটো সমান আকারের চাকা, কেউ বা সামনে বড় এবং পেছনে ছোট চাকা যুক্ত করেছিলেন ইত্যাদি। হাতলের কিছুটা উন্নতি হলেও চালাতে হতো মাটিতে পা ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে।

উনবিংশ শতাব্দীতে সাইকেলের বিবর্তন শুরু হয় দ্রুতগতিতে। আত্মপ্রকাশ করতে থাকে একে একে নতুন ধরণের সাইকেল। নির্মাতাদের মধ্যে ব্যারন দ্য গ্যাভারবর্নের নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। ইনি সাইকেলে প্রকৃত হাতল যুক্ত করেন এবং গতিবেগ বাড়ানোর জন্য চাকার তলায় লোহার পাত পরিয়ে দেন।

গ্যাভারবনের সাইকেল যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। তাই তাঁকে খুলতে হয়েছিল সাইকেল তৈরি কারখানা। এই সাইকেলের নাম ছিল ডাণ্ডি

হর্স বা বাবুঘোড়া। সমগ্র ফ্রান্স ও ইংলণ্ড ডাণ্ডি হর্সে ভরে গিয়েছিল। তবে এতেও প্যাডেল ছিল না, সেই মাটিতে পা ঠেকিয়ে ঠেলা দিতে হতো।

আধুনিক সাইকেলের প্রথম রূপকার স্কটল্যাণ্ডের প্যাট্রিক ম্যাকমিলান। ইনিই প্রথম সাইকেলে প্যাডেল যুক্ত করেন এবং সেই থেকে সাইকেল চালনার প্রধান অসুবিধা দূরীভূত হয়। তবে ম্যাকমিলান সাহেবের সাইকেলের দুটো চাকা সমান ছিল না। সামনের চাকা অপেক্ষা পেছনের চাকাটি ছিল খুবই ছোট।

গ্যাভারবনের পর প্যাডেল ও চাকাকে নিয়ে নতুন উদ্যমে শুরু হয় গবেষণা। আত্মপ্রকাশ করে "বন শেকার," "কর্ভেন্ট্রি ট্রাই সাইকেল," রোভার প্রভৃতি নানা ধরণের সাইকেল। পরিশেষে বহু জনের অভিজ্ঞতা থেকে প্রমাণিত হয়, সাইকেলের দুটো চাকা সমান হলে সুবিধা বেশী পাওয়া যায় এবং নিরাপদও।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত সাইকেলের চাকার তলায় টায়ার-টিউব কিন্তু পরানো হতো না। তবে হাতল, সিট, প্যাডেল প্রভৃতির উন্নতি হয়েছিল অনেকখানি। সাইকেলের চাকার তলায় রবারের টিউব পরিয়ে গতিবেগ বাড়িয়েছেন ডানলপ সাহেব। এ সম্বন্ধে একটি গল্পও প্রচলিত আছে।

ডানলপ সাহেব ছিলেন আয়ারল্যাণ্ডের লোক এবং পেশায় ছিলেন ঘোড়ার ডাক্তার। তাঁর ছেলে জনি দূরের একটা স্কুলে পড়তে যেতো বলে ডানলপ সাহেব তাঁকে কিনে দিয়েছিলেন একটি সাইকেল।

জনি ভাল সাইকেল চালাতে পারতো। একবার স্কুলে সাইকেল 'রেসে' নাম দিয়ে বাবাকে এসে বললো—বাবা, আমার সাইকেলটাতে বড্ড বেশী ঝাঁকুনি লাগে। আমাকে নতুন একটা সাইকেল কিনে দাও। আমি সাইকেল রেসে যোগ দিয়েছি।

ডানলপ সাহেব ছেলের কথা শুনে খুব করে ভাবলেন। একসময় তাঁর মনে হল, নতুন সাইকেল কিনলেও ঝাঁকুনি লাগবে। তার চেয়ে ঝাঁকুনি না লাগার ব্যবস্থা কী করা যায় না।

ডানলপ সাহেব নতুন সাইকেল আর কিনলেন না। বুদ্ধি করে রেসের আগেরদিন জনির সেই পুরনো সাইকেলের চাকার তলায় বাগানে জল দেওয়ার যে রবারের পাইপটি ছিল তা থেকে দুটো টুকরা কেটে এনে আচ্ছা করে বেঁধে দিলেন।

জনি সাইকেলে চেপে দেখলো, সত্যই ঝাঁকুনি আর লাগছেনা। গতিও বেড়েছে অনেকখানি খুশি হয়ে যোগদান করলো রেসে।

বলা বাহুল্য রেসে প্রথম হয়েছিল জনি। অপরাপর সাইকেলকে অনেক পেছনে পড়ে থাকতে হয়েছিল। আর সাইকেল যে এত বেগে ছুটতে পারে—তা দেখে দর্শকরাও বিস্মিত হয়েছিল।

এবার ডানলপ সাহেবের মাথায় ব্যবসার চিন্তা আসে। তিনি নিকটস্থ এক সাইকেল তৈরির কারখানার অংশীদার হয়ে চাকার তলায় টায়ার ও টিউব পরাতে শুরু করলেন। আর তখনই ডানলপ সাহেবের সাইকেলের একেবারে

জয় জয়কার পড়ে গেল। বেশ কিছুকাল ধরে একচেটিয়া ব্যবসা করে নিলেন তিনি।

এরপর থেকে সর্বত্রই শুরু হয়ে গেল চাকার তলায় টায়ার টিউব পরানো। মাটির ঘর্ষণকে উপেক্ষা করতে এর জুড়ি নেই বলে মোটর গাড়ীর চাকার তলায়ও টায়ার টিউবের ব্যবস্থা। আর ঐ টায়ার টিউবের ক্ষেত্রে একমাত্র ডানলপ কোম্পানীই সেদিন বিশ্বের সেরা বলে বিবেচিত হয়েছিল এবং এখনও সে সুনাম অক্ষুণ্ণ আছে।

✪ উড়োজাহাজ ✪

পাখীরা আকাশে উড়ে বেড়ায়। সুন্দর ডানা দুটি মেলে দিয়ে বায়ু সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে যখন তারা নীল আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যায় তখন আমরা হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। তাদের ডানার ছন্দ আমাদের মনকে উতলা করে, আর যখন তীরবেগে ছুটে যায় তখন মনে রোমাঞ্চ জাগে। তাই সেই কবে আদিকালে মানুষের সখ হয়েছিল আকাশে আকাশে ঘুরে বেড়ানোর জন্য। কিন্তু পাখীর মত তো মানুষের ডানা নেই, তবে কেমন করে উড়বে সে?

পাখীর মত ডানা যুক্ত করে অনেক আগেই মানুষ চেয়েছিল আকাশে উড়ে বেড়াতে। কিন্তু সম্ভব হয়নি। শুধু কল্পনাটাই থেকে গেছে সাহিত্যে—সেই পরীদের ও পাখী মানুষের কল্পনায়। রেনেসাঁস যুগের ইতালির সেই যে চিত্রকর ও প্রযুক্তিবিদ—লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি যাঁর নাম—তিনিও পরিকল্পনা করেছিলেন পাখীর মত দুহাতে দুটি বড় বড় ডানা যুক্ত করে আকাশে গা ভাসিয়ে দিতে। পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করতে একখানা ছবিও এঁকেছিলেন তিনি। তবে প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন কিনা বলা যায় না।

পরবর্তীকালে ভিঞ্চির ছবি উৎসাহিত করেছিল অনেককে। তাঁর পরিকল্পনায় অনুযায়ী বেসিমার নামে এক ভদ্রলোক লোহার ফ্রেমে কাপড় জড়িয়ে পাখীর ডানার মত দুটো ডানা তৈরি করেছিলেন। তারপর ডানা বেঁধে চেষ্টা করেন উড়ে যেতে। তবে বেশী কৃতিত্ব তিনি দেখাতে পারেননি। কেবল একটা বাড়ীর ছাদ থেকে অন্য একটা বাড়ীর ছাদে উড়ে গিয়েছিলেন।

বেসিমারের পরে যিনি কৃত্রিম ডানা জুড়ে উড়তে চেয়েছিলেন—তিনি এক ফরাসী ভদ্রলোক, নাম ব্যাকভিলে। সাহসে ভর করে তিনি ডানা ঝাপটাতে ঝাপটাতে সীন নদী পার হতে চাইলেন। কিন্তু পারলেন না। নদীর একেবারে মাঝখানেই ঝুপ করে পড়ে গেলেন। আবার পড়বিতো পড় একখানা বজরার উপরে। ব্যাকভিলে প্রাণে বাঁচলেন বটে কিন্তু বড় রকমের জখম হলেন।

উক্ত ঘটনার পরে যাঁরা কৃত্রিম ডানা জুড়ে উড়তে চেয়েছিলেন তাঁরা বুঝতে পারলেন, মানুষের পাখীকে নকল করতে যাওয়া ঠিক নয়। বড্ড বিপজ্জনক ব্যাপার এবং উড়তে গেলেই হাত ভেরিয়ে উঠবে এবং প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়বে। তাই তাঁরা চাইলেন অন্য উপায়ে আকাশে উড়তে।

অনেক ভেবে চিন্তে কেউ কেউ ঠিক করলেন, একটা বিশেষ ধরণের যান তৈরি করে আকাশে উঠবেন। কিন্তু কেমন করে তৈরি করা যাবে আকাশে আরোহণের উপযোগী কোন যান!

একসময় ফ্রান্সের দুটি ভাই (মঙ্গলফিয়ে ভ্রাতৃদ্বয়) বুদ্ধি খরচ করে তৈরি করলেন একটা বেলুন। খড়কুটো জ্বালিয়ে ধোঁয়া দিয়ে বিরাট বেলুনটাকে ভর্তি করলেন, তারপর চেপে বসলেন দুই ভাই। গরম ধোঁয়া ঠান্ডা হাওয়ার চেয়ে হাল্কা বলে আস্তে আস্তে আকাশে উঠে গেল বেলুনটা। বেশ কিছুটা পথ অনুকূল হাওয়ায় চালিতও হলো। আকাশের ওঠার প্রথম আনন্দ নিয়ে মাটিতে নেমে এলেন দুই ভাই।

এরপর শুরু হয়ে গেল বেলুনের যুগ। সারা ইওরোপে বেলুন তৈরির ধুম পড়ে গেল যেন। কত কান্ড ঘটল, কত জনে প্রাণ হারালেন, কতজনে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে কোনও রকমে রক্ষা পেলেন, তবু বেলুন তৈরি বন্ধ হলোনা। তবে সফলতা যে কিছু আসেনি এমন নয়। রোজিয়ার নামে এক ভদ্রলোক হাইড্রোজেনকে বেলুনে পুরে আকাশে উঠলেন, জেফ্রিস নামে এক মার্কিন যুবক বেলুনে চেপে ইংলিশ চ্যানেল পার হলেন, কক্সওয়েল এবং গ্ল্যাসিয়াল নামে দুজন যুবক আকাশের সাত মাইল উর্ধ্ব থেকে খবর সংগ্রহ করলেন ইত্যাদি।

কৃত্রিম ডানার মত একদিন বেলুনের প্রতিও উৎসাহ কমে এলো মানুষের। বেলুনের সাহায্যে আকাশে ওঠা যায় ঠিকই, তবে ওকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না। কেবল অনুকূল হাওয়ায় ভর করে এগিয়ে যায় মাত্র। ইঞ্জিন তখন আবিষ্কার হয়ে গেছে। উৎসাহীরা চাইলেন, কোন বিশেষ যানকে ইঞ্জিনের সাহায্যে নিজের আয়ত্তে রেখে আকাশে চালিত করতে।

এই উদ্দেশ্যে প্রথম গ্লাইডার তৈরি করলেন অটো লিলিয়েন্থাল নামে একজন প্রযুক্তিবিদ। গ্লাইডারে ইঞ্জিন যুক্ত করে উড়তে গিয়ে মাটিতে আছাড় খেয়ে প্রাণ হারালেন অটো লিলিয়েন্থাল।

লিলিয়েন্থালের মৃত্যুতে উৎসাহীদের উৎসাহে ভাটা পড়লো না। বরং নতুন এই পরিকল্পনাক লুফে নিলেন অনেকে। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলেন, লিলিয়েন্থালের ত্রুটি কোথায় ছিল?

বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করলেন আমেরিকার সাইকেল দোকানদার দুই ভাই—উইলবার রাইট এবং অরভিল রাইট। বিমান নির্মানের ইতিহাসে এঁরা রাইট ভ্রাতৃদ্বয় নামে পরিচিত। অটো লিলিয়েন্থালের প্রদর্শিত পথে এগিয়ে গিয়ে এরাই প্রথমে আকাশে ওড়ালেন বিমান। মানুষের দীর্ঘদিনের স্বপ্ন সফল হলো, পাখীর মত সেও ইচ্ছামত উড়ে চললো আকাশে।

✪ রকেট ✪

কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করার একমাত্র হাতিয়ার রকেটের নাম সবারই জানা। কৃত্রিম উপগ্রহ ব্যবস্থার সূত্রপাত বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে হলেও রকেটের আবিষ্কার কিন্তু আজকের নয়। এর পেছনে রয়েছে কত সুদীর্ঘকালের মানুষের সাধনা ও অধ্যবসায়।

রকেটের সূচনা যে কবে, কিংবা কে যে ওর আবিষ্কর্তা তা আজ আর বলার কোন উপায় নেই। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে রচিত চীনাদের পুস্তকে অগ্নিবানের উল্লেখ আছে। বর্ণনা থেকে জানা যায়, সেই অগ্নিবান ছিল হাউইর মত জিনিস। মাথায় থাকতো সুতীক্ষ্ন তীরের ফলা। এটি যুদ্ধাস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হতো। হয়ত সেই সুপ্রাচীনকালে ভারতবর্ষেও অগ্নিবানের প্রচলন ছিল। অপরদিকে প্রাচীন গ্রীক পুরাণেও রকেটের উল্লেখ আছে।

যুদ্ধাস্ত্র ছাড়া আতসবাজী হিসাবেও সেকালে বাজিকররা রকেটকে ব্যবহার করতেন এবং এই উভয় কাজে রকেটের ব্যবহার হয়ে আসছিল সুদীর্ঘকাল। শুধু ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে ওয়ানহু নামে জনৈক চীন সম্রাট রকেটের সাহায্যে ঊর্ধাকাশে আরোহণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। কথিত আছে, ওয়ানহু সশরীরে স্বর্গে যেতে চাইলে তাঁকে একটা মস্তবড় ঘুড়ির উপর বসানো হয়েছিল এবং ঘুড়ির তলায় যুক্ত বেশ কিছুসংখ্যক রকেট বা হাউইতে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছিল।

ফল কী হয়েছিল তার উল্লেখ কিন্তু কোথাও নেই। মনে হয় সম্রাটের মৃতদেহটাই ফিরে এসেছিল। তবু বলতে হবে, ওয়ানহুই প্রথম ব্যক্তি-যিনি প্রথম রকেটের সাহায্যে আকাশে উঠেছিলেন।

অনেকের মতে রকেট চর্চা প্রথম চীন দেশে শুরু হয়েছিল এবং সেখান থেকে ছড়িয়ে পড়েছিল ইংল্যাণ্ড, ইতালি ও জার্মানীতে। তবে কেউ ওকে মহাকাশের বাহন হিসাবে গ্রহণ করেনি, করেছিল যুদ্ধাস্ত্র ও আতসবাজী হিসাবে। মারণাস্ত্র হিসাবে ওকে ব্যবহার করা হতো বলে কেউ সুনজরেও দেখতো না।

রকেটকে নিয়ে প্রকৃত গবেষণা শুরু হয়েছে ইওরোপে নব-জাগরণের দিনে—রোজার বেকনের দ্বারা। রকেটকে জনহিতকর কাজে নিয়োগ করা যায় কিনা -এ বিষয়ে চিন্তা করেন কনরাড কাইজার নামে জনৈক জার্মান। ইনি রকেটের দ্বারা দূরে খবর প্রেরণের জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন। অপরদিকে সে সময় রকেটের যা কিছু উন্নতি হয়েছিল, সে সবই জার্মানদের দ্বারা। এমনকি "রকেট" নামটাও তাঁরাই প্রথম ব্যবহার করেছিলেন।

রকেটের নবজন্ম লাভ হয়েছে বিংশ শতাব্দীতে রুশ, মার্কিন, ফরাসী ও ও জার্মানী গবেষকদের দ্বারা। ঐ শতাব্দীর প্রথমভাগে রকেটকে ক্ষেপণাস্ত্রের কাজে প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্ব মহাসমরের শেষের দিকে জার্মানীরা

ওকে কাজে লাগিয়ে একটা সন্ত্রাস সৃষ্টি করেছিল।

বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মানুষ যখন মহাকাশ বিজয়ের জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেছিল তখনই চিরকালের উপেক্ষিত ঐ রকেটের দিকে দৃষ্টি পড়েছিল সবার। সেদিন মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন পৃথিবীর আকর্ষণ বলকে ছিন্ন করে উর্ধ্বে আরোহণ করতে গেলে সেকেণ্ডে সাত মাইলের মত গতিবেগ নিয়ে ছুটতে পারবে-এমন একটি হাতিয়ার চাই। তখনই রকেটের উন্নতিতে যত্নবান হয়েছিলেন। কথিত আছে, তরল জ্বালানীপূর্ণ রকেট তৈরি এবং তাকে মহাকাশে প্রেরণের উপযোগী করে তুলেছিলেন মার্কিন গণিতজ্ঞ রবার্ট হাচিন্স গর্ডার্ড।

আজ রকেটের কৌলিন্য বেড়ে গেছে। বাজীকর এবং যোদ্ধাদের কবলমুক্ত হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বিশাল এক কর্মক্ষেত্রে। এখন পর্যন্ত মহাকাশে যাত্রা করতে হলে রকেটকেই বাহন করতে হচ্ছে।

✪ ডায়নামো ✪

এককালে চুম্বক ও তড়িৎ-এই দুই শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কারের জন্য বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানী গবেষণায় মেতে উঠেছিলেন। সে যুগের নামকরা বিজ্ঞানী মাইকেল ফ্যারাডেও ছিলেন তাঁদের দলে।

একদিন একটা ফাঁপা সলিনয়েডের চারপাশে বেশ কয়েকপাক তামার তার জড়িয়ে এবং তারের দুপ্রান্তকে একটা অ্যাম্মিটারের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে পরীক্ষা করছিলেন ফ্যারাডে। কাছে ছিল কয়েকটা দণ্ড চুম্বক এবং একটি বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র।

এটা ওটা নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে একসময় কী খেয়াল হলো তাঁর, একটা চুম্বককে হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে শুরু করলেন। হঠাৎ চোখে পড়লো, তামার তার জড়ানো সলিনয়েডের চোঙের কাছে চুম্বক সমেত হাতটা যেতেই অ্যাম্মিটারের কাঁটাটা নড়ে উঠলো।

তবে তো বিদ্যুৎ প্রবাহ হচ্ছে! কিন্তু কোথা থেকে এলো এই প্রবাহ! সলিনয়েডের সঙ্গে বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রের তো কোন যোগ নেই! তাহলে!

বিস্ময়বোধ করলেন ফ্যারাডে এবং অতি তুচ্ছ একটা ঘটনা হলেও সলিনয়েড ও চুম্বককে নিয়ে পরীক্ষায় মেতে উঠলেন। দেখলেন, চুম্বকটি সলিনয়েডের কাছে আনলে অ্যাম্মিটারের কাঁটার যেদিকে বিক্ষেপ হয়, দূরে সরিয়ে আনার সময় হয় ঠিক তার বিপরীত দিকে। অথচ চুম্বককে এক জায়গায় ধরে থাকলে বা সলিনয়েডের উপর রেখে দিলে কোন বিক্ষেপই হয় না। যেন ভারি মজা পেলেন ফ্যারাডে।

কিছুদিন পরে ইংলণ্ডের এক বিজ্ঞান প্রদর্শনীতে ফ্যারাডে প্রদর্শন করলেন এই পরীক্ষাটি। বিজ্ঞানীরা এতদিনে বুঝতে পারলেন, বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র

ছাড়াও চুম্বকের দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা সম্ভব। কিন্তু সাধারণ মানুষ অথবা যাঁরা বিজ্ঞানকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন না, তাঁরা তড়িৎ সম্বন্ধে কতটুকুই বা বুঝবেন? তাই সেদিন ঐ পরীক্ষাটি দেখে বিজ্ঞানীরা ছাড়া অপর কেউ বিশেষ উৎসাহ বোধ করলেন না। যেহেতু ফ্যারাডে আবার ছিলেন মস্তবড় বিজ্ঞানী, দেশজোড়া ছিল নাম ডাক—তাঁর এমন একটা ছেলেমানুষী খেলা দেখে কেউ কেউ আড়ালে মুখ টিপে হেসেছিলেনও।

একজন মহিলা মনে হয় ফ্যারাডে সম্বন্ধে বড় একটা খোঁজখবর রাখতেন না। পরীক্ষাটি দেখে তাচ্ছিল্যের সুরে বলেছিলেন—পরীক্ষাটি না হয় দেখলাম। কিন্তু এটি কী কাজে লাগবে মানুষের!

ফ্যারাডে অত্যন্ত শান্ত ও সংযত সুরে উত্তর দিয়েছিলেন—আপনারা ছোট শিশুদের কেন লালন পালন করেন?

মহিলাটি সেদিন ফ্যারাডের কথার কোন জবাব দিয়েছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে কয়েকদিন পরে ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রী প্রদর্শনী দেখতে এসে সেই একই ধরনের প্রশ্ন করায় ফ্যারাডে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। বলেছিলেন—আজ যাকে তুচ্ছ বলে মনে করছেন, ভবিষ্যতে এমন দিনও আসতে পারে—যেদিন এই তুচ্ছ ঘটনাকে নিয়ে আবিষ্কৃত হবে কোন যন্ত্র। ততদিন যদি আপনি ঐ পদে বহাল থাকেন, তাহলে হয়ত ঐ যন্ত্র থেকে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা রোজগার করতে পারবেন।

ফ্যারাডের কথা কিন্তু মিথ্যে হয়নি। বিজ্ঞানীরা অচিরে বুঝতে পেরেছিলেন, কোন শক্তিশালী চুম্বকের কাছে তামার তারের কুণ্ডলী বা আর্মেচারকে ক্রমাগত ঘোরাতে থাকলে চুম্বক বলরেখা ছিন্ন হয় এবং তারে বিদ্যুতাবেশ ঘটে। ঐ ঘটনাকে কেন্দ্র করে একদিন আবিষ্কৃত হলো ডায়নামো। আর ঐ ডায়নামো আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গেই যন্ত্রযুগকে অতিক্রম করে মানুষ বিদ্যুতের যুগে পদার্পণ করে।

ফ্যারাডে তাই যুগস্রষ্টা বিজ্ঞানী। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি এই বিপ্লব দেখে যেতে পারেননি। তাঁর মৃত্যুর প্রায় অর্ধশতাব্দী পরে অতি মন্থর গতিতে সূচিত হয়েছিল সেই বিপ্লব।

✪ অ্যাটম বোমা ✪

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে য়িহুদীদের প্রতি হিটলারের বিদ্বেষী মনোভাবের জন্য ইওরোপ ভুখণ্ডের বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানীকে দেশ ছাড়া হতে হয়েছিল। তাঁদের অধিকাংশ গোপনে আমেরিকায় পলায়ন করেন এবং আমেরিকাও তাঁদের সাদরে গ্রহণ করে। দেশত্যাগী বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিলেন আইনস্টাইন, লিজে মাইটনার, অটোফ্রিস, এনরিকো ফার্মি, নীলস বোর, জিলার্ড টেলার প্রভৃতি পরমাণু বিজ্ঞানের দিক্‌পাল গবেষকরা।

সে সময় আমেরিকার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন রুজভেল্ট। তিনি আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীদের কাছে শুনলেন, মদমত্ত জার্মানী পরমাণু শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অতি ভয়ঙ্কর এক মারণাস্ত্র নির্মাণে তৎপর হয়ে উঠেছে। তখনই তিনি দেশী ও বিদেশী বিজ্ঞানীদের নির্দেশ দিলেন তাঁরাও যেন মারণাস্ত্র নির্মাণে আত্মনিয়োগ করেন। প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহেরও প্রতিশ্রুতি দিলেন তিনি।

শুরু হলো বিজ্ঞানীদের চিন্তা ভাবনা। তাঁরা ভেবে দেখলেন, পরমাণু বোমা তৈরি একক বিজ্ঞানীর সাধ্যের বাহিরে। বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় যাঁর গভীর জ্ঞান আছে একমাত্র তাঁকেই দেওয়া যেতে পারে এই দুরূহ কর্মের ভার। কিন্তু কে আছেন এমন চৌকস বিজ্ঞানী!

অনেক খুঁজে পেতে তাঁরা ঠিক করলেন, এই কর্মকাণ্ডের নেতা হওয়ার যোগ্যতা আমেরিকার মাত্র একজন বিজ্ঞানীরই আছে। তিনি হচ্ছেন রবার্ট ওপেনহাইমার। বিজ্ঞানীরা সমবেতভাবে রুজভেল্টের কাছে তাঁরই নাম প্রস্তাব করলেন এবং রুজভেল্ট দ্বিরুক্তি না করেই ওপেনহাইমারকে নেতা মনোনীত করলেন। ওপেনহাইমারকে সাহায্য করার জন্যও নিযুক্ত হলেন স্বদেশের ও বিদেশের বহু নাম করা বিজ্ঞানী। সরকারও প্রথম কিস্তিতে অর্থ মঞ্জুর করলেন দুশ' কোটি ডলার। আর এই কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হলেন প্রায় পঁচাত্তর হাজারের মত লোক।

ওপেনহাইমার শুরু করে দিলেন অমানুষিক পরিশ্রম। দৈনিক দু-তিন ঘণ্টার বেশী ঘুমাতেন না, খাওয়া-দাওয়ার কথাও মনে হতো না তাঁর, কেবল গবেষণা আর গবেষণা। এক প্রচণ্ড পরিশ্রমে শরীর ভেঙে পড়লো। এত রোগা হয়ে গেলেন যে, গায়ের কোট ও প্যাণ্ট ঢিলে হয়ে গেল। তবু হাল ছাড়লেন না তিনি।

ওপেনহাইমার একদিন বুঝতে পারলেন, এই কর্মকাণ্ডকে সফল করে তুলতে হলে আরও চাই লোক, আরও অর্থ এবং আরও গবেষণাগার। সরকার তাঁর সমূহ পরিকল্পনাকে সমর্থন করলো এবং নানান জায়গায় গোপন কারখানা স্থাপিত হলো। লোকও নিযুক্ত হলো আরও কয়েক হাজার।

অতঃপর শিকাগো ও ওকরীজে স্থাপিত হলো পরমাণু বিভাজনের গবেষণা। এই কাজ শুরু হলো ইউরেনিয়ামকে নিয়ে। পরে প্লুটোনিয়ামকে নিয়েও চললো গবেষণা।

অবশেষে বহু বিজ্ঞানীর সমবেত প্রচেষ্টা, এক লক্ষ মানুষের প্রচণ্ড পরিশ্রম ও অজস্র অর্থব্যয়ে একদিন ওপেনহাইমার সন্ধান পেলেন পরমাণুর বিধ্বংসী শক্তির। ঠিক করলেন, জনবিরল লস আলমাসের কাছে একটি পাহাড়ের উপর বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে তার শক্তি পরীক্ষা করবেন।

১৯৪৫ সালের ১৭ই জুলাই। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক কলঙ্কময় অধ্যায়। ঐ দিন ওপেনহাইমার সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটালেন।

কিন্তু এ কী! বিস্ফোরণ ঘটার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন সবাই। তাঁরা যা কল্পনা করেছিলেন, তার চেয়েও সহস্র সহস্র গুণে ভয়ঙ্কর এই বোমা। এত শক্তিধর যে হবে, তা তাঁরা কল্পনায় স্থান দিতে পারেননি।

এবার বেঁকে বসলেন ওপেনহাইমার সহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা। তাঁদের মনে এলো, এ কী করেছেন তাঁরা? মানুষের মঙ্গলের পরিবর্তে কী ভীষণ সর্বনাশ ডেকে আনলেন! ওপেনহাইমার বিলম্ব না করে সরকারের কাছে দাবী জানালেন, এ বোমাকে ব্যবহার করা চলবে না। নীলস বোর, আইনস্টাইন প্রমুখ বিজ্ঞানীরাও সমর্থন জানালেন ওপেনহাইমারকে। কিন্তু রাষ্ট্রনায়করা কর্ণপাত করলেন না তাঁদের কথায়।

ওপেনহাইমার এবার দুশ্চিন্তায় পড়লেন। লিখিতভাবে সরকারের কাছে কতকগুলো দাবী উপস্থাপিত করলেন। সেই দাবীগুলির মধ্যে একটি ছিল, পৃথিবীর প্রতিটি দেশকে অবিলম্বে জানাতে হবে এই মারণাস্ত্রের ভয়াবহতা এবং এর প্রস্তুতপ্রণালী ও ব্যবহার বিধি।

মার্কিন সরকার অসন্তুষ্ট হলেন ওপেনহাইমারের উপর। তাঁকে পুলিশী হেফাজতে রেখে পরমাণু বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হলো জাপানের হিরোসিমা এবং নাগাসাকি নামক দুটি জনবহুল শহরের উপর।

বিস্ফোরণ ঘটানোর পর পরমাণু বোমার সেই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে এবার রাষ্ট্রনায়কেরাও শিউরে উঠলেন। ওপেনহাইমার পুলিশী হেফাজতে থাকা সত্ত্বেও প্রতিবাদের ঝড় তুললেন। আর তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মেলালেন অপরাপর বিজ্ঞানীরা। তাঁরা অনুরোধ জানালেন, ধ্বংসাত্মক কাজে পরমাণুকে নিয়োগ না করে যেন মানবকল্যাণে নিয়োজিত করা হয়। বিদেশের বিজ্ঞানীরাও সোচ্চার হয়ে উঠলেন। তখন বাধ্য হয়ে মার্কিন সরকার ওপেনহাইমারের কয়েকটা দাবী মেনে নেন। তবে তাঁর সব দাবীকে মানা হয়নি।

✪ ক্যামেরা ও ফটোগ্রাফী ✪

হাজার বছর আগেকার কথা।

এক মিশরীয় সওদাগর দলবল নিয়ে উটের পিঠে পার হচ্ছিলেন সাহারা মরুভূমি। যেহেতু সাহারায় দিনের বেলায় প্রচণ্ড গরম এবং প্রবাহিত হতে থাকে দম বন্ধ করা গরম বাতাস বা "লু"। তাই সওদাগর করতেন কী বেলা বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কোন একটি মরূদ্যানে গাছ-গাছালির আড়ালে তাঁবু খাটিয়ে বিশ্রাম করতেন আর বেলা পড়লে পুনরায় যাত্রা করতেন।

সওদাগরের তাঁবুটা ছিল বড্ড পুরানো। এখানে সেখানে বেশ কয়েকটা ছোট ছোট ছিদ্র ছিল। একদিন বিকেল বেলায় তাঁবুর ভেতরে দেখলেন, ছিদ্রের বিপরীতে তাঁবুর দেওয়ালে পড়েছে আরোহীসহ চলন্ত উটের সারির উল্টা প্রতিবিম্ব। ভারি সুন্দর বলে মনে হলো সে দৃশ্য। দেখে যেন চোখ ফেরাতে

পারলেন না সওদাগর।

এক সময় অপসৃত হয়ে গেল উটের সারি। এবার তাঁবুর বাহিরে বেরিয়ে এসে দেখলেন, একদল যাত্রী উটের পিঠে আরোহণ করে চলে গেল তাঁদেরই তাঁবুর পাশ দিয়ে। বুঝতে পারলেন, পড়ন্ত বেলায় তাঁবুর ছিদ্রপথে তাদের উল্টো প্রতিবিম্ব গঠন করেছিল তাঁবুর বিপরীত দেওয়ালে।

দেশে ফিরে সেই সওদাগর তাঁর অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেন (সওদাগরটির নাম জানা নেই)। প্রবাদ আছে যে, সওদাগরের অভিজ্ঞতা অনুযায়ী মানুষ প্রথম বন্ধ বাক্সের সামনে ছোট্ট একটা ফুটো করে প্রাকৃতিক দৃশ্যকে ধরে রাখার জন্য চেষ্টা চালাতে থাকে।

ক্যামেরার আদি পুরুষ-একটা বন্ধ কাঠের বাক্স ছাড়া অন্য কিছু নয়। বাক্সের সামনের দেওয়ালে থাকতো একটা ছোট ছিদ্র এবং তার বিপরীত দেওয়ালে খাটিয়ে রাখতো একখানা ঘষা কাচের পর্দা। আর একপাশে ছিল ভেতরের দৃশ্য বস্তুকে দেখার ব্যবস্থা। যখন ছিদ্রপথে দৃশ্য বস্তু থেকে আলো এসে পড়তো ঘষা কাচের পর্দায়—তখন দৃশ্য বস্তুটির একটা উল্টো প্রতিবিম্ব গঠিত হতো। তবে এই ধরনের যন্ত্রটিকে কে কবে যে আবিষ্কার করেছিলেন তাও জানা নেই।

অনেকদিন পরে দেনিয়েলো বারবারো নামে একজন শিল্পী বাক্সের ছিদ্র মুখে একটি লেন্স এঁটে কিছুটা উন্নতি করেছিলেন। এই জাতীয় ক্যামেরাকে দৃশ্যবস্তুর সামনে এমনভাবে বসিয়ে রাখা হতো, যাতে দৃশ্যবস্তুর পুরো উল্টো ছবিটাই ফুটে উঠতে পারতো ঘষা কাচের উপর। তারপর শিল্পী করতেন কী! অসীম ধৈর্য নিয়ে আঁকতে শুরু করতেন সেই ছবিকে।

এইভাবে কতকাল যে চলেছিল তার ঠিকঠিকানা নেই। একদিন শিল্পীদের কেউ কেউ ভাবতে শুরু করলেন, ছবি না এঁকে বাক্সের মধ্যে ছবিটাকে বন্দী করে রাখা যায় না কী! এবার শুরু হলো চিন্তা-ভাবনা ও খোঁজাখুঁজির পালা।

কেউ কেউ লক্ষ্য করলেন, সূর্যের আলো কোন কোন রাসায়নিক পদার্থের বর্ণকে পরিবর্তন করে দেয়। ঘষা কাচের পর্দার উপর তেমন কোন জিনিসকে মাখিয়ে দিলে নিশ্চয়ই সুবিধা পাওয়া যাবে। কিন্তু কোন্ রাসায়নিক পদার্থকে ব্যবহার করলে সুবিধেটুকু পাওয়া যাবে?

একদিন স্যুলজে নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করলেন, সিলভার ক্লোরাইডের দ্রবণকে সূর্যালোকে রেখে দিলে কালো হয়ে যায়। ঐ তথ্যটিকে কাজে লাগালেন ফরাসী শিল্পী নিয়েপসে। তিনি অন্ধকারে একটা কাগজকে সিলভার ক্লোরাইডের দ্রবণে ডুবিয়ে রেখে দিলেন ঘষা কাচের পর্দার উপরে। তারপর ছবি তুললেন, দেখলেন, একটি ছবি পাওয়া গেছে ঠিকই, তবে ছবিটি হয়েছে উল্টো। কাগজের উপর যেখানটায় আলো পড়েছিল সেখানটা কালো হয়ে গেছে এবং যেখানে আলো পড়েনি সে জায়গাটা একেবারে অবিকৃত থেকে গেছে। মনে হয় উল্টো ছবি দেখে বিরক্ত হয়েছিলেন নিয়েপসে

এবং অনুরূপ ছবির কোন সার্থকতা নেই ভেবে ঐ পদ্ধতিকে পরিত্যাগ করে দৃশ্য বস্তুর সোজা ছবি তোলার জন্য গবেষণা করেছিলেন।

কিছুকাল গবেষণা করার পর একটি নতুন উপায় উদ্ভাবন করলেন নিয়েপসে। একটা তামার প্লেটের গায়ে এক ধরনের বিটুমেন মাখিয়ে ক্যামেরার মধ্যে রাখলেন এবং রোদে এক্সপোজার দিলেন। যেখানে রোদ পড়লো সেখানে দেখা গেল বিটুমেনটা শক্ত হয়ে প্লেটে একেবারে এঁটে গেছে আর যেখানে রোদ পড়েনি সেখানে পূর্বের মত নরমই আছে।

নিয়েপসে এবার করলেন কী! নরম বিটুমেনটাকে ল্যাভেণ্ডার তেল দিয়ে তুলে দিলেন। তারপর প্লেটের উপর ঢাললেন অ্যাসিড। শক্ত বিটুমেনের বাইরের অংশটা অনাবৃত থাকায় অ্যাসিডের ক্রিয়ায় তামার পাত ক্ষয়প্রাপ্ত হল. কিন্তু বিটুমেনযুক্ত জায়গাগুলোর ক্ষয় হল না। সর্বশেষে শক্ত বিটুমেনটাকে তুলে দিয়ে এবং পাতের উপর কালি ঘষে কাগজে ছাপ দিলেন। এবার পাওয়া গেল দৃশ্য বস্তুর প্রতিকৃতি।

দ্যগোরে নামে ছিলেন ফ্রান্সের আর এক উৎসাহী চিত্রকর। নিয়েপসের পদ্ধতি তাঁর খুবই ভাল লাগলো এবং নিয়েপসের সঙ্গে যোগ দিয়ে তিনিও শুরু করলেন গবেষণা। উভয়েই চেষ্টা করতে লাগলেন ক্যামেরার ভেতরে ছবিকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখতে। কিন্তু বেশীদিন উভয়ে একসঙ্গে কাজ করতে পারলেন না। নিয়েপসে মারা গেলেন।

দ্যগোরে কিন্তু হাল ছাড়লেন না। দীর্ঘকাল প্রচেষ্টা চালানোর পর একদিন কৃতকার্য হলেন। এবার তামার পাতের উপর কালি মাখিয়ে ছাপ দিতে হলো না। ছবি আপনিই হয়ে গেল।

দ্যগোরের এই ছবিরও একটা অসুবিধা থেকে গেল। তাঁর পদ্ধতিতে ছবি হলো পজিটিভ। একটা থেকে প্রিণ্ট করিয়ে একাধিক ছবি পাওয়া গেল না। তাছাড়া ঐ পদ্ধতিতে কারও ছবি তুলতে গেলে রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পাথরের মূর্তির মত হাত পা গুটিয়ে চুপচাপ ক্যামেরার সামনে বসে থাকতে হতো। তাই এই পদ্ধতি কাউকে সন্তুষ্ট করতে পারলো না।

চললো পুনরায় গবেষণা। ট্যালবট নামে এক ইংরাজ বিজ্ঞানী একদিন এক নতুন ধরনের ক্যামেরা আবিষ্কার করলেন। ঐ ক্যামেরায় ট্যালবট ফটোর জন্য যে কাগজ ব্যবহার করেছিলেন, সেই কাগজকে প্রথমে নুন জলে ভিজিয়ে শুকিয়ে নিতেন। অতঃপর সিলভার নাইট্রেট দ্রবণ মাখিয়ে ক্যামেরার ভেতরে রেখে রোদে এক্সপোজার দিতেন। অবশেষে ছবি তোলা হয়ে গেলে পুনর্বার কাগজটিকে নুনজলে ধুয়ে নিতেন। ফলে লাভ করতেন স্থায়ী ছবির নেগেটিভ। এতে সুবিধা হলো এই যে, মানুষকে রোদে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতে হতো না। প্রকৃতপক্ষে ট্যালবটের ছবি তোলার এই পদ্ধতিরই নাম হলো ফটোগ্রাফী।

ট্যালবট ফটোগ্রাফী আবিষ্কার করে ক্ষান্ত হননি, ওকে আরও উন্নত করার জন্য জীবনের বাকি সময়টা আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছেন। তবুও

সম্পূর্ণরূপে নিখুঁত করে উঠতে পারেননি তিনি। উক্ত পদ্ধতির একটা বড় ত্রুটি ছিল, নেগেটিভকে সঙ্গে সঙ্গে ডেভেলপ না করলে ছবি নষ্ট হয়ে যেতো। তাই ফটোগ্রাফার যেখানে যেতেন সেখানে ডার্করুমটাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হতো। তাছাড়া ফটোগ্রাফারকে প্রচুর পরিশ্রমও করতে হতো। আর্চার নামে একজন ইংরাজ শিল্পী ঐ অসুবিধা নিরসনের জন্য কাগজের পরিবর্তে কাচের প্লেট ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু সুবিধা বড় একটা করতে পারেন নি।

ফটোগ্রাফীর সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধন করেছেন ম্যাডক্স নামে জনৈক ফটোগ্রাফার। তিনিই সর্বপ্রথম দ্রবীভূত জিলাটিনের সঙ্গে ব্রোমাইড লবণ এবং সিলভার নাইট্রেট মিশিয়ে এবং সেই মিশ্রণকে কাচের প্লেটের উপর আস্তরণ দিয়ে শুকিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। ক্যামেরাতে ঐ প্লেট ব্যবহার করাতে পূর্বের অসুবিধাগুলি অনেকখানি দূরীভূত হলো। অর্থাৎ প্লেটকে যখন খুশি ব্যবহার করা গেল এবং এক্সপোজার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ডেভেলপ করারও প্রয়োজন হলো না।

ম্যাডক্সের পরেও ক্যামেরা ও ফটোগ্রাফীর অনেক উন্নতি হয়েছে। এমনকি সেদিনের ক্যামেরা ও ফটোগ্রাফীর কাগজ, প্লেট প্রভৃতির আমূল পরিবর্তন হয়েছে বলা যায়। তবু নিয়েপসে, ট্যালবট, ম্যাডক্স প্রভৃতি গবেষকদের গবেষণা চিরকাল শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করবে ফটোগ্রাফী।

✪ চলচ্চিত্র ✪

মানুষ যখন ক্যামেরার সাহায্যে চিত্রকে স্থায়ী করতে সমর্থ হলো তখনই অনেকের মনে চিন্তা আসে, আমরা যেমন ঘুরে বেড়াই, হাত-পা নাড়ি, কথাবার্তা বলি, ঠিক সেইভাবে ছবিকেও সচল ও সবাক করতে পারি না! যদি হতো, তাহলে কী মজাটাই না হতো?

এই পরিকল্পনাটা মনে হয় প্রথমে ক্যালিফোর্নিয়া ষ্ট্যান্ডফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা লেল্যান্ড সাহেবের মাথায় এসেছিল। ঘোড়ায় চড়তে বেজায় ভালবাসতেন তিনি। একদিন মাইব্রিজ নামে সুদক্ষ এক ফটোগ্রাফারকে জানালেন তাঁর মনের কথা এবং বললেন, যেমন করে হোক ঘোড়া ছোটানো অবস্থায় একটা সচল ছবি তাঁকে তুলে দিতেই হবে।

মাইব্রিজ কয়েকদিন ধরে ব্যাপারটাকে নিয়ে বেশ ভালভাবে চিন্তা করলেন। শেষে উদ্ভাবন করলেন এক অভিনব উপায়।

মাইব্রিজ করলেন কী! চব্বিশটি ক্যামেরা এনে একটা খোলা মাঠের একপ্রান্তে সমদূরত্বে বসিয়ে রাখলেন। সবগুলি ক্যামেরার শাটারের সঙ্গে বাঁধলেন একগাছা করে সরু সুতো। সুতোর অপরপ্রান্তগুলোকে সোজাসুজি

মাঠের ওপ্রান্তে টেনে নিয়ে গিয়ে টান টান করে বাঁধলেন খুঁটির সঙ্গে। তারপর লেল্যাণ্ড সাহেবকে নির্দেশ দিলেন ক্যামেরার সম্মুখ দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিতে।

ছুটে চললো লেল্যাণ্ডের ঘোড়া। আর ঘোড়ার ক্ষুরের ধাক্কায় সুতোগুলো একে একে পট্‌পট্‌ করে ছিঁড়ে গেল এবং শাটারগুলো খুলে সঙ্গে সঙ্গে বন্ধও হয়ে গেল।

ঐ পদ্ধতিতে মাইব্রিজ চব্বিশটি ক্যামেরার সাহায্যে গতিশীল অশ্বের পিঠে লেল্যাণ্ড সাহেবের বিভিন্ন অবস্থান অনুযায়ী ছবি ধরে রাখতে পেরেছিলেন মাত্র কিন্তু প্রদর্শন করতে পারেন নি।

ছবিকে গতিশীল করার উপায় আবিষ্কার প্রকৃতপক্ষে টমাস আল্‌ভা এডিসনের। এই উদ্দেশ্যে তিনি দুটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। যন্ত্র দুটির একটির নাম কিনেটোগ্রাফ এবং অপরটির নাম কিনেটোস্কোপ। প্রথম যন্ত্রটি ব্যবহার করেছিলেন চলচ্চিত্র গ্রহণের জন্য এবং দ্বিতীয়টি প্রদর্শনের জন্য।

টমাস আল্‌ভা এডিসনের আমলেই জর্জ ইস্টম্যান্‌ নামে জনৈক মার্কিন বিজ্ঞানী সেলুলয়েডের তৈরি ফিল্ম আবিষ্কার করেছিলেন। এডিসন সেই ফিল্মকেই কাজে লাগিয়েছিলেন এবং তৈরি করেছিলেন দৃশ্য বস্তুর বিভিন্ন অবস্থানের ছবি। তারপর ওকে একটা বাক্সের মত যন্ত্রের ভেতরে রোলারে জড়িয়ে রেখেছিলেন। রোলারকে ঘোরানোর জন্য একটা হাতলও যুক্ত করেছিলেন। হাতল ঘোরালে রোলার থেকে ছবি খুলে যেতো এবং আর একটি রোলারে আপনা হতে জড়িয়ে যেতো।

বাক্সটির সামনে এডিসন রেখেছিলেন দুটি বড় বড় ছিদ্র। মাত্র দু'জন দর্শক উপযুক্ত দর্শনী দিয়ে সেই সচল ছবিকে দেখতে পারতো।

এডিসনের এই যন্ত্র বেশ জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। সেই কারণে চলচ্চিত্রের উন্নতির জন্য অনেকেই মাথা ঘামাতে শুরু করেন এবং এডিসনের যন্ত্রটিকে লুফে নেন।

চলচ্চিত্রের উন্নতির মূলে যাঁর অবদান সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তাঁর নাম টমাস আরমাট। ইনিই প্রথম বাক্সের পরিবর্তে পর্দার উপর চলচ্চিত্র প্রদর্শনের পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। ফলে বহুজনে একসঙ্গে বসে ছবি দেখার সুযোগ লাভ করে।

টমাস আরমাটের চলচ্চিত্র মূকাভিনয় ছাড়া অন্য কিছু ছিলনা। সাধারণত যাত্রা-থিয়েটার থেকে ছবি তোলা হতো। প্রদর্শনকালে নাটকের কুশীলবরা হাত পা নাড়তেন, অঙ্গভঙ্গি করতেন, ঠোঁট নাড়তেন, কিন্তু কথা শোনা যেত না। তবে আগাগোড়া পুরো কাহিনীকে নিতে পারতেন না। অংশ বিশেষ ধরে রাখতেন এবং প্রদর্শন করতেন।

উপরোক্ত ব্যবস্থা কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছিল। কিন্তু একই জিনিস সবসময় যেহেতু মানুষের মনোরঞ্জন করতে সমর্থ হয় না এবং সবসময় নতুনের পিয়াসী সে, তাই এই মূকাভিনয় এবং কাহিনী-শূন্য চিত্রে আর সন্তুষ্ট থাকতে পারলো না। পারলেন না নতুনের প্রতি যাঁদের সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ—

সেইসব বিজ্ঞানী ও শিল্পীরা। তাঁরা ভাবলেন, ভাল ভাল কাহিনীকে কী চিত্ররূপ দেওয়া যায় না ?

পুরো কাহিনীকে চিত্রে গ্রথিত করেন প্রথম এডুইন পোর্টার নামে জনৈক ক্যামেরাম্যান। বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে "দি গ্রেট ট্রেন রবারি" নামে একটি কাহিনীর চিত্ররূপ দিলেন। যদিও এটি নির্বাক চলচ্চিত্র ছিল, তবুও উৎসাহী হয়ে উঠলো মানুষ। কাহিনীমূলক এই ছবিটিকে দেখার জন্য চারদিকে যেন সাড়া পড়ে গেল।

চলচ্চিত্রের প্রতি জনসাধারণের আকর্ষণ দেখে এবার ব্যবসায়ীরা ছুটে এলেন। তাঁরা প্রচুর অর্থব্যয়ে ভাল ভাল ক্যামেরাম্যানের সাহায্যে জনপ্রিয় কাহিনীগুলির চিত্ররূপ দিলেন। সেই সময়টাতে বেশীর ভাগ চলচ্চিত্রের বহির্দৃশ্য গ্রহণ করা হতো কালিফোর্নিয়ার হলিউড নামে একটি জায়গায়। কারণ, হলিউডে বৃষ্টিপাত খুব কম হতো, বছরেরর অধিকাংশ দিন রোদে ঝলমল করতো এবং আবহাওয়াটাও ভাল ছিল। ব্যবসায়ীরা তাই বুঝে নিয়েছিলেন, বছরের অধিকাংশ সময় কেবলমাত্র এইখানেই ছবি তোলা সম্ভব। তাই দলে দলে সবাই ছুটতেন হলিউডে এবং সেই থেকে হলিউড চলচ্চিত্র শিল্পের রাজধানীরূপে পরিগণিত হয়ে আসছে। যদিও বর্তমানে জাপানই তৈরি করছে সবচেয়ে বেশী ছবি।

চলচ্চিত্র শিল্পে প্রথম আধুনিকতার ছাপ দেন ডি. ডব্লু. গ্রিফিথ তাঁর "দি বার্থ অফ্ এ নেশান" নামক ছবিতে। তবু এতদিন পর্যন্ত ছবিকে সবাক করানোর কোন উপায় কেউ আবিষ্কার করতে পারেন নি। শুধু অল্প কথায় কাহিনীর পরিচিতিটুকু লিখে পর্দায় দেখানো হতো।

সবাক চিত্র প্রস্তুত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়ার দিকে। প্রথম সবাক চিত্রটির নাম "দি জাজ সিঙ্গার।" প্রকৃতপক্ষে ঐ সময় থেকে চলচ্চিত্র সবদেশেই জনপ্রিয়তার একেবারে শীর্ষে আরোহণ করে।

✪ উচ্চতা মাপক যন্ত্র ✪

এক ছিলেন রাজা। প্রজাদের দেখতেন আপন ছেলের মত। তাদের সুখ-দুঃখের খবর সংগ্রহের জন্যে রোজ রাতে মন্ত্রীর সঙ্গে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন রাজ্যের এখানে ওখানে।

রাজপ্রাসাদ থেকে অনেকদূরে-রাজধানীর একপ্রান্তে বাস করতেন শ্রমিকেরা। তাঁরা দিনের বেলায় রাজবাড়িতে কাজকর্ম করতেন এবং সন্ধ্যে হলে মজুরী নিয়ে ফিরে যেতেন যে যার নিজের ঘরে।

একদিন রাতে রাজা ও মন্ত্রী দুজনে শ্রমিকের পোশাকে হাঁটছিলেন ওদের পাড়ার ভেতর দিয়ে। আদুড় গা, হাঁটু পর্যন্ত একটা ময়লা কাপড়, কাঁধে একটা তেল চিট্‌চিটে গামছা, চিনতে পারে কার সাধ্য !

সেদিন আকাশে চাঁদ ছিল, আর ছিল ভয়ানক গুমোট। পথের ধারে উঁচু একটা ঢিবির উপর বসে শ্রমিকেরা নিজেদের সুখ দুঃখের গল্প করছিলেন। রাজা ও মন্ত্রীর উভয়ে তাঁদের কথাবার্তা শোনার জন্য কান খাড়া করলেন। ভাবলেন, এতগুলি লোক যখন একজায়গায় জড় হয়েছে তখন নিশ্চয়ই কিছু আলোচনা হচ্ছে। একটু আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালেন তাঁরা।

একসময় একজনের কণ্ঠ ভেসে এলো। দলের সবাইকে শুনিয়ে জোর গলায় বললো—ভাই সব! আমাদের রাজা লোক কিন্তু খুব ভাল নয়। বিশেষ করে আমাদের শ্রমিকদের প্রতি ভাল ব্যবহার করছেন না।

শ্রমিকটির কথা শুনে কোলাহল আরম্ভ হয়ে গেল। আর রাজা ও মন্ত্রী তার পরবর্তী কথাগুলো শোনার জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কোলাহল বন্ধ হলো শ্রমিকটি পুনরায় বললো—আমরা সারাদিন রাজবাড়িতে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটছি। আর ঐ রাজকর্মচারীরা সারাদিন কিচ্ছুটি না করে কেবল কলমে আঁচড় কেটে চলে। তাতেই তারা পায় আমাদের চারগুণ মজুরী। এ কী রাজার অন্যায় নয়?

দলের সবাই মাথা নেড়ে সমর্থন জানালো। একজন বললো—একশোবার ঠিক।

লোকটি মুচকি হেসে বললো—আরও শোন! রাজকর্মচারীরা যাই হোক কলম পিষে যায়। কিন্তু ঐ মন্ত্রীমশাইকে দেখেছো! সারাদিন কিছুটি করেন না, কেবল রাজার কাছে কাছে থেকে রাজভোগ খান। আশ্চর্যের কথা, তিনিই পেয়ে থাকেন সবার চেয়ে বেশী মাইনে।

মন্ত্রীমশাইর মুখটা একেবারে ছাইর মত সাদা হয়ে গেল। রাজা কিন্তু হাসলেন মনে মনে। তারপর মন্ত্রীমশাইকে টানতে টানতে প্রাসাদে ফিরে এলেন।

পরদিন ভোরের আলো ফুটে ওঠার আগেই রাজার লোকজন ছুটে গেল শ্রমিকদের ডেকে আনার জন্য। সাত সকালে রাজার তলব শুনে শ্রমিকেরা তো ভয়ে সারা। না জানি কোথায় কী অন্যায় হয়ে গেছে! এখন জেলখানায় না পচে মরতে হয়।

শ্রমিকেরা যখন দরবারে উপস্থিত হলো ততক্ষণে রাজা পাত্রমিত্রদের নিয়ে বসে গেছেন সভায়। শ্রমিকেরা রাজার চরণ বন্দনা করে পাশে দাঁড়াতেই রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—গতকাল রাতে তোমরা সেই ঢিবিটার উপর বসে কী সব আলোচনা করছিলে যেন!

সর্বনাশ! এসব কথা রাজা শুনলেন কেমন করে! ভয়ে সবাই থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো। রাজা হাসতে হাসতে বললেন—তোমরা ভয় পাচ্ছো কেন? ঠিক কথাই তো বলেছিলে, তাই না মন্ত্রীমশাই!

মন্ত্রীমশাই কিচ্ছুটি বললেন না এবং রাজার কথায় ভয়ও দূর হলো না কারও। তারা রাজার পায়ের তলায় হুমড়ি খেয়ে বললো —আমাদের এই বারটি মাপ করুন মহারাজ। আর কোনদিন এমন কথা ভুলেও উচ্চারণ

করবো না।

রাজা গম্ভীরকণ্ঠে বললেন—তোমাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য ডাকিনি। শুধু যাচাই করতে চাই, তোমরা বেশী বেতন পাওয়ার যোগ্য কিনা।

শ্রমিকেরা কাঁদ কাঁদ হয়ে হাত জোড় করে দাঁড়ালো। রাজা চুপ করে থেকে কী যেন ভাবলেন। তারপর বললেন—ঐ যে দূরে পিরামিডটাকে দেখা যাচ্ছে, ঐটার উচ্চতা ঠিক করে মেপে দিতে হবে তোমাদের। অবশ্য তিন দিন সময় দিচ্ছি এবং তিনদিন যাতে ভালভাবে চিন্তা করতে পারো তারজন্য তিনদিনের মাহিনাও দিচ্ছি। যাও, কোষাধ্যক্ষের কাছ থেকে তিনদিনের মাহিনা নিয়ে ঘরে বসে চিন্তাভাবনা করগে!

তিনদিন পরে পুনরায় রাজসভায় ডাক পড়লো শ্রমিকদের। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—কোন উপায় বার করতে পেরেছো কী?

চোখের জলে ভাসতে ভাসতে শ্রমিকেরা বললো—আজ্ঞে না, রাজামশাই! হাসলেন রাজা। ডেকে পাঠালেন "থেলস" নামে এক রাজকর্মচারীকে। ইনি হিসেবের কাজ করতেন।

থেলস আসতে রাজা বললেন—আপনাকে ঐ পিরামিডের উচ্চতাটা মেপে দিতে হবে। সময় দিলাম মাত্র একদিন। যদি না পারেন, তাহলে চাকরি যাবে আপনার।

থেলস ছিলেন মহাপণ্ডিত। একটুখানি চিন্তা করার 'পর বললেন—এ আর এমন কী শক্ত কাজ মহারাজ! আমি এক্ষুণি মেপে দিচ্ছি।

থেলস প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কোথা থেকে নিয়ে এলেন একটা লাঠি এবং একটা মাপনি দণ্ড। পিরামিডের কাছে খোলামাঠে লাঠিটা পুঁতলেন। তারপর পিরামিড এবং লাঠি উভয়ের ছায়ার দৈর্ঘ্য মাপলেন মাপনি দণ্ড দিয়ে। মাত্র দু' মিনিটও গেল না, থেলস বার করে ফেললেন পিরামিডের উচ্চতা।

এই সহজ উপায়টা তিনদিন ধরে চিন্তা করেও মাথায় আসেনি বলে শ্রমিকেরা লজ্জায় মাথা হেঁট করলো। রাজা হেসে মন্ত্রীমশাইর দিকে তাকিয়ে বললেন —আপনাকেও একটা বিশেষ পদ্ধতি বার করতে হবে-যাতে অতি সূক্ষ্মভাবে পিরামিডের উচ্চতা মাপা যাবে। প্রজাদের মতে আপনি যেহেতু বেশী বেতন গ্রহণ করেন, সেই কারণে আশা করবো আপনার পদ্ধতিটা একটু স্বতন্ত্র হবে!

মন্ত্রীমশাই ক্ষণকাল নীরব থেকে বললেন—আমাকে মাত্র দুটি দিন সময় দিতে হবে মহারাজ। মনে হয় ঐ দুদিনেই আপনার অভিলাষকে পূর্ণ করতে পারবো।

রাজা বললেন—ঠিক আছে, আপনাকে দুদিনই সময় দিলাম।

মন্ত্রীমশাই দুদিন ধরে জরীপ বিভাগের কর্মচারীদের সঙ্গে কী সব আলোচনা করলেন এবং তৈরি করলেন একটি বিশেষ যন্ত্র। যে যন্ত্রের দ্বারা পিরামিডের উচ্চতা খুব সহজেই অঙ্ক কষে নির্ণয় করা গেল। আর রাজাও হলেন বেজায় খুশি।

এই-যন্ত্রটির নাম সেক্সট্যাণ্ট। খ্রীষ্টজন্মের প্রায় পাঁচশো বছর আগে তৈরি হয়েছিল এবং যন্ত্রটি তৈরির কিংবদন্তী উল্লেখ করা হলো।

সেক্সট্যান্ট আবিষ্কৃত হওয়ায় মানুষের সুবিধা হয়েছে অনেকখানি। বড় বড় পাহাড় পর্বতের উচ্চতা নির্ণয় করা তো হয়ই, অধিকন্তু গ্রহ নক্ষত্রদের দূরত্ব ও অবস্থান নির্ণয়েরও সুবিধা হয়েছে।

✪ মুদ্রাযন্ত্র ✪

এক ছিলেন মণিকার। অপরদিকে ভাল শিল্পীও ছিলেন তিনি। নানা ধরনের রত্নপাথরকে কেটে ভালভাবে পালিশ করতে পারতেন বলে নাম ডাক ছিল যথেষ্ট। রাজ্যের যত ধনীব্যক্তি সবাই পছন্দ করতেন তাঁর কাজ। তাই বড় বড় লোকের মনোরঞ্জন করতে হতো বলে শিল্পীকে একটু বেশী খাটতে হতো।

একদিন কাজ করতে করতে ভারি পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেন শিল্পী। ভাবলেন, আজ আর নয়। মনটাকে অবসাদমুক্ত করার জন্য স্ত্রী এনাকে ডেকে বললেন—এসো, এক হাত তাস খেলা যাক।

এনাও হাসিমুখে এগিয়ে এলেন তাস খেলতে।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তখন তাস কিন্তু সহজলভ্য ছিল না। মোটা মোটা চারকোনা কাগজের উপর শিল্পীদের রঙ তুলির মাধ্যমে এক একটি করে ধৈর্যসহকারে ছবি আঁকতে হতো। খেলা শেষে সেদিন শিল্পীর কী খেয়াল হলো! ভাবলেন, নিজের হাতেই ছবি এঁকে এক বাণ্ডিল ভাল তাস তৈরি করে নেবেন।

শিল্পীর খেয়ালতো! সঙ্গে সঙ্গে বসে গেলেন কাগজ ও রঙ-তুলি নিয়ে। কিন্তু কয়েকখানা আঁকার পর বিরক্ত হলেন মনে মনে। এতগুলো তাসের ছবি আঁকা কম সময়ের ব্যাপার! শিল্পী তখন স্বল্প সময়ের মধ্যে কেমন করে বেশী তাস আঁকা যাবে—তারই চিন্তা শুরু করে দিলেন।

ঘরে হাতুড়ি বাটালি ছিল, আর ছিল টুকরো টুকরো কাঠ। শিল্পী ভেবে চিন্তে কয়েকখানা কাঠের টুকরো নিলেন এবং তাদের এক পাশে এক একটি তাসের ছবি খোদাই করলেন। তারপর কালি মাখিয়ে কাগজের উপর ছাপ দিলেন। চমৎকার চমৎকার তাস পাওয়া গেল। শিল্পী এবার আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাস হাতে ছুটলেন স্ত্রী এনার কাছে। এনাও খুব খুশি হলেন এবং উৎসাহিত করলেন আরও তাস তৈরির জন্য।

শিল্পীর আগ্রহ বেড়ে গেল। দোকানের কাজকর্ম আপাতত স্থগিত রেখে তাস তৈরির কাজে মন দিলেন। কয়েকদিনের ভেতরেই তৈরি করে ফেললেন কয়েক বাণ্ডিল তাস এবং বন্ধুদের এক এক বাণ্ডিল করে উপহারও দিলেন।

অসুবিধেও অনুভব করলেন একটু। বুঝতে পারলেন, একটা কাঠের ছাঁচ দিয়ে কয়েকবার কাগজে ছাপ দিলে ছাপটা ভোঁতা হয়ে পড়ছে। ফলে আগের মত তত ভাল ছাপ পড়ছে না। অপরদিকে ছাঁচের উপর কালি বেশী কম হলে তাসের ছবিও খারাপ হয়ে পড়ে।

উপরোক্ত অসুবিধাগুলিকে দূর করার জন্য অনেক খোঁজাখুঁজি করলেন। শেষে বুঝতে পারলেন, ছাঁচ তৈরির কাজে একমাত্র আপেল গাছের কাঠই কিছুটা উপযোগী। অপরদিকে কালির বদলে কাজলের তেল ব্যবহার করলে সুবিধা পাওয়া যায় বেশী।

শিল্পী এবার উন্নত মানের ছাঁচ এবং কালি তৈরী করে নিয়ে তাস ছাড়াও ছবি এবং অক্ষরকে কাঠের উপর খোদাই করতে শুরু করলেন। বড় বড় কাঠের ব্লকে মহাপুরুষদের ছবি এবং ছবির নীচে সংক্ষিপ্ত জীবনী খোদাই করে কাগজের উপর ছাপ দিলেন। চমৎকার ছবি পাওয়া গেল। ঐ ছবিকে দোকানেই খাটিয়ে রাখলেন। যাঁরা দেখলেন, তাঁরাই অবাক হলেন। দাম দিয়ে কিনে নিয়ে গেলেনও অনেকে।

একদিন এক পাদরী সাহেব এলেন দোকানে। শিল্পীর নৈপুণ্য দেখে বিস্মিত না হয়ে পারলেন না। ভাবলেন তিনি, যদি মহাজীবন কাহিনীগুলিকে এইভাবে ছেপে জনসাধারণের মধ্যে বিলি করা যেতো, তাহলে মানুষ অনেক উপকৃত হতো!

পাদরী সাহেব ষাট পৃষ্ঠার একখানা 'মহাজীবন কথা'র বই লিখে শিল্পীর কাছে এলেন। যেমন করে হোক ওকে ছাপাতেই হবে এবং প্রত্যেক মহাপুরুষের ছবিও দিতে হবে।

শিল্পী প্রথমটায় একটু থতমত খেয়ে গেলেন। এতগুলো অক্ষর কাঠে খোদাই করা কী চাট্টিখানি কথা। কিন্তু পাদরী সাহেব কিছুতেই ছাড়লেন না। শেষে বাধ্য হতে হলো শিল্পীকে। তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন স্ত্রী এনা এবং তাঁর দুজন অন্তরঙ্গ বন্ধু।

কয়েকমাস অক্লান্ত পরিশ্রমের পর বইটির ছাপার কাজ সম্পূর্ণ হলো। বই পেয়ে পাদরী সাহেব বেজায় খুশি হলেন। শিল্পীকে শুধু পারিশ্রমিক দিলেন না, উৎসাহিতও করলেন এবং বাইবেল ছাপতে অনুরোধ জানালেন।

শিল্পী কর্তৃক 'মহাজীবন কথা'র বইই পৃথিবীর প্রথম ছাপার অক্ষরের বই। ওতে কৃতকার্য হওয়ায় শিল্পী সত্য সত্যই একদিন বাইবেল ছাপতে মনস্থ করলেন। কাঠের উপর অনেক অক্ষরকে খোদাই করতে হবে। তাই স্ত্রী ও বন্ধুদ্বয় ছাড়া আরও কয়েকজন সহযোগীর দরকার হলো। আর্থিক অনটন সত্ত্বেও কেবলমাত্র মনের জোরকে সম্বল করে একদিন শুভক্ষণে এই মহানকর্মে ব্রতী হলেন।

চারদিনের দিন প্রস্তুত হলো বাইবেলের প্রথম পৃষ্ঠার ব্লক। ব্লকখানাকে হাতে নিয়ে শিল্পী নিজেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছিলেন ভাল করে। এমন সময় ঘটলো এক অঘটন। ব্লকখানা হাত ফস্কে পড়ে গেল মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে ভেঙে একেবারে দু-টুকরো।

এমন একটা মহান কাজে প্রথমে এই ধরনের একটা ধাক্কা পেয়ে শিল্পী একেবারে মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু এনা আদৌ ভেঙে পড়লেন না। তিনি উৎসাহিত করলেন স্বামীকে। বললেন—এটিকে বাধা বলে মনে করছো কেন?

ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে মনে করতে পারোনা! হয়ত তোমাকে দিয়ে তিনি আরও উন্নত কিছু করাতে চান! অতএব মন খারাপ না করে নতুন করে চিন্তা ভাবনা কর।

এনার কথায় উৎসাহিত হলেন শিল্পী। কয়েকদিন ধরে খুব করে ভাবলেনও। শেষে স্থির করলেন, কাঠের উপর অক্ষর খোদাই করতে গেলে যে কোন সময় এমন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। তার চেয়ে কাঠের অক্ষর তৈরি করে কাঠের ফলকে একটার পর একটা সাজিয়ে দিলে কেমন হয়! কোন কারণে ফলক যদি ভেঙ্গে যায়, কিংবা দু-চারটি অক্ষর নষ্ট হয় তাহলে অল্পায়াসেই ঠিক করে নেওয়া যাবে! শুধু কী তাই! অক্ষরগুলোকে সাজিয়ে বাইবেল ছাড়া অন্য বইকেও ছাপানো যাবে।

বাইবেল ছাপার কাজ আপাতত স্থগিত রেখে অক্ষর তৈরির কাজে মন দিলেন শিল্পী। কয়েক মাসের পরিশ্রমে কয়েক হাজার অক্ষর তৈরি হয়ে গেল। শিল্পী এই অক্ষরগুলোর নামকরণ করলেন টাইপ।

পর্যাপ্ত অক্ষর হাতে আসায় শিল্পী এবার স্ত্রী এনা এবং সহযোগী বন্ধুদের নিয়ে বসে গেলেন কাঠের ফলকে সেগুলোকে সাজাতে। এবার খুব বেশী বেগ পেতে হলোনা। অতি অল্প দিনের ভেতরেই ছেপে ফেললেন পুরো বাইবেল। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল এবং সেই থেকেই সূচনা হলো মুদ্রণের কাজ।

এই খেয়ালি শিল্পীটির নাম গুটেনবার্গ। একদিন অপরিসীম ক্লান্তির হাত থেকে মুক্তি পেতে হাতে তুলে নিয়েছিলেন তাস। আর সেই তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীতে গড়ে উঠলো ছাপার কাজ! মানুষের কাছে এতদিনে উন্মুক্ত হলো জ্ঞানের ভাণ্ডার।

শিল্পী গুটেনবার্গ সারাজীবন অক্লান্ত পরিশ্রম করে গেলেন মুদ্রণশিল্পের উন্নতির জন্য। তিনিই উদ্ভাবন করে গেছেন কাঠের টাইপের বদলে ধাতুর তৈরী টেকসই টাইপ। তাঁকে সর্বোতোভাবে সাহায্য করেছিলেন এনা।

শিল্পীর শেষজীবন বড় দুঃখময়। ব্যবসায়িক বুদ্ধি ছিলনা তাঁর এবং তাঁর স্ত্রী এনার। কেবলমাত্র আবিষ্কারের নেশাটাই প্রবল ছিল। তাই পদে পদে হোঁচট খেতে হয়েছে। এমনকি অর্থাভাবে সুচিকিৎসা না পেয়ে এনাকে অকালমৃত্যুও বরণ করতে হয়েছে।

এনার মৃত্যুর পর গুটেনবার্গ আর গবেষণা করতে পারেন নি। কপর্দক শূন্য অবস্থায় তাঁকে কাল কাটাতে হয়েছিল। শেষে তাঁর সেই চরম অর্থ-সঙ্কটের দিনে মেঞ্জের পাদরী সাহেব নিতান্ত দয়াপরবশ হয়ে কিছু পেনসনের ব্যবস্থা করেছিলেন।

[অনেকের মতে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন দেশে মুদ্রণ ব্যবস্থা প্রথম প্রচলন হয় এবং এর আবিষ্কারক বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ। জাপানী গাথায়ও লেখা আছে, ৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে দশলক্ষ মন্ত্র ছাপানো হয়েছিল। চীনদেশে সে সময় কাগজের উপর বুদ্ধমূর্তির ছাপ দেওয়া হতো বলেও প্রবাদ আছে।

এগুলোর কিছু কিছু পৃথিবীর বিভিন্ন যাদুঘরে রক্ষিতও আছে। তবুও ছাপাখানার প্রকৃত আবিষ্কর্তা বলতে শিল্পী গুটেনবার্গকেই ধরা হয়।]

✪ জলের স্বরূপ ✪

এক ছিলেন বিজ্ঞানী। নাম তাঁর ক্যাভেণ্ডিস। যেমন লাজুক, তেমনই অল্পভাষী। বিশেষ করে লজ্জা যেন একেবারে পেয়ে বসেছিল তাঁকে। কারও সঙ্গে কথা বলতে গেলে লজ্জা, পথ হাঁটতে লজ্জা, কাজ করতে লজ্জা, লজ্জায় মুখই তুলতেন না। বিশেষ করে মেয়েদের সামনে পড়লে তো কথাই নেই। ছুটে গিয়ে একরকম ঘরে খিল দিয়ে বসতেন যেন।

এমন যে লাজুক, তিনি আর করবেন কী? রাত দিন ঘরের কোণে বসে থাকতেন আর যন্ত্রপাতিগুলোকে নাড়াচাড়া করতেন। গবেষণাগারে বসে নানা ধরণের গ্যাস তৈরি করারও শখ ছিল তাঁর। তাই অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি হরেক রকমের গ্যাস প্রস্তুত করার সরঞ্জাম থাকতো তাঁর হাতের কাছে। আর মাঝে মাঝে করতেন কী! দু-তিনটে গ্যাসকে একসঙ্গে মিশিয়ে তার ভেতরে আগুন জ্বালাতেন, কখনও প্রখর সূর্যালোকে ফেলে রাখতেন, আবার কখনওবা গ্যাস মিশ্রণের ভেতরে বিদ্যুৎ পাঠাতেন।

একবার কী খেয়াল চাপলো তাঁর মাথায়! দু'ভাগ হাইড্রোজেন ও একভাগ অক্সিজেনকে একটা বন্ধ কাচনলে ঢুকিয়ে তার ভেতরে চালিয়ে দিলেন বিদ্যুৎ। আর যায় কোথায়! বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, কাচনলের ভেতরে জমে উঠলো বিন্দু বিন্দু জল।

জল কেমন করে এলো! ভাবতে বসলেন ক্যাভেণ্ডিস। একবার নয়, দু'বার নয়, বেশ কয়েকবারই পরীক্ষাটির পুনরাবৃত্তি ঘটালেন। কিন্তু প্রত্যেক বারই লক্ষ্য করলেন দু আয়তন হাইড্রোজেন এবং এক আয়তন অক্সিজেনের মিশ্রণের ভেতরে বিদ্যুৎ পাঠালে জলই উৎপন্ন হয়।

ক্যাভেণ্ডিসের সময় পর্যন্ত সবারই ধারণা ছিল, জল একটি মৌলিক পদার্থ। ক্যাভেণ্ডিসেরও সেই একই ধারণা ছিল। অর্থাৎ জলকে বিশ্লেষণ করলে শুধু জল ছাড়া আর কিছুটি পাওয়া যাবে না। কিন্তু ক্যাভেণ্ডিসের এই পরীক্ষাটি বিজ্ঞানীদের চিরাচরিত ধারণার মূলে করলো কঠিন আঘাত। প্রমাণিত হলো, জল মৌলিক পদার্থ নয়। অক্সিজেন ও হাইড্রোজেনের একটি যৌগ।

ক্যাভেণ্ডিসের মতটাকে কিন্তু সেদিন কোন বিজ্ঞানী সহজে স্বীকার করে নেননি। বহু জনে হাতে নাতে পরীক্ষা করেছিলেন। বহুজনে জলকে বিশ্লেষণও করেছিলেন। যখন জলের সঙ্গে অল্প অম্ল মিশিয়ে বিদ্যুৎ দ্বারা বিশ্লেষণের মাধ্যমে দু আয়তন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন অক্সিজেন পাওয়া গেল তখনই প্রতিষ্ঠিত হলো ক্যাভেণ্ডিসের মত।

এবার জলকে নিয়ে রীতিমত হৈ চৈ পড়ে গেল। বিজ্ঞানীরা জল সম্বন্ধে আরও নতুন নতুন তথ্য উদ্ঘাটনে হলেন আগ্রহী। কেউ জলের ধর্মকে নিয়ে মশগুল হলেন, কেউ জলের ফরমুলা নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন, কেউবা জলের সঙ্গে অপরাপর কোন্ পদার্থের কী ক্রিয়া হয় সেই নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন।

অল্পকালের মধ্যেই জলের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটন করলেন বিজ্ঞানীরা এবং ফরমুলা ঠিক করলেন H_2O।

সেকালে আবিষ্কারটি একমাত্র পাশ্চাত্যের কয়েকটি দেশেই সীমাবদ্ধ ছিল। অপরাপর অনেক দেশ এ-বিষয়ে বিশেষ কোন খোঁজখবর রাখতো না। তাই জলের এই ফরমুলাটিকে নিয়ে অনেক দেশে অনেক হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। সবচেয়ে মজার ঘটনা ঘটেছিল তুরস্কে। কাহিনীটি শুনলে তোমাদেরও হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবে। শোন তাহলে সেই ঘটনাটি।

ঐ সময়ে দেশে দেশে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জন্য ইংলণ্ডে প্রবলভাবে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। নতুন নতুন দেশে উৎসাহী খ্রীষ্টান মিশনারীরা ছুটছেন। তুরস্কেও এসেছেন কয়েকজন মিশনারী। কিন্তু তুর্কীরা ইংরাজী জানতেন না বা সেদেশে শিক্ষার প্রসারও তেমন ছিল না। মিশনারীরা চিন্তা করলেন, যদি এখানকার মানুষকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তোলা যায় তাহলে নিশ্চয়ই তারা খ্রীষ্টধর্মের প্রতি আকর্ষণ বোধ করবে।

মিশনারীরা এবার বুদ্ধি-খরচ করে বিদ্যালয় স্থাপনে যত্নবান হলেন। শিক্ষাদানের ব্যাপারে তাঁরা কোন পারিশ্রমিক তো গ্রহণ করলেন না, অধিকন্তু ছাত্রদের বিনি পয়সায় বইও সরবরাহ করতে শুরু করলেন। যেহেতু এদেশে শিক্ষাদানের উপযোগী কোন ভাল বই ছিল না, তাই মিশনারীরা নিজের দেশ থেকে বই আনাতেন এবং বিলি করতেন।

বিনি পয়সায় শিক্ষালাভ করতে পারায় ছাত্র সংখ্যা বেশ বেড়ে গেল। ইংলণ্ড থেকে তাই আসতে লাগলো হাজারে হাজারে বই। এলো ধর্মশাস্ত্রের বই, দর্শনের বই, সাহিত্যের বই, ইতিহাসের বই, বিজ্ঞানের বই, যেন বইয়ের পাহাড়।

শুল্ক বিভাগের কর্মচারীরা কিন্তু বিদেশ থেকে বই এলে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। কেননা, বই-এর মাধ্যমে এদেশের মানুষদের মিশনারীরা ক্ষেপিয়ে তুলতে পারেন অথবা বই-এর গাদার ভেতরে বাহির থেকে অস্ত্রশস্ত্রও আমদানি হতে পারে! অথচ মজার কথা, কর্মচারীদের কেউই ইংরেজী জানতেন না। দু-একজন শুধু ইংরেজী অক্ষরগুলো চিনতে পারতেন মাত্র।

তখন তুরস্কের রাজা ছিলেন দ্বিতীয় হামিদ। একদিন শুল্ক বিভাগের জনৈক কর্মচারী বইগুলো পরীক্ষা করতে করতে একখানা বইতে দেখলেন, বেশ কয়েক জায়গায় লেখা আছে H_2O। কর্মচারীটির উর্বর মস্তিষ্ক তৎক্ষণাৎ ধরে ফেললো সঙ্কেতটি রাজা দ্বিতীয় হামিদের বিরুদ্ধে বিদেশীদের চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়। বইটি বগলদাবা করে ছুটে গেলেন

রাজদরবারে—একেবারে রাজার কাছে। বললেন—মহারাজ! মিশনারীরা দেশ থেকে যে সব বই আনাচ্ছে, সেগুলি প্রকৃত শিক্ষাদানের নিমিত্ত আনাচ্ছে না। ভেতরে ভেতরে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে এবং আপনাকে তারা সরিয়ে ফেলতে চায়। বিস্মিত রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন করে বুঝলে? কর্মচারীটি বিনয়ের সঙ্গে বললেন—মহারাজ! আপনি হামিদ দ্বিতীয়। হামিদ নামের ইংরেজী আদ্যক্ষর H। H এর তলায় ২ বসিয়ে তারা আপনাকে বোঝাতে চেয়েছে। আর তার পাশে O বসিয়ে আপনার অযোগ্যতা প্রমাণ করতে চাইছে। O অর্থে আপনাকে ধরা থেকে সরিয়ে দেওয়ার মতলব।

রাজা এবং রাজকর্মচারীরা সবাই তারিফ করলেন কর্মচারীটির বুদ্ধির। রাজার নির্দেশে রাজ্যে যেখানে যত মিশনারী ছিলেন সবাইকে জেলখানায় পুরে দেওয়া হলো।

বেচারা মিশনারীরা! মানুষের ভাল করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত কারাবরণ করলেন। অবশেষে রাজরোষের কারণ অবগত হওয়ায় দেশবিদেশ থেকে বহু জ্ঞানী গুণীকে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁরাই প্রমাণ করলেন, H_2O অর্থে অপদার্থ রাজা দ্বিতীয় হামিদ নয়—অতি সাধারণ এক পদার্থ, নাম তার জল বা হাইড্রোজেন মনঅক্সাইড।

✪ সেল্লুলয়েড ✪

এক ছিলেন রসায়ন বিজ্ঞানী।

ফরম্যালডিহাইড নামে একটি রাসায়নিক পদার্থকে নিয়ে রোজ রোজ গবেষণা করতেন। তাঁর টেবিলে সবসময় মজুত থাকতো বোতল বোতল ফরম্যালডিহাইড এবং আবার কিছু কিছু রাসায়নিক পদার্থ।

একদিন সকাল বেলায় বিজ্ঞানী গবেষণায় মত্ত ছিলেন। এমন সময় তাঁর পরিচারকটি এসে বললো—স্যার, আপনার সকালের খাবার এনেছি।

মুখ না তুলেই বিজ্ঞানীটি বললেন—খাবারটা একপাশে ঢাকা দিয়ে রেখে যাও। একটু পরেই খেয়ে নেবো।

পরিচারকটি আর কী করে? বিজ্ঞানীর জলযোগের জন্য আনা ছানার বাটিটি টেবিলে ঢাকা দিয়ে নিজের কাজে চলে গেল। বুঝিবা বিজ্ঞানীর ভুলো মনের কথা ভেবে কিছু উপদেশও প্রদান করেছিল।

জানালার পাশে অনেক আগে থেকে চুপচাপ বসে ছিল একটি হুলো বেড়াল। প্রতিদিন সকালে মনে হয় বিজ্ঞানীর খাবারের কিছু কিছু ভাগ পেতো সে। তাই গোঁফজোড়া ফুলিয়ে পিট্‌পিট্‌ করে তাকাচ্ছিল ছানার দিকে।

অনেকক্ষণ কেটে গেল, তবু বিজ্ঞানী খাওয়ার নামটি পর্যন্ত করলেন না। বুঝিবা ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো হুলোটার। বিজ্ঞানীর অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়ে এই উপাদেয় খাবারটিকে সৎকার করতে মনস্থ করলো।

বিজ্ঞানী ছানার বাটিটার কথা কখন ভুলে গেছেন। ফরম্যালডিহাইডের গুণাগুণ নির্ণয় করার জন্য একেবারে মশগুল। হুলোটা পা চেপে চেপে টেবিলের কাছে এলো, বুঝিবা ম্যাঁও ম্যাঁও শব্দে বিজ্ঞানীর ধ্যান ভাঙ্গাতে চেষ্টা করলো। কিন্তু না, বিজ্ঞানী আদৌ দৃষ্টি দিলেন না সেদিকে।

আর ধৈর্য ধারণ করা সম্ভব হলো না হুলোর পক্ষে। দুম্ করে লাফিয়ে পড়লো টেবিলের উপরে। আর পড়বি তো পড়্ সেই মুখখোলা ফরম্যালডিহাইডের বোতলগুলোর মাথায়।

হুলোটা নির্বিঘ্নে কাজটা হাসিল করতে পারলনা। বিকট এক ঝন্‌ঝন্ শব্দে সচকিত হয়ে লেজ তুলে লাগালো ভোঁ দৌড়। আর সেই শব্দে বিজ্ঞানীরও তন্ময়তার ঘোর কেটে গেল।

বিজ্ঞানী প্রথমটায় বেশ থতমত খেয়ে গিয়েছিলেন। পরে ব্যাপারটা ঠিকমত বুঝতে পেরে হায় হায় করে উঠলেন। বোতলগুলোর কয়েকটা ভেঙ্গেছে, ফরম্যালডিহাইড চারদিকে ছিটকে পড়েছে আর ছানার বাটিটাও উল্টে পড়ে গেছে ফরম্যালডিহাইডের মধ্যে। এতগুলো ফরম্যালডিহাইড নষ্ট হওয়ায় খুব দুঃখ পেলেন বিজ্ঞানী।

কী আর করেন ভদ্রলোক! ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর ছানাটার কথা মনে এলো তাঁর। পাছে ছানা না খাওয়ার জন্য পরিচারকটির কাছে কৈফিয়ৎ দিতে হয়, এই ভয়ে আগে ছানাটাকে সরাবার মতলব করলেন।

কিন্তু এ কী! ছানাটাকে তুলতে গিয়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। কোথায় সেই তুলতুলে নরম ছানা, তার বদলে সাদা সিমেণ্টের মত শক্ত এক কঠিন পদার্থ! হাত দিয়ে খুব টিপলেন, মেঝেতে বারকয়েক আছাড় দিলেন তবু জমাট বাঁধা ছানাটার একটা সামান্য অংশও ভাঙ্গতে পারলেন না।

ছানাটাকে আর ফেলে দেওয়া হল না বিজ্ঞানীটির। তাঁকে কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছিল কিনা—তাও জানা যায় না। তবে সেই আকস্মিক ঘটনা থেকে বিজ্ঞানীটি প্রথম আবিষ্কার করেন সেলুলয়েড জাতীয় জিনিসকে। তবে সে আবিষ্কারের কৃতিত্ব বিজ্ঞানীর, না হুলো বেড়ালটার—সে বিচার করার ভার তোমাদের উপর ছেড়ে দেওয়া হলো।

✪ অ্যালুমিনিয়াম ✪

অনেকদিন আগেকার কথা। ইতালির আগ্নেয়গিরি অঞ্চলে রঙ-বেরঙের ভারি চমৎকার এক ধরণের পাথর কুড়িয়ে পাওয়া যেতো। প্রাচীনকালে

প্রকোষ্ঠ মাত্র। প্রচণ্ড গতিশীল রকেটরা তাকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সীমা অতিক্রমণ করাতে সাহায্য করে। মাধ্যাকর্ষণ বল ছিন্ন করার পর আকর্ষণহীনতার জন্য পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে করতে এগিয়ে যায় দূরে—গ্রহ উপগ্রহের দিকে। তারপর গ্রহ উপগ্রহদের আকর্ষণের আওতায় এলে আপনা হতেই নেমে পড়ে। তার জন্য অবশ্য বহু যান্ত্রিক ব্যবস্থা থাকে—যার খুঁটিনাটি বিবরণ দেওয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের সাধ্য নয়। তবে গ্রহান্তরে পরিভ্রমণ করার ব্যাপারে মহাকাশযান অপেক্ষা রকেটেরই কৃতিত্ব বেশী।

✪ ডেভির নিরাপত্তা বাতি ✪

খনি গর্ভ অন্ধকারাচ্ছন্ন। সেখানে কাজ করার বিপদও অনেক। বিষাক্ত গ্যাস জমা হয়ে থাকে, ধস নামে, আরও কত কী! কয়লার খনিতে আবার আলো নিয়ে ঢোকার উপায় নেই। কেননা কয়লা খনির সব জায়গায় জমা থাকে অল্প বিস্তর মিথেন গ্যাস বা মার্স গ্যাস। মিথেন গ্যাস কার্বন এবং হাইড্রোজেনের একটি যৌগিক। পচা পুকুরে বা জলা ভূমিতে আপনা হতেই ঐ গ্যাসের জন্ম হয়। তাই গ্যাসটির নাম মার্স গ্যাস বা "জলাভূমির গ্যাস"।

মার্স গ্যাসের একটা বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওর সঙ্গে বাতাসের মিশ্রণ ঘটলে অতি অল্প তাপমাত্রায় সামান্য আগুন কিংবা আলোর সংস্পর্শে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ সহকারে জ্বলে উঠে। তাই কয়লা খনির খাদে মার্স গ্যাস জমা থাকে বলে মোমবাতি অথবা কেরোসিনের বাতি ব্যবহার করা ভয়ানক বিপজ্জনক। কিন্তু খনিতে তো কাজ করতে হবে!

কয়লা হচ্ছে এমন একটি পদার্থ, যা না হলে মানুষের একদণ্ডও চলে না। এখন অবশ্য বিদ্যুৎশক্তি প্রয়োগ করে মানুষ হরেক রকমের কাজ সম্পন্ন করছে তবুও কয়লার ব্যবহার আদৌ কমছে না। এখনও বহু ট্রেনে কয়লার ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়, কলকারখানায়, ধাতু নিষ্কাশনে, আলকাতরা উৎপাদনে, রান্নার কাজে কয়লার ব্যবহার চিরকালই থাকবে। এ হেন প্রয়োজনীয় জিনিস খনি থেকে উত্তোলন না করলে চলবে কেন?

অপরাপর খনির চেয়ে কয়লার খনিতে কাজ করার বিপদ বেশী। সেখানে ধস নামে প্রচুর। বিষাক্ত গ্যাসে দম বন্ধ হয়ে অনেক কর্মী মারা যায়। কখনও কখনও ভূগর্ভে সঞ্চিত জলরাশি হঠাৎ খাদের মধ্যে প্রবেশ করে কুলি কামিনদের ডুবিয়ে মারে। তার উপর আছে আলো জ্বালাবার বিপদ। এখন অবশ্য বহু বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবে আলো জ্বালাবার বিপদ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিল ডেভির নিরাপত্তা বাতি ব্যবহার করে।

এই বাতির আবিষ্কর্তা স্যার হামফ্রে ডেভি। খনি শ্রমিকদের নিরাপত্তার জন্য তিনি এটি আবিষ্কার করেছিলেন ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে। বাতিটি সাধারণ কেরোসিন

ল্যাম্পের মত এবং কেরোসিনেই জ্বালান হয়ে থাকে। বাতিটির সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, বাতির উপর যে চিমনিটা ব্যবহার করা হয় তার উপরিভাগটা তামা কিংবা লোহার তার জালি দিয়ে তৈরি। তামা কিংবা লোহা তাপের অত্যন্ত সুপরিবাহী। অর্থাৎ এইসব তারগুলোর কোন একটি স্থান তাপ লাভ করলে সেই তাপকে অতি দ্রুত অন্য স্থানে সরবরাহ করতে পারে। ডেভির আলো থেকে যে তাপ নির্গত হয়, উপরিভাগে তার জালি থাকার জন্য দ্রুত পরিবহনের দ্বারা অন্য জায়গায় চালান করে দেয়। বাহিরের গ্যাস কিছুতেই জ্বলনাঙ্কে পৌঁছাতে পারে না। তাই মার্স গ্যাস ও বায়ুর মিশ্রন বিস্ফোরক হওয়া সত্বেও প্রজ্বলন ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে এবং কিছুতেই জ্বলে উঠে খনির মধ্যে অগ্নিকাণ্ড ঘটাতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, একটা দিয়াশলাইর কাঠিকে আগুনে গুঁজে দিলে সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠবে না। অল্প একটু সময়ের দরকার হবে অর্থাৎ ঐ সময়ের মধ্যে উত্তপ্ত হতে হতে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পৌঁছে যায়—যে তাপ-মাত্রা দিয়াশলাই কাঠির বারুদকে বিস্ফোরণ ঘটাতে সক্ষম। ঐ তাপমাত্রাই দিয়াশলাই কাঠির জ্বলনাঙ্ক। যদি সেই তাপমাত্রার কম তাপমাত্রায় রাখা হত তাহলে সে কিছুতেই জ্বলে উঠতে পারত না। এইভাবে যে কোন পদার্থের প্রজ্জ্বলিত হওয়ার একটা নির্দিষ্ট উষ্ণতা আছে। বিস্ফোরক পদার্থের বেলায় এই উষ্ণতা খুবই কম। তা সে কঠিন, তরল কিংবা গ্যাস যাই হোক না কেন।

কয়লাখনিতে মার্স গ্যাসের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয় না। আলো কর্তৃক উদ্ভুত তাপকে তারজালি দ্রুত পরিবহন করে বাহিরের গ্যাস মিশ্রণকে একদিকে যেমন জ্বলনাঙ্কে পৌঁছাতে দেয় না অপর দিকে জ্বলে থাকার জন্য যে বাতাসের প্রয়োজন হয় তাকেও প্রবেশ করতে বাধা প্রদান করে না। খাদের মধ্যে মিথেন বা মার্স গ্যাসের অস্তিত্বও নির্ণয় করা যায় এই বাতির দ্বারা। যদি বাতাসের সঙ্গে মিথেন গ্যাস থাকে তাহলে বায়ু প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু মিথেন গ্যাসও প্রবেশ করে এবং বাতিটি নীল শিখায় জ্বলতে আরম্ভ করে। তখনই বুঝে নেওয়া হয় খাদের মধ্যে মিথেন গ্যাস আছে। পরিমানটা নির্ণয় করে নেওয়া হয় অপর একটা যন্ত্রের সাহায্যে। যদি দেখা যায় মিথেন গ্যাসের পরিমান ধীরে ধীরে বিপদসীমা অতিক্রম করে যাচ্ছে তখন সতর্কতামূলক বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হয়।

আবিষ্কারের পর থেকে এ পর্যন্ত ডেভির নিরাপত্তা বাতির যথেষ্ট উন্নতি সাধন হয়েছে। এখন খনি গর্ভকে আলোকিত করার জন্য এ বাতির প্রয়োজন হয় না। বৈদ্যুতিক বাতিই এখন সে স্থান দখল করেছে। সেখানে দিনের আলোর মতই সব কিছু পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। তবু ডেভির নিরাপত্তা বাতির চাহিদা কমেনি। খনিতে দাহ্য গ্যাসের পরিমাণ নির্ণয় করার একটা বড় হাতিয়ার হচ্ছে এই বাতি। আলোটির কলকব্জা কিছুই নেই, তৈরী করাও এমন কিছু কঠিন নয়। তবুও এই সাধারণ একটি আলো লক্ষ লক্ষ মানুষের উপকার করে আসছে। ডেভির এই আবিষ্কারের সত্যি কোন তুলনা হয় না।

———

রোমানরা ঐ পাথরগুলোকে বলতেন অ্যালুমেন। আর ওকে তাঁরা ব্যবহার করতেন কোন কিছুকে রাঙাতে এবং ওষুধরূপে। যে কোন ধাতব পাত্রের গায়ে ওর প্রলেপ দিলে ঝক্‌ঝকে ও সুন্দর দেখাতো বলে অনেকেই অ্যালুমেনের খোঁজ করতেন। কিন্তু জিনিসটি যে প্রকৃতপক্ষে কী তার খবর কেউ রাখতেন না, বা ওকে পরীক্ষা করার চেষ্টাও কেউ করেননি।

অ্যালুমেনকে নিয়ে রোমানদের পরে কেউ পরীক্ষা নিরীক্ষা চালিয়েছিলেন কিনা বলা যায় না। তবে ব্যবহার ওর অব্যাহতই ছিল। আর ওকে প্রথম পরীক্ষা করার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন স্যার হামফ্রে ডেভি (১৭৭৮—১৮২৯ খ্রীঃ)। তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন, অ্যালুমেন কোন মৌলিক পদার্থ নয়। এটির একটি উপাদান অক্সিজেন এবং অপর একটি উপাদান এমন একটি ধাতু-যার নাম আজও পর্যন্ত কেউ জানে না। অ্যালুমেনের অন্যতম উপাদান বলে ডেভি উক্ত ধাতুটির নামকরণ করেন "অ্যালুমিনিয়াম"।

মজার কথা, ডেভি ধাতুটির নামকরণ করলেন বটে কিন্তু চোখে দেখলেন না। রীতিমত পরীক্ষাও চালালেন। তথাপি কোনমতেই অ্যালুমেন থেকে আসল ধাতুটির এক কণাও বিচ্ছিন্ন করতে পারলেন না।

ডেভির কাল কেটে গেল। অথচ নতুন ধাতুটিকে আবিষ্কার করার জন্য বিজ্ঞানীদের মধ্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা রইলো অব্যাহত। ধীরে ধীরে যেন প্রতিযোগিতাও শুরু হয়ে গেল। কে আগে অ্যালুমিনিয়ামকে নিষ্কাশন করতে পারে! শেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে বহু সাধ্য সাধনার পর ওয়ের স্টেডর ও হব্‌লার নামে দুজন বিজ্ঞানী অতি সামান্য পরিমাণ অ্যালুমিনিয়াম সংগ্রহ করতে সমর্থ হলেন।

নতুন এই ধাতুটিকে দেখে বিস্মিত হলেন সবাই। কী চমৎকার ওর রঙ, আর কী হালকা! যেন ক্ষুধিতের দৃষ্টি ফুটে উঠলো সবার চোখে। প্রত্যেকেরই ধারণা হলো, অ্যালুমিনিয়ামকে স্বল্প খরচে নিষ্কাশন করতে পারলে সভ্যতার এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন ঘটবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য। শত শত বিজ্ঞানীর সারা জীবনের সাধনা একেবারে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। অর্থাৎ কেউ পারলেন না অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের সহজতম পদ্ধতি আবিষ্কার করতে। সন্তুষ্ট থাকতে হলো পূর্বের আবিষ্কারকদের আবিষ্কারকে নিয়ে—যাতে খরচ পড়তো সোনা এবং প্লাটিনাম অপেক্ষাও বেশী। আর ঐ কারণে ওর কৌলিন্যও সেকালে ছিল যথেষ্ট। কথিত আছে, একমাত্র রাজারাজড়াই অ্যালুমিনিয়াম ব্যবহার করতেন। যেমন ফ্রান্সের সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের ভোজসভায় অতিথিরা ব্যবহার করতেন সোনার কাঁটা চামচ আর তিনি নিজে ব্যবহার করতেন অ্যালুমিনিয়ামের।

এমনও শোনা যায়, প্রখ্যাত দিগ্বিজয়ী বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট নতুন এই ধাতুটির প্রতি অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। বহু বিজ্ঞানীকে নিয়োগ করেছিলেন ধাতুটিকে সহজ উপায়ে নিষ্কাশন করতে। মজবুত ও

হালকা এই ধাতুটি দিয়ে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম বানাবার ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু সে ইচ্ছে তাঁর অপূর্ণই থেকে গেছে।

বিজ্ঞানীরাও বুঝতে পেরেছিলেন ধাতুটির সম্ভাবনা প্রচুর। তাঁরা আরও আবিষ্কার করেছিলেন পৃথিবীর এখানে ওখানে ছড়িয়ে রয়েছে কত হরেক রকমের অ্যালুমিনিয়ামের আকরিক। এর প্রধান আকরিক বক্সাইট পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই সুলভ। চুনি, পান্না, মরকতমণি, নীলকান্তমণি, বৈদূর্যমণি, গোমেদ প্রভৃতি মূল্যবান রত্ন পাথরও অ্যালুমিনিয়ামের এক একটি আকরিক ছাড়া অন্য কিছু নয়।

এবার শোন, কেন বিজ্ঞানীরা ব্যর্থ হয়েছিলেন অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করতে।

বিজ্ঞানীরা ধাতু নিষ্কাশনের কতকগুলো পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। যেমন, কোক কয়লার পরিবেশে পোড়ানো, বিদ্যুৎ দ্বারা বিশ্লেষণ, ইত্যাদি। অ্যালুমিনিয়ামকে আবার অক্সাইডের আকারে পাওয়া যায়। অথচ অক্সাইড আকরিক তথা অ্যালুমিনাকে কয়লার সাহায্যে বিজারিত করলেই অ্যালুমিনিয়াম পাওয়ার কথা। কিন্তু এটি হালকা ধাতু বলে কয়লার সঙ্গে পোড়ালে অ্যালুমিনিয়াম বাষ্পকে পাওয়া যায়। সেই বাষ্পকে ঠাণ্ডা করলে মূল ধাতুর বদলে ফেরৎ পাওয়া যায় ঐ অ্যালুমিনাকেই।

ধাতু নিষ্কাশনের আর এক হাতিয়ার হলো বিশুদ্ধ আকরিককে বিগলিত অবস্থায় অথবা ঘন দ্রবণকে বিদ্যুৎ দ্বারা বিশ্লিষ্ট করা। কিন্তু এ হাতিয়ারও ব্যর্থ হয়েছিল। বিদ্যুৎ দিয়ে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা অ্যালুমিনিয়ামের পরিবর্তে অন্য পদার্থকে পেয়েছিলেন।

উপরোক্ত অসুবিধাগুলির জন্যই বিজ্ঞানীরা বাধ্য হয়ে একরকম হাত গুটিয়ে বসেছিলেন। কিন্তু ওর বিরাট সম্ভাবনার কথা কেউ বিস্মৃত হতে পারেন নি। তাই একদিন আমেরিকার ও বার্লিন কলেজে ধাতুবিদ্যা পড়াবার সময় একজন অধ্যাপক ছাত্রদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন—আমাদের দুর্ভাগ্য যে, অ্যালুমিনিয়ামকে সস্তায় নিষ্কাশন করা এখনও সম্ভব হলোনা। যদি স্বল্প খরচে প্রচুর পরিমাণে উৎপাদন করা যেতো, তাহলে মানব সভ্যতার রূপটাই পরিবর্তিত হয়ে যেতো।

অধ্যাপকটি পুনরায় বলেছিলেন-তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অল্প খরচে পর্যাপ্ত অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশনের পদ্ধতি আবিষ্কার করতে পারো, তাহলে একদিকে যেমন প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারবে অপরদিকে তেমনই বিশ্বজোড়া সুনামও অর্জন করতে পারবে।

ছাত্রদের ভেতরে ছিলেন কুড়ি বাইশ বছরের এক তরুণ। নাম তাঁর চার্লস মার্টিন হল। অধ্যাপকের উপদেশ তাঁর মনের মধ্যে দারুণ এক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করলো এবং সেইদিন থেকেই শুরু করে দিলেন গবেষণা।

কতদিন কেটে গেল। বুঝিবা তাঁকেও শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয়! কিন্তু অসীম তাঁর ধৈর্য, উৎসাহও তাঁর অদম্য। বিগলিত অ্যালুমিনা বা

তার ঘন দ্রবণকে তড়িৎ দিয়ে বিশ্লেষণ করলে অ্যালুমিনিয়াম পাওয়া যায় না বলে দ্রবণের সঙ্গে নানা ধরণের পদার্থ মিশিয়ে বিদ্যুৎ চালাতে শুরু করলেন।

গবেষণা করতে করতে একদিন সবিস্ময়ে দেখলেন মার্টিন হল, ঋণাত্মক তড়িৎদ্বারে থরে থরে জমে উঠেছে ধবধবে সাদা এক ধরণের ধাতু। নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস হলো না তাঁর। এতদিন ধরে এত বিজ্ঞানীর প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়ে শেষে তাঁরই হাতে কী ধরা দিল অ্যালুমিনিয়াম!

ধাতুটিকে বেশ কয়েকবার পরীক্ষা করলেন। হ্যাঁ, অ্যালুমিনিয়ামই বটে। কিন্তু কী মিশিয়েছিলেন তিনি?

শুরু হলো চিন্তাভাবনা। শেষে মনে পড়লো, বিশুদ্ধ অ্যালুমিনার সঙ্গে ক্রায়োলাইট ও ফ্লোরমপার নামক অন্য দুটি অ্যালুমিনিয়ামের আকরিককে মিশিয়ে ছিলেন। এবার বুঝতে পারলেন, অ্যালুমিনা সরাসরি বিদ্যুৎদ্বারা বিশ্লিষ্ট হয় না। ক্রায়োলাইটকে মেশালে আগে ঐটিই বিয়োজিত হয়ে অ্যালুমিনিয়াম উৎপন্ন করে। তারপর ক্রায়োলাইটের মধ্যে অ্যালুমিনিয়ামের পরিমাণ যত কমতে থাকে ততই সে অ্যালুমিনা থেকে অ্যালুমিনিয়ামকে অঙ্গীভূত করে নেয় এবং পুনরায় ক্রায়োলাইটে রূপান্তরিত হয়ে বিদ্যুৎ দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়। অর্থাৎ অ্যালুমিনা সোজাসুজি বিয়োজিত না হয়ে ক্রায়োলাইটের মাধ্যমে বিয়োজিত হয়।

বিজ্ঞানীদের দীর্ঘকালের সাধনা এইভাবে চার্লস মার্টিন হলের হাতে সফল হয়েছিল। সেই অধ্যাপকের কথা মিথ্যে হয়নি। মার্টিন হল অ্যালুমিনিয়াম নিষ্কাশন করে প্রচুর অর্থ-উপার্জন করেছিলেন এবং তাঁর এই অসামান্য অবদানের জন্য লাভ করেছিলেন নোবেল পুরস্কার। যদিও একই সময়ে হেঁরো নামে জনৈক ফরাসী বিজ্ঞানী সেই একই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিলেন। কিন্তু তাঁর আবিষ্কার পরে প্রচারিত হয়েছিল বলে নোবেল পুরস্কার লাভ করতে পারেন নি। তবে অর্থ প্রচুর উপার্জন করেছিলেন।

✪ পাইরোসেরাম ✪

একদিন বিজ্ঞানী ষ্টুকে কাচ তৈরির উপাদানগুলিকে একসঙ্গে মিশিয়ে জ্বলন্ত এক উনানে পোড়াচ্ছিলেন। হাতের কাছে ছিল গবেষণার হরেকরকমের সরঞ্জাম। একসময় কাজ করতে করতে এমনভাবে ডুবে গেলেন যে উনানের কথা বেমালুমভাবে ভুলেই গেলেন।

ধীরে ধীরে রাত বেড়ে উঠলো। এক পরিচারক এসে জানালেন—স্যার, আজকের রাতে আপনার বন্ধুর বাড়িতে যাওয়ার কথা আছে। দেরী না করে একটু চটপট তৈরি হয়ে নিন।

পরিচারকটির কথায় ষ্টুকে যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। সত্যিই তো, তাঁর

একান্ত অন্তরঙ্গ এক বন্ধুর বাড়িতে আজ নিমন্ত্রণ! বন্ধু ও বন্ধুপত্নী উভয়ে এসে অনেক পীড়াপীড়ি করে গেছেন। না গেলে খুবই ব্যথা পাবেন তাঁরা।

ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন, রাত অনেক। আর এক মুহূর্ত দেরী করা উচিত নয় ভেবে টুকে তাড়াতাড়ি পোশাকটা পাল্টে এবং গবেষণাগারটি বন্ধ করে হন্ হন্ করে বেরিয়ে গেলেন বন্ধুর বাড়ির দিকে। একবারও উনানের কথা মনে হল না তাঁর।

বন্ধুর বাড়িতে গল্প গুজব চললো অনেক রাত অবধি। বন্ধু ও বন্ধুপত্নী দুজনেই খুব খাতির করে খাওয়ালেন টুকেকে। বাড়ি ফিরতে রাত বারটা বেজে গেল। এমন ভুরিভোজের পর এবং এত রাতে গবেষণাগারে প্রবেশ করতে আর প্রবৃত্তি হল না টুকের। সটান শুয়ে পড়লেন বিছানায়।

সকালে ঘুম ভাঙতেই টুকের মনে পড়লো সেই উনানের কথা। তিলমাত্র বিলম্ব না করে ঢুকে পড়লেন গবেষণাগারে। দেখলেন, উনানটা কখন নিভে গেছে। আর যে জিনিসগুলো তিনি উনানে চাপিয়েছিলেন সেগুলো জমাট বেঁধে এক স্বচ্ছ ও কঠিন পিণ্ডের আকারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। সামান্য একটু ভুলের জন্য এতগুলো জিনিস নষ্ট হয়ে যাওয়ায় খুব আফ্‌সোস্ করলেন টুকে। কিন্তু কি আর করবেন তিনি! সেই পিণ্ডটাকেই হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে শুরু করলেন।

তন্ময় হয়ে দেখতে দেখতে এক সময় পিণ্ডটা হাত ফস্‌কে পড়ে গেল মাটিতে। কিন্তু পিণ্ডটা ভেঙ্গে গেল না। যেহেতু ওটাকে কাচ বলেই ধারণা হয়েছিল টুকের। তাই ভেঙ্গে না যাওয়ার জন্য একটু বিস্ময়বোধ করলেন টুকে।

এবার মাটি থেকে তুলে নিয়ে সেই মেঝের উপরেই সজোরে দিলেন এক আছাড়। আরও আশ্চর্য হলেন—যখন দেখলেন পিণ্ডটা না ভেঙ্গে একরকম বলের মতই লাফিয়ে উঠলো।

টেবিলের উপর একটা হাতুড়ি ছিল। টুকে এবার সেই হাতুড়ি দিয়েই পিণ্ডের উপর লাগালেন দমাদম ঘা। না কিছুতেই সেই পিণ্ড থেকে একটা টুকরাকেও খসাতে পারলেন না!

এতক্ষণে টুকের মাথায় একটা নতুন চিন্তা এলো। ভাবলেন, ওটি কেমন জিনিসে পরিণত হয়েছে। লোহার মত শক্ত, অ্যালুমিনিয়ামের মত হালকা, অথচ কাচের মত স্বচ্ছ! এমন একটা অদ্ভুত জিনিসের কথা কোনদিন তো শোনেন নি তিনি!

এবার ঐ পিণ্ডটাকে নিয়ে শুরু করলেন গবেষণা। নানা ধরণের অ্যাসিড প্রয়োগ করলেন, ক্ষারের সঙ্গে ফোটালেন, প্রচণ্ডভাবে উত্তপ্তও করলেন। না, কিছুতেই পারলেন না গলাতে।

বিজ্ঞানী টুকে বুঝতে পারলেন, আপন অজান্তেই—তিনি একটা নতুন জিনিস তৈরি করে ফেলেছেন। এটির নামকরণ করলেন পাইরোসেরাম। আমেরিকার মহাকাশ সংস্থা এই অদ্ভুত জিনিসটির পরিচয় পেয়ে একরকম লুফে নিয়েছিল।

এবং এও সত্য যে, পাইরোসেরাম আবিষ্কৃত না হলে মহাকাশে পাড়ি দেওয়া এত দ্রুত সম্ভব হতো না।

✪ স্যাকারিন ✪

অনেকদিন আগেকার কথা। বিজ্ঞানীরা খেয়ালের বশে আলকাতরাকে পাতিত করতে গিয়ে লাভ করেন টুলুইন নামে একটি যৌগিক পদার্থ। আর তখনই নতুন পাওয়া ঐ যৌগটির গুণাগুণ আবিষ্কারের জন্য চারিদিকে যেন হৈ চৈ পড়ে যায়। সে সময় ফালবার্গ নামে এক তরুণ রসায়ন বিজ্ঞানী কী নিয়ে গবেষণা করবেন এ বিষয়ে মাথা ঘামাচ্ছিলেন। সহসা টলুইনের কথা শুনে সেই দিকেই আকর্ষণ বোধ করেন এবং তাকে নিয়ে অচিরেই শুরু করেন গবেষণা।

ফালবার্গ যেহেতু বয়সে তরুণ ছিলেন, তাই তাঁর উৎসাহ ছিল অদম্য এবং পরিশ্রমও করতেন প্রচুর। ঠিকমত নাওয়া-খাওয়াও করতেন না। গবেষণা করতে করতে সবকিছু ভুলে যেতেন। থাকতেন একজনের বাড়িতে পেয়িং গেস্ট হিসেবে।

একবার হয়েছে কী! খাওয়ার সময় অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার গৃহকর্ত্রী বিরক্ত হয়ে তার গবেষণাগারে প্রবেশ করে বেশ করে দু-চার কথা শুনিয়ে দিলেন। এবং ভয় দেখালেন যদি ফালবার্গ এখনই খেতে না আসেন তাহলে তাঁর জিনিসপত্রগুলো ভেঙ্গে একেবারে গুঁড়িয়ে দেবেন।

কী আর করেন ফালবার্গ! মনে মনে বিরক্ত হলেও পরের ঘরে প্রতিবাদ জানাতে সাহসী হলেন না! বাধ্য হয়ে উঠতে হল এবং মুখটাকে গোমড়া করে করে খেতে বসতে হল! খাওয়ার আগে হাত ধোয়ার কথাও মনে হল না তাঁর।

হাতের গ্রাস মুখে তুলতে গিয়ে ফালবার্গ দেখলেন, যাই মুখে তুলেন সেই-ই লাগে মিষ্টি। তিনি আবার মিষ্টি আদৌ পছন্দ করতেন না। গৃহকর্ত্রী রান্নায় চিনি ব্যবহার করেছেন মনে করে প্রতিবাদ জানিয়ে মুখভার করলেন।

কিন্তু গৃহকর্ত্রী তো আর রান্নায় মিষ্টি ব্যবহার করেন নি! অতএব প্রতিবাদ সহ্য করবেন কেন? দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—তোমার মুখটাই আজ খারাপ হয়ে আছে। আমি রান্নায় একটুও মিষ্টি ব্যবহার করিনি।

ফালবার্গ বিশ্বাস করলেন না তাঁর কথা। দু'চার গ্রাস মুখে পুরে রাগে গর্‌গর্‌ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন। এবং বসলেন তাঁর সেই গবেষণাগারেই। কিন্তু এত রেগে গিয়েছিলেন যে, পুনরায় গবেষণায় মনঃসংযোগ করতে পারলেন না।

কেটে গেল কতক্ষণ! মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হতে ভাবতে শুরু করলেন গৃহকর্ত্রীর কথা। তিনি যদি মিষ্টি ব্যবহার না করে থাকেন তাহলে এত মিষ্টি এলো কোথা থেকে! তাছাড়া রান্নায় মিষ্টি ব্যবহার করলেও এত

মিষ্টি কেউ কী কখনও দেয় !

ভাবতে ভাবতে কখন নিজের হাতের কড়ে আঙ্গুলটা মুখে ঠেকিয়ে দিয়েছেন মনে নেই। হঠাৎ চমকে উঠলেন তিনি। একী ! হাতের আঙ্গুলে এত মিষ্টি এলো কোথা থেকে !

এতক্ষণে বুঝতে পারলেন, দোষটা গৃহকর্ত্রীর নয়। যত দোষ সব তাঁরই। এবার মনে পড়লো, খেতে বসার আগে হাতটা ধুয়ে মুছে পরিষ্কারও করেন নি। সম্ভবত গবেষণা করতে করতে আপন অজান্তে তিনি এমন একটা জিনিস তৈরি করে ফেলেছেন—যা চিনির চেয়েও শত শত গুণে মিষ্টি।

টেবিলের উপর থরে থরে সাজানো জিনিসপত্রকে নিয়ে পুনরায় শুরু করলেন পরীক্ষা। বিশেষ বেগ পেতে হলো না। অতি অল্পায়াসেই সন্ধান লাভ করলেন সেই অত্যাশ্চর্য পদার্থটির। এবং সেই পদার্থটিই স্যাকারিন।

✪ ব্লটিং পেপার ✪

ইংলণ্ডে বার্কশায়ার নামে একটি জায়গা আছে। সেখানকার কোন এক কাগজ কলের মালিক একদিন এক প্রকাণ্ড ভুল করে বসলেন। কাগজ তৈরির জন্য যে কাঠের মণ্ড প্রস্তুত করা হয় তার সঙ্গে আরও কতকগুলো জিনিস মিশিয়ে তবেই পাঠানো হয় কাগজ কলে। সেদিন ভুল ক্রমে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র না মিশিয়ে সোজাসুজি মণ্ডটাকেই পাঠিয়ে দিলেন।

যথারীতি কাগজ তৈরি হয়ে গেল। কিন্তু কাগজের নমুনা দেখে মালিক মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। এ কী চেহারা হয়েছে কাগজের। উপরটা একেবারে খসখসে, লিখতে গেলে কালি চুঁইয়ে যায়, এমনই আরও কত অসুবিধা ! কতকগুলো মণ্ড অকারণে নষ্ট হয়ে গেল বলে মালিক হায় হায় করতে লাগলেন।

মালিক কিন্তু ভারি বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। কয়েকদিন পরে ঐ কাগজ গুলোকে অন্যভাবে ব্যবহার করা যায় কিনা সে বিষয়ে শুরু করলেন চিন্তা ভাবনা। প্রথমে কাগজের উপরে নিজেই মণ্ড ঘষলেন। ইচ্ছা, একটু স্বাভাবিক হয়ে গেলেই বাজারে ছেড়ে দেবেন।

কিন্তু কিছুতেই কিছু হলনা। যতবারই কলম ঠেকালেন ততবারই দেখতে পেলেন কালি শুষে নিয়ে লেখা বিশ্রী হয়ে যাচ্ছে এবং কাগজটাও ভিজে যাচ্ছে।

মালিক বেচারা কী আর করবেন ! হাত গুটিয়ে বসে অন্য চিন্তা শুরু করলেন। এদিকে হয়েছে কী ! তিনি যে কলমটায় লিখছিলেন তার ডগায় একটু কালি লেগেছিল। যেটি আবার ঠেকে গিয়েছিল কাগজের কিনারায়। ভদ্রলোক দেখলেন, কাগজটা ধীরে ধীরে শুষে নিচ্ছে কলমের কালিটাকে।

চট করে একটা বুদ্ধি এসে গেল মাথায়। ঐ কাগজটাকে লেখার কাজে ব্যবহার না করে কালি শোষণের কাজে ব্যবহার করলে কেমন হয়! এমনিতে লেখার সময় কখনও কখনও কালি পড়ে যায় এবং কাগজকে বিশ্রী করে দেয়। কালি না শুকোলে কাগজের অপর পৃষ্ঠায় লেখাও যায় না। এই শোষক কাগজের একটা টুকরা হাতের কাছে থাকলে নিশ্চয়ই সুবিধা হবে।

মুখে হাসি ফুটে উঠলো ভদ্রলোকের। নতুন কাগজের গুণাগুণ বাজারে ফলাও করে প্রচার করলেন। দেখতে দেখতে চাহিদা বেড়ে গেল। মাড় না দেওয়া কাগজকে তিনগুণ দামে বিক্রি তো করলেনই, অপরদিকে একচেটিয়া ব্যবসাও জুড়ে দিলেন। নাম দিলেন ব্লটিং পেপার।

✪ ইউরিয়া ✪

এককালে মানুষের ধারণা ছিল, জৈব পদার্থ মাত্রেই ঈশ্বর সৃষ্ট। ওদের মানুষ কৃত্রিমভাবে কিছুতেই তৈরী করতে পারে না।

উক্ত মতের একজন বড় সমর্থক ছিলেন বার্জেলাস নামে একজন নাম করা রসায়নবিজ্ঞানী। তিনি পরিষ্কার ভাবে বলে দিয়েছিলেন, মানুষ জৈব পদার্থকে কৃত্রিমভাবে তৈরী করতে কোনদিন পারেনি—পারবেও না। আর যদি কেউ কৃত্রিমভাবে তৈরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাহলে তাঁকে একটি বাতুল ছাড়া কিছু বলা যাবে না।

বার্জেলাসের পাণ্ডিত্যে বিশ্বাসী ছিলেন সবাই। তাছাড়া প্রসিদ্ধ গ্রীক পণ্ডিত ও দার্শনিক অ্যারিষ্টোটলও অনুরূপ মনোভাব প্রকাশ করে গেছেন, তাই কৃত্রিমভাবে জৈব পদার্থ প্রস্তুত করতে একরকম নিরস্ত ছিলেন বিজ্ঞানীরা।

কয়েকজন তরুণ ছাত্র বার্জেলাসের অধীনে গবেষণা করতেন। তাঁদের একজনের নাম ছিল ভোলার। একদিন ভোলার অ্যামোনিয়াম সায়ানেট নামে একটি যৌগিক পদার্থকে নিয়ে পরীক্ষা করছিলেন। কী খেয়াল হল তাঁর! পদার্থটির কিছু অংশ একটা পরীক্ষানলে নিয়ে শুরু করলেন উত্তপ্ত করতে। হঠাৎ নাকে ভেসে এলো ইউরিয়ার গন্ধ।

বিস্মিত হলেন ভোলার। উৎপন্ন পদার্থটিকে নিয়ে বারবার পরীক্ষা করলেন এবং গন্ধও নিলেন। না, ইউরিয়াই বটে। অ্যামোনিয়াম সায়ানেটকে গরম করতে গিয়ে একরকম আকস্মিকভাবেই তৈরি হয়ে গেছে।

মনে পড়লো গুরুদেবের কথা। তিনি তো বারবার বলেন, জৈব পদার্থকে তৈরী করা যায় না। কিন্তু ইউরিয়াতো জৈব পদার্থ! তাহলে!

দেহ মনে অকস্মাৎ যেন একটা প্রবল শিহরন অনুভব করলেন ভোলার এবং পরীক্ষানলটি হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গেলেন গুরু বার্জেলাসের কাছে।

বার্জিলাস তখন গবেষণা করছিলেন। ভোলার উত্তেজিত ভাবে বললেন—আপনার কথা ঠিক নয় স্যার, মানুষ জৈব পদার্থকে অবশ্যই কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করতে পারে।

বার্জিলাস প্রথমটায় একটু বিস্ময় বোধ না করে পারলেন না। তারপর ছেলেমানুষের কথায় কান না দিয়ে নিজের কাজে মন দিলেন।

ভোলার কিন্তু ছাড়বার পাত্র নন। তাঁর উত্তেজনা আরও বেড়ে গেল। বললেন—বিশ্বাস করুন স্যার, এই পরীক্ষানলেই ইউরিয়া আছে। আমি এইমাত্র অ্যামোনিয়াম সায়ানেটকে উত্তপ্ত করে লাভ করেছি।

—পাগল, ইউরিয়া কী কখনও মানুষে তৈরি করতে পারে! অবিশ্বাসের সুর বেজে উঠলো বার্জিলাসের কণ্ঠে।

ভোলার দমলেন না একটুও। বললেন—আমার কথা যদি বিশ্বাস না করেন তাহলে হাতে নাতে পরীক্ষা করেই দেখুন।

হো হো করে হেসে উঠলেন বার্জিলাস। ভোলারের ছেলেমানুষীকে আদৌ আমল দিলেন না।

এত সহজে হার মানার পাত্র ভোলার ছিলেন না। বয়সে তিনি তরুণ, উৎসাহ তাই অদম্য। যা তিনি সত্য বলে জেনেছেন, তা তিনি প্রমাণ করবেনই।

সহসা একটা কাজ করে বসলেন ভোলার। পরীক্ষানলটিকে নিয়ে একেবারে গুরুদেবের নাকের ডগার কাছে চেপে ধরলেন।

—আঃ, করছো কী? বিরক্ত বার্জিলাস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। কিন্তু ততক্ষণে গন্ধটা এসে তাঁর নাকে লেগেছে। এবার সত্য সত্যই চমকে উঠলেন তিনি।

নানা পরীক্ষা নিরীক্ষার পর বার্জিলাস তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে বাধ্য হলেন। পৃথিবী সেই প্রথম জানতে পারলো, যাদের মানুষ ঈশ্বরসৃষ্ট পদার্থ বলে মনে করে তাদেরও কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করা সম্ভব।

বিজ্ঞানীদের ভেতরে উক্ত ঘটনার পর দারুণভাবে সাড়া পড়ে যায়। আর সেই থেকেই শুরু করে কৃত্রিম জৈব পদার্থ সমূহ আত্মপ্রকাশ করতে। আজ সমূহ জৈব পদার্থকেই কৃত্রিমভাবে তৈরী করা হচ্ছে। এমনকি জীবকোষের উপাদানগুলিকেও। বিজ্ঞানের এই যে জয়-যাত্রা এর মূলে আছে ইউরিয়াকে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করার সেই আকস্মিক আবিষ্কারটি।

✪ তেজস্ক্রিয় পদার্থ ও রেডিয়াম ✪

হেনরি বেকারেল নামে একজন মহান বিজ্ঞানী পটাসিয়াম ইউরানিল সালফেট নামক একটি যৌগিক পদার্থকে নিয়ে পরীক্ষা করতেন। একবার একখানা ফটো-

গ্রাফিক প্লেটকে কালো কাগজে জড়িয়ে তুলে রেখেছিলেন দেরাজে। আবার ভুলক্রমে একটুকরা ইউরেনিয়াম নামক ধাতুকে কাগজে জড়িয়ে রেখে দিয়েছিলেন সেইখানেই। একটা চাবিও পড়েছিল সেখানে। পরে একদিন কী একটা দরকারে ফটোগ্রাফিক প্লেটটাকে ডেভেলপ করতে গিয়ে দেখেন, প্লেটের উপর ভেসে উঠেছে একটা চাবির ছবি।

বিস্তর খোঁজা খুঁজির পর হদিস পেলেন চাবিটার। তখনই সিদ্ধান্তে এলেন, ইউরেনিয়াম ধাতুটা সর্ব অবস্থায় স্বতঃস্ফুর্তভাবে এক ধরণের রশ্মি বিকিরণ করে। ঐ রশ্মি অনায়াসে ধাতুর পাত ভেদ করে চলে যেতে পারে এবং অন্ধকারেও ফটোগ্রাফিক প্লেটের উপর ক্রিয়া করতে পারে।

ইউরেনিয়াম ধাতুটির এই অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পেলে আরও পরীক্ষা চালালেন বেকারেল। প্রমাণিত করলেন, ঐ রশ্মি যখন কোন গ্যাসীয় অথবা বায়ু মাধ্যমে প্রবাহিত হয় তখন গ্যাস কিংবা বায়ুকে আয়নিত করে দেয়। প্রকৃত-পক্ষে সেই দিনই ক্যাথড রশ্মি এবং 'X' রশ্মির স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়।

বেকারেলের আবিষ্কার বিজ্ঞানী মহলে এক দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বহু জনেই মেতে উঠলেন ইউরেনিয়াম এবং তার যৌগিক গুলিকে নিয়ে। শেষে ধরা পড়ে, ইউরেনিয়ামের আকরিক পিচব্লেণ্ডের তেজস্ক্রিয়তা ইউরেনিয়াম অপেক্ষা অনেক বেশী।

এবার তেজস্ক্রিয়তা সম্বন্ধে একটু বলতে হয়। প্রকৃতিতে এমন কিছু কিছু মৌলিক পদার্থকে পাওয়া যায়—যাদের দেহ থেকে যে কোন অবস্থায় আলো কিংবা অন্ধকারে সব সময় একধরণের রশ্মি নির্গত হয়। ঐ রশ্মি নির্গমন ক্রিয়াকে বলে তেজস্ক্রিয়তা এবং যাদের দেহ থেকে অনুরূপভাবে রশ্মি নির্গত হয় তাদের বলা হয় তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম রেডিয়াম, প্লুটোনিয়াম প্রভৃতি ধাতু এই শ্রেণীতে পড়ে এবং তেজস্ক্রিয়তাকে ইংরাজীতে বলা হয় রেডিও অ্যাকটিভিটি। স্বয়ং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ইংরেজী শব্দটির বাংলা রূপান্তর করেছেন।

বেকারেলের সময় ফ্রান্সে এক গবেষণা পাগল দম্পতি বাস করতেন। নাম তাঁদের পিয়েরে কুরি ও মারি কুরি। বড্ড গরীব ছিলেন তাঁরা। কিন্তু দারিদ্র্যের কাছে কখনও মাথা নত করতেন না। পিচব্লেণ্ডের তেজস্ক্রিয়তার কথা শুনে স্থির করলেন তাঁরাও গবেষণা করবেন। কিন্তু গবেষণাগার কোথায়! যন্ত্রপাতি কোথায়? পিচব্লেণ্ড কেনার পয়সা কোথায়!

না, হার মানলেন না তাঁরা। এক বন্ধুকে অনুরোধ করায় ইউরেনিয়াম নিষ্কাশন করে নেওয়ার পর কিছু পরিত্যক্ত পিচব্লেণ্ড পাঠিয়ে দিলেন। আর পিয়ের যে স্কুলে শিক্ষকতা করতেন সেই স্কুলেরই পরিত্যক্ত একটা ভাঙ্গা মেসিন ঘরকে গবেষণাগার বানালেন। স্কুল কর্তৃপক্ষের এই বদান্যতায় তাঁরা হাতে স্বর্গ পেলেন যেন।

উভয়ে এবার মহা উৎসাহে গবেষণায় লেগে গেলেন। ঘরটার অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, প্রচণ্ড ধোঁয়া এবং বিদঘুটে গন্ধ কোন কিছুই তাঁদের মনোবলকে নষ্ট

করতে পারলো না। রাত দিন পড়ে রইলেন সেই গবেষণাগারের মধ্যে।

শেষে জয় হলো তাঁদের। প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে করতে একদিন সেই পিচ-ব্লেণ্ড থেকেই সংগ্রহ করলেন আর একটি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ। মারি কুরির জন্মস্থান পোল্যাণ্ডের নামানুসারে পদার্থটির তাঁরা নামকরণ করলেন পোলোনিয়াম। এর তেজস্ক্রিয়তা দেখা গেল ইউরেনিয়াম অপেক্ষা প্রায় তিনশ গুণ বেশী।

কুরি দম্পতির আবিষ্কার এইখানে সীমাবদ্ধ রইল না। একদিন তাঁরা লক্ষ্য করলেন পোলোনিয়াম পৃথক করে নেওয়ার পর যে তরল অবশেষটি পড়ে থাকে তাতেও থাকে তেজস্ক্রিয়তার গুণ। ভাবলেন, ওতেও হয়ত কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থ থাকতে পারে। তাই সেই তরলকে নিয়েই পুনরায় শুরু করলেন গবেষণা এবং দীর্ঘ দেড় বছর পরে আবিষ্কার করলেন রেডিয়াম নামে আর একটি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ।

একাধিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কারের মাধ্যমে কুরি দম্পতির হাতেই প্রকৃত-পক্ষে সূচনা হয়েছে পারমাণবিক যুগের।

✪ নীল রঙ ✪

বাংলায় নীলকরদের অত্যাচারের কথা কে না জানে? সেদিন অসাধু ও দুর্নীতি পরায়ণ নীলকরদের অত্যাচারে সোনার বাংলা শ্মশান হতে বসেছিল। কত আন্দোলন এবং কত বিদ্রোহ যে হয়েছিল তার ঠিক ঠিকানা নেই। তবু নীলকর সাহেবরা এতটুকু দমেনি। সমানে চালিয়ে গিয়েছিল ব্যবসা। তথাপি একদিন তারা ব্যবসা বন্ধ করেছিল। কিন্তু কেন? সে কী বাংলায় কৃষক জাগরণের ফলে?

না, ঠিক সেজন্য নয়। প্রধান কারণটা হলো, একদিন একরকম আকস্মিক ভাবে এক তরুণ রসায়ন বিজ্ঞানী কৃত্রিমভাবে নীলরঙ প্রস্তুতির পদ্ধতি আবিষ্কার করায় আর প্রয়োজন হলোনা নীলচাষের। যখন নীল গাছ থেকে প্রস্তুত নীল অপেক্ষা কৃত্রিম নীল উৎকৃষ্ট হলো এবং দামেও সস্তা হলো তখনই নীলকররা বুঝতে পারলো, ব্যবসা আর জমবে না। তাই রাতারাতি তল্পিতল্পা বেঁধে বাংলা ছেড়ে পালিয়েছিল।

এই নীল রঙ আবিষ্কারের কাহিনীটি কিন্তু ভারী মজার। উইলিয়ম হেনরি পার্কিন নামে ছিলেন এক রসায়ন বিজ্ঞানী। রাতদিন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতেন গবেষণাগারে। সময়মত নাওয়া খাওয়া নেই, ঘরের কাজকর্ম দেখাশুনা নেই, শুধু গবেষণা আর গবেষণা!

পার্কিনের গবেষণার বিষয়বস্তু ছিল কুইনিন। সে সময় কুইনিন তৈরি হতো সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে। যেহেতু সিঙ্কোনা গাছ সব জায়গায় জন্মায় না

তাই অধিকাংশ দেশ কুইনিনের চাহিদা মেটাতে পারতো না। ঐ কারণে সেদিন বহু রসায়ন বিজ্ঞানী কৃত্রিমভাবে কুইনিনকে তৈরী করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। হেনরি পার্কিনও ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন।

পার্কিন লোকটি ছিলেন বেজায় সাদাসিধে। কিন্তু তাঁর স্ত্রী! একেবারে উল্টো। যেমন বদমেজাজী তেমনি খিট্‌খিটে। ঘরের কোনে রাতদিন বসে কাকে তিনি আদৌ বরদাস্ত করতেন না। সংসারের খুঁটিনাটি কাজকর্মটাকে বড় করে দেখতেন। যাকে বলে, একেবারে পাকা গৃহিণী।

পার্কিনের তাই ঘরে বসে থাকার জন্য মাঝে মাঝে গৃহিণী বেজায় বকাঝকা করতেন। কিন্তু প্যার্কিনের কানে ঢুকতো না তাঁর কথা। চুপচাপ বসে থাকতেন, একটাও উত্তর দিতেন না, কিংবা গবেষণা করতে করতে এমন বাহ্য-জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়তেন যে গৃহিণীর উপস্থিতিও টের পেতেন না যেন। ভদ্র-মহিলা কী আর করেন! বেশ একচোট বকাঝকার পর দুম দাম করে পা ফেলে একসময় ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেন।

একদিন হয়েছে কী! ভদ্রমহিলা কোন একটি কারণে রেগে একেবারে আগুন হয়ে উঠলেন। রণরঙ্গিনী মূর্তিতে হাজির হলেন পার্কিনের সামনে। চিৎকার, চেঁচামেচি ও বকাঝকাতে যখন পার্কিন কিছুতেই মুখ তুললেন না তখন ভদ্র-মহিলার যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটে গেল। পার্কিনের গবেষণাকে একেবারে বন্ধ করে দেওয়ার জন্য টেবিলের উপর যত শিশি বোতল ছিল সবগুলিকে টেনে এনে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মাটিতে। শিশি বোতল ভাঙ্গার ঝন ঝন শব্দ এবং তার চেয়েও বিকট ভাঙ্গা কাঁসরের মত ভদ্রমহিলার গলার আওয়াজ কানে যেতে পার্কিনের যেন চৈতন্য হলো। তিনি হাঁ হাঁ করে উঠে পড়লেন চেয়ার থেকে।

কিন্তু যা হবার তো হয়ে গেছে ততক্ষণে। গৃহিণী শিশি বোতল ভেঙ্গে মনের আশ মিটিয়ে দুমদাম করে পা ফেলতে ফেলতে এবং গালিগালাজ করতে করতে চলে গেলেন। আর পার্কিন! মাথায় হাত দিয়ে মেঝেতে বসে হায় হায় করতে লাগলেন।

হঠাৎ তাঁর চোখে পড়লো, মেঝেতে এক জায়গায় চমৎকার নীল রঙের ছড়াছড়ি। এত নীল! অবাক হলেন পার্কিন।

মুহূর্তে ভুলে গেলেন সব কিছুই। ভাল করে দেখলেন সেই নীল রঙকে। সেখানকার ভাঙ্গা বোতলগুলোকে পরীক্ষা করলেন এবং সেই বোতলগুলোর মধ্যে কোন্ কোন্ রাসায়নিক পদার্থ ছিল তাদেরও সনাক্ত করলেন। অবশেষে শূন্য টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে হা-হুতাশ না করে আরম্ভ করলেন গবেষণা।

এবারের গবেষণা কুইনিন তৈরির জন্য নয়, সেই রঙটার জন্যই। খুব বেশী বেগ পেতে হলো না তাঁকে। অল্পায়াসেই আবিষ্কার করে ফেললেন "অ্যানিলিন মভ" নামে পাকা নীল রঙ। মনের দুঃখ ভেসে গেল আনন্দের বন্যায়, অভিশাপ দেখা দিল আশীর্বাদ রূপে।

পরে কুইনিনকে কৃত্রিমভাবে তৈরি করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু আবিষ্কর্তা পার্কিন নয়। পার্কিন ঐ নীল রঙ আবিষ্কার করেই অমর

হয়ে আছেন এবং এই আবিষ্কারের মূলে আছে একমাত্র তাঁর ক্রুদ্ধা গৃহিণীর অবদান।

✪ রবারের আঠালোভাব দূরীকরণ ✪

রবার একরকম গাছের আঠা। যখন ওকে গাছ থেকে সংগ্রহ করা হয় তখন তার মধ্যে দেখা যায় ভয়ানক আঠালোভাব। আর ওকে শক্তও করা যায় না কিছুতেই।

বিজ্ঞানীরা বুঝতে পেরেছিলেন, রবার গাছের আঠাকে যদি কোনও প্রকারে শক্ত করা যায় এবং ওর আঠালোভাবকে দূরীকরণ করা যায়, তাহলে মানুষের অনেক প্রয়োজনে আসবে। কিন্তু কেমন করে?

বাহু বিজ্ঞানীই সেদিন ঐ কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত মাত্র একজন বিজ্ঞানীই আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন রবারের আঠালোভাব দূরীকরণ পদ্ধতিটি।

সেই বিজ্ঞানীর নাম চার্লস গুডইয়ার। অপরাপর বিজ্ঞানীদের মত তিনিও দিনের পর দিন রবারের সঙ্গে এটা-ওটা মেশাতেন, কখনও গরম করতেন, কখনওবা বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সহযোগে ফুটাতেন, ইত্যাদি।

একদিন গুডইয়ার সাহেব রবারের সঙ্গে কিছুটা গন্ধক মিশিয়ে একটি পাত্রে রেখেছিলেন। পাত্রটি ছিল একটা জ্বলন্ত উনানের কাছে। কাজ করতে করতে এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ায় হঠাৎ হাত লেগে সেই পাত্রটি গড়িয়ে পড়ে গেল জ্বলন্ত উনানের মধ্যেই।

পাত্রস্থিত তরল উনানে পড়ে যাওয়ায় উনানটা নিভে গেল আর গুডইয়ার সাহেব মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। অনেক কষ্টে তিনি সংগ্রহ করেছিলেন রবারটাকে! অথচ সামান্য একটু ভুলের জন্য সবটা নষ্ট হয়ে গেল!

গুডইয়ার সাহেব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উনানটা পরিষ্কার করতে এগিয়ে গেলেন। যা হবার তা তো হয়েই গেছে। গবেষণাকে তো বন্ধ রাখা যায় না।

কিন্তু একী! উনান ধরাতে গিয়েই বিস্মিত হলেন গুডইয়ার। এতদিন যে কারণে তিনি কৃচ্ছ্রসাধন করে চলেছেন, তা যে আকস্মিকভাবেই তৈরী হয়ে গেছে! উনানের উপর পড়ে আছে শক্ত রবার—তার মধ্যে একটুও আঠালোভাব নেই। আনন্দের আতিশয্যে লাফিয়ে উঠলেন যেন।

যেহেতু রোমানদের আগুনের দেবতার নাম ভালকান। তাই আকস্মিক ভাবে আগুনে পুড়ে ব্যাপারটার সুরাহা হয়েছিল বলে গুডইয়ার সাহেব পদ্ধতিটির নাম রাখলেন ভালকানাইজেসান। আর এই উপায়ে রবারের আঠালোভাব, দূরীভূত করায় এবং শক্ত হওয়ায় বিজ্ঞানীদের স্বপ্নও সার্থক হলো। বহু কাজে রবারকে ব্যবহার করতে পারলো মানুষ।

বর্তমানে রবারকেও কৃত্রিমভাবে তৈরী করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং রবারের বদলে অন্যান্য পদার্থকেও ব্যবহার করা হচ্ছে।

✪ কৃত্রিম পেট্রোলিয়াম ✪

ইওরোপে তখন প্রথম বিশ্বমহাসমরের আগুন জ্বলে উঠেছে। মহাসমরের উদ্যোক্তা জার্মানীর শক্তির বহর দেখে সারা পৃথিবী স্তম্ভিত। কোথায় পেলো জার্মানী এত শক্তি, আর কোথা থেকেই বা জোগাড় করলো এত খনিজ তেল ও গোলাবারুদ ?

পেট্রোলিয়ামের উৎস ভূগর্ভস্থ খনি। খনি থেকে উত্তোলিত তেল থেকে আংশিক পাতনের দ্বারা পেট্রোলিয়াম সংগ্রহ করতে হয়। গাড়ি, মোটর, কলকারখানা প্রভৃতিকে সচল রাখতে খনিজ তেল একেবারে অপরিহার্য। জার্মানীতে আবার পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায় না। মিত্র শক্তি ভাবলো, তেল না হলে কিছুতেই যুদ্ধ চালানো সম্ভব নয়। তাই পাশাপাশি সমস্ত রাষ্ট্রগুলির কাছে কড়া নির্দেশ পাঠালো, তারা যেন জার্মানীকে একফোঁটাও তেল সরবরাহ না করে। ভাবখানা এই তেলের অভাবে একদিন জার্মানীকে আত্মসমর্পণ করতেই হবে এবং হাতে না মেরে ভাতে মারা যাবে।

কিন্তু হায়রে হায়! দীর্ঘকাল যুদ্ধ চলার পরও জার্মানী এতটুকু দমলো না। সমানে খরচ করে চললো তেল, গোলাবারুদ ইত্যাদি। তখন কী আর করে মিত্রশক্তি! সর্বশক্তি নিয়োগ করে অনেক কষ্টে জার্মানীকে বশে আনলো।

যুদ্ধ শেষ হয়ে গেল। কিন্তু একটি প্রশ্ন থেকে গেল সবার মনে। জার্মানী কোথায় পেয়েছিল এত তেল এবং বিস্ফোরকের জন্য নাইট্রিক অ্যাসিড ? তারা কী আগে থেকে সংগ্রহ করে রেখে দিয়েছিল ?

অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন সবাই। অচিরে জানতে পারলেন, তেল সরবরাহ যে একদিন মিত্রশক্তি বন্ধ করে দেবে—এ সহজ বুদ্ধিটা জার্মানীর ছিল। তাই আগে থেকে তারা অ্যামোনিয়া ও পেট্রোলিয়ামকে কৃত্রিমভাবে তৈরী করার পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেছিল।

কেমন করে তারা তৈরী করেছিল! কয়লার উপর উচ্চতাপে এবং অনুঘটকের সংস্পর্শে হাইড্রোজেন চালনা করে পেয়েছিল পেট্রোলিয়ামকে। অপরপক্ষে অ্যামোনিয়াকে লাভ করেছিল জলীয় বাষ্প থেকে ও বাতাস থেকে যথাক্রমে এক আয়তন ও তিন আয়তন নাইট্রোজেন সংগ্রহ করে নেওয়ার পর দুশ বায়ুমণ্ডল চাপে ৫৫০° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় লোহ অনুঘটকের সংস্পর্শে চালিত করে। (অনুঘটক হচ্ছে এমন পদার্থ—যা নিজে রাসায়নিক ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে না, অথচ ক্রিয়াকে ত্বরান্বিত অথবা মন্দীভূত করে।)

যদিও যুদ্ধের জন্য জার্মানী উপরোক্ত দুটি পদ্ধতিকে আবিষ্কার করেছিল, তবুও এর ফল হয়েছে সুদূরপ্রসারী। যে কোন দেশ তেলের চাহিদা কৃত্রিমভাবে

প্রস্তুতির মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলতে পারে। আর অ্যামোনিয়া? বিস্ফোরকের জন্য সেদিন ওর আবিষ্কার হলেও ফল হয়েছে সুদূর প্রসারী। আজকের এত অ্যামোনিয়ার চাহিদা যে, কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করার উপায় আবিষ্কৃত না হলে মানুষকে প্রচণ্ড অসুবিধায় পড়তে হতো। বিশেষ করে কৃষিক্ষেত্রে সবুজ বিপ্লব তাহলে আসতো না।

✪ নিষ্ক্রিয় গ্যাস ✪

বাতাসে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের অস্তিত্ব ধরা পড়ার পর বিজ্ঞানী ক্যাভেণ্ডিসের একদিন মনে হলো, সব জায়গার বায়ুতে নাইট্রোজেনের পরিমাণটা সমান কিনা—একবার পরীক্ষা করে দেখতেই হবে।

বেশ কিছুদিন ধরে পরীক্ষা চালালেন ক্যাভেণ্ডিস। একবার কস্টিক সোডা দ্রবণের উপর অতিরিক্ত অক্সিজেনযুক্ত বায়ুকে পুনঃপুনঃ বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ প্রয়োগ এবং বাড়তি অক্সিজেনকে পটাসিয়াম সালফাইড দিয়ে শোষণ করিয়েও কিছু অবশেষ লাভ করলেন। পরিমাণটা মূল বায়ুর ১২০ ভাগের একভাগ মাত্র ছিল। পরীক্ষা করে দেখলেন, গ্যাসটি নাইট্রোজেন অপেক্ষাও নিষ্ক্রিয়। কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও গ্যাসটিকে সনাক্ত করতে তিনি পারলেন না (১৭৮৫ খ্রীঃ]।

ক্যাভেণ্ডিসের পর অতিক্রান্ত হয় প্রায় একশ বছর। বিজ্ঞানী র‍্যালে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে গ্যাসীয় পদার্থগুলোর ঘনত্ব নির্ণয় করতে গিয়ে বাতাস থেকে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন এবং রসায়নাগারে উৎপন্ন নাইট্রোজেন-উভয়ের ঘনত্বের সঙ্গে মিল আছে কিনা জানার জন্য কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। শেষে দেখলেন, একলিটার বায়ুর নাইট্রোজেনের প্রমাণ অবস্থায় ওজন ১·২৫৭২ গ্রাম এবং রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত নাইট্রোজেনের ওজন ১·২৫০৬ গ্রাম।

র‍্যালে উপরোক্ত ঘটনাকে পরীক্ষাগত ত্রুটি বলে ভাবতে পারলেন না। তাঁর যেন ধারণা হলো, বাতাসে পরিচিত গ্যাসগুলো ছাড়াও অন্য কোন অজানা গ্যাস আছে।

র‍্যালে অতঃপর তাঁর পরীক্ষার কথা জানালেন অপর একজন রসায়ন বিজ্ঞানী র‍্যামজেকে। র‍্যালে এবং র‍্যামজে দুজনেই এবার একযোগে শুরু করলেন পরীক্ষা। একদিন দুজনেই পৃথক পৃথকভাবে গ্যাসটিকে বায়ু থেকে আলাদা করতে সমর্থ হলেন। র‍্যামজেই উক্ত গ্যাসটির নামকরণ করেন "আর্গন" বা অলস।

হিলিয়াম আবিষ্কারের কাহিনী বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। আর্গন আবিষ্কারের বহু পূর্বে ১৮৬৮ সালে জানসেন নামে এক বিজ্ঞানী পূর্ণ সূর্যগ্রহণের সময় বর্ণালী পরীক্ষা করতে গিয়ে এক ধরণের হালকা হলদে রেখা দেখতে পান। ঐ

বর্ণালীকে পরীক্ষা করার পর ফ্রাঙ্কল্যাণ্ড এবং লকিয়ার নামে দুজন বিজ্ঞানী সিদ্ধান্তে আসেন, এটি এমন একটি গ্যাসের বর্ণালী—যা গ্যাসীয় সৌর আবরণেই থাকে। পৃথিবীতে এর কোন অস্তিত্ব নেই। গ্রীক হেলিওস অর্থে সূর্য। তাই ওর নামকরণ করা হয়েছিল হিলিয়াম।

পৃথিবীতে ইউরেনিয়াম খনিজে অন্তর্ধৃত অবস্থায় উক্ত গ্যাসটির অস্তিত্বের কথা প্রথম ঘোষণা করেছিলেন বিজ্ঞানী হিলডেব্র্যাণ্ড এবং ক্লিভাইট। পরে ১৮৯৫ সালে বিজ্ঞানী কাইজার বায়ুতে ওর অস্তিত্ব প্রমাণ করেন।

বায়ুতে আর্গন ও হিলিয়ামের অস্তিত্ব ধরা পড়ার পর বিজ্ঞানীরা আরও উৎসাহিত হলেন। ভাবলেন, আরও হয়ত বায়ুতে কোন কোন গ্যাস লুকিয়ে আছে—যার সন্ধান এখনও কেউ দিতে পারেননি। যদি থাকে তাহলে কেমন করে ওদের সনাক্ত করা যাবে?

অনেক ভেবে বিজ্ঞানীরা এবার তরল বায়ুকে নিয়ে শুরু করলেন গবেষণা। শেষে জয়যুক্ত হলেন সেই র্যামজে এবং তাঁর সহযোগী ট্রাভার্স। ১৮৯৮ সালে তরল বায়ুকে অংশপাতিত করতে গিয়ে লাভ করলেন নতুন এক নিষ্ক্রিয় গ্যাস। নতুন বলেই সেই গ্যাসটির নামকরণ করেন নিয়ন। তারপর এঁরা দুজনেই আবিষ্কার করেন ক্রিপটন এবং জেননকে। ক্রিপটন অর্থে গুপ্ত এবং জেনন অর্থে আগন্তুক।

শেষ নিষ্ক্রিয় গ্যাসটি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯১৮ সালে তেজস্ক্রিয়তার ফলে ক্ষয়জাত পদার্থ থেকে। বিজ্ঞানী "স্নিড" এর নামকরণ করেছেন র্যাডন।

এই পরিবারের সবাই কোন মৌলিক বা যৌগিক পদার্থের সঙ্গে ক্রিয়া করে না। তাই ওদের বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস। এর কারণ, এদের প্রত্যেকের পরমাণুর বাহিরের খোলটা আটটি ইলেক্ট্রন দ্বারা পূর্ণ থাকে। ঐ বৈশিষ্ট্যের জন্য ওদের "নোবল" গ্যাস বা উত্তম গ্যাসও বলা হয়। অপরদিকে র্যাডন ছাড়া অপরাপর সবগুলিকে বাতাসে অতি অল্প-পরিমাণে পাওয়া যায়। তাই বিরল-গ্যাসও বলে এদের। নিষ্ক্রিয় হওয়ার জন্য এবং বাতাসে বিরলভাবে অবস্থান করার জন্য এদের আবিষ্কার করতে এত বিলম্ব হয়েছে।

✪ প্লাস্টিক সার্জারী ✪

আইভারসন নামে ছিলেন এক ডাক্তার। হাসপাতালে রোগীদের দেহে অস্ত্রোপচার করতেন। হাতটি খুব ভাল হওয়ায় নাম করা এক শল্যচিকিৎসকরূপে পরিচিত হয়েছিলেন এবং দেশ বিদেশের বহু রোগী আসতো তাঁর কাছে অস্ত্রোপচারের জন্য। একবার আইভারসনের কাছে এল এক তরুণী। গুটি বসন্ত হয়েছিল তার। প্রাণে বেঁচে গেলেও মুখের শ্রীটা হারিয়েছিল চিরতরে। অর্থাৎ সারা মুখটা বসন্তের দাগে এমনভাবে ভরে গিয়েছিল যে, দেখলে তাকে ভয়ই করতো মানুষের।

তরুণীটি খুব কাঁদাকাটা করলো ডাক্তারের কাছে। বললো—আপনি ডাক্তার, দয়া করে আমার মুখশ্রীটাকে ফিরিয়ে দিন! আমি যে আর লোক সমাজে মুখ দেখাতে পারছি না!

ডাক্তারের ছিল বড় দয়ার শরীর। মেয়েটির মনের ব্যথা তাঁর মনকেও ক্ষত-বিক্ষত করলো। কিন্তু করবেন কী! এমন উপায় তো জানা নেই তার!

তবু সরাসরি মেয়েটিকে 'না' বলতে পারলেন না ডাক্তার। বললেন "তুমি আজ এসো, কথা দিলাম তোমার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করবোই।"

এতবড় এক ডাক্তারের কথা কী মিথ্যে হতে পারে! চোখ মুছে বেশ খুশি মনেই মেয়েটি বিদায় গ্রহণ করলো। কিন্তু ডাক্তার! মহাচিন্তায় পড়লেন তিনি। কেমন করে মেয়েটির মুখ থেকে বসন্তের দাগকে পরিষ্কার করবেন তিনি!

রাতদিন কেবলই ভাবেন ডাক্তার। কিন্তু কোন কুলকিনারা করতে পারেন না। শুধু সেই তরুণীটির কুৎসিত ও করুণ মুখখানি তাঁর মনকে ক্ষতবিক্ষত করে।

বেশ কয়েকদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। আরও—আরও চিন্তিত হয়ে পড়লেন ডাক্তার। মেয়েটি এলে কী বলে সান্ত্বনা দেবেন তাঁকে!

ডাক্তার এবার যেন দিশেহারা হয়ে পড়লেন। সকালে, সন্ধ্যায়, একা একা পথে পথে ঘুরে বেড়ান আর ভাবেন। একদিন এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি দেখলেন, পথের পাশে এক রেড ইণ্ডিয়ান যুবক আগ্রহী পথচারীদের হাতে উল্কি কাটাচ্ছে। কী ভেবে ডাক্তার যুবকটির উল্কি কাটানো দেখার জন্য দাঁড়িয়ে পড়লেন সেখানে।

একজনের হাতে উল্কি কাটানো শেষ করে যুবকটি ডাক্তারের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলো—উল্কি কাটাবেন স্যার!

মৃদু হাসলেন ডাক্তার। যুবকটি পুনরায় বললো—আমি খুব ভাল উল্কি কাটিয়ে দেবো স্যার! আর যদি পছন্দ না হয়, তাহলে সে উল্কি তুলেও দেবো।

ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন ডাক্তার। বিস্ময়ের সুরে জিজ্ঞাসা করলেন—উল্কিকে তুলে দেওয়া যায় নাকি!

—যায় বৈকি! মৃদু হেসে জবাব দিল যুবকটি।

ডাক্তার কৌতূহলী হয়ে কাছে এগিয়ে এলেন। বললেন—আমার দুহাতে উল্কি কাটিয়ে দাও। কিন্তু একটা হাতের উল্কি তোমাকে তুলে দিতে হবে।

যুবকটি অতি অল্প সময়ের ভেতরে ডাক্তারের দুটো হাতেই উল্কি কাটিয়ে দিল। তারপর একটি হাতের উল্কিকে উঠিয়ে ফেলার পালা। যুবকটি এবার করলো কী! উল্কি তুলতে গিয়ে ডাক্তারের হাতে জোরে পাথর ঘষতে শুরু করলো। ডাক্তার যন্ত্রণায় বিব্রত বোধ করলেন, তবু বাধা দিলেন না বা মুখ-টাকেও একটু বিকৃত করলেন না। পরম আগ্রহভরে শুধু প্রত্যক্ষ করে গেলেন যুবকটির কাজের ধারা।

উল্কির দাগ পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার পর যুবকটি ডাক্তারের হাতে ব্যাণ্ডেজ

বেঁধে দিল। বললো—কয়েকটা দিন পরে খুলে দেখবেন স্যার, উল্কির দাগতো থাকবেই না অধিকন্তু ক্ষতের দাগটাও মিলিয়ে যাবে।

রেড ইণ্ডিয়ান যুবকটির কথা মত কয়েকদিন পরে ব্যাণ্ডেজ খুলতেই ডাক্তার অবাক হয়ে গেলেন। উল্কির দাগ আদৌ নেই এবং ক্ষতস্থানটাও একেবারে পরিষ্কার। কে বলবে, কয়েকটা দিন আগে পাথর ঘষে ঘষে জায়গাটার চামড়া একেবারে তুলে ফেলা হয়েছিল!

এবার যন্ত্রপাতি নিয়ে ডাক্তার গবেষণায় বসে গেলেন। অচিরেই আবিষ্কার করলেন, আমাদের গায়ের ঐ চামড়াটারও কয়েকটা স্তর আছে। যদি কোন ক্ষত চামড়ার দ্বিতীয় স্তর অবধি বিস্তৃত হয় তাহলে তাকে পরিষ্কার করে দিলেই স্বাভাবিকভাবে নতুন চামড়া গজায় এবং চামড়াকে মসৃণ করে দেয়।

ডাক্তার তাঁর এই নতুন অভিজ্ঞতা প্রথম প্রয়োগ করলেন বসন্তের দাগে ভরা সেই তরুণীটির মুখের উপর। রেড ইণ্ডিয়ান যুবকটির মত হাতুড়ে পদ্ধতি অবলম্বন করলেন না। দস্তুরমত মেয়েটিকে অজ্ঞান করিয়ে সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে অস্ত্রোপচার করলেন। তারপর মুখটাকে ব্যাণ্ডেজ করে রাখলেন সেই হাসপাতালে—নিজের তত্ত্বাবধানে।

নির্দিষ্ট দিনে ডাক্তার দুরু দুরু বুকে নিজেই ব্যাণ্ডেজ খুললেন মেয়েটির। এবার যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস করতে পারলেন না ডাক্তার। কোথায় সেই কুৎসিত মুখ, আর কোথায়ই বা সেই কালো কালো বসন্তের দাগ! তার জায়গায় এক চমৎকার লাবণ্যমণ্ডিত মুখ!

মেয়েটি খুশি হয়ে চলে গেল। আর সেই থেকেই পাশ্চাত্যে প্রথম প্লাস্টিক সার্জারীর সূত্রপাত। আজকাল এই পদ্ধতির আবার অবিশ্বাস্যভাবে উন্নতি হয়েছে। উক্ত পদ্ধতির সাহায্যে কেবল পঙ্গু ও বিকলাঙ্গদের দেহসৌষ্ঠবকে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে না, অকেজো চোখ, হৃৎপিণ্ড, কিডনী প্রভৃতিকেও প্রতিস্থাপিত করা হচ্ছে।

✪ বসন্তের টিকা ✪

তখন লণ্ডন শহরে বসন্ত মহামারীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। ডাঃ এডওয়ার্ড জেনার নামে জনৈক দরদী ও মরমী চিকিৎসক চিকিৎসার জন্য ঘুরে বেড়ান কিন্তু প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতা বরণ করেন। বসন্তের প্রতিষেধক জানা না থাকায় মনে মনে হাহুতাশ করেন আর প্রত্যক্ষ করেন প্রতিদিন শত শত মানুষকে বসন্তের শিকার হতে।

ডঃ জেনার সেই অতি ভয়ঙ্কর ও বীভৎস পরিবেশে একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠলেন যেন। রাত দিন শুধু ভাবেন—ভাবেন আর ভাবেন! কেমন করে বসন্তের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করা যায়!

এক গোয়ালিনী প্রতিদিন সকালে জেনারকে দুধ দিয়ে যেত। একদিন হঠাৎ তার হাতের দিকে দৃষ্টি পড়ায় জেনার একটু বিস্মিত হলেন। গোয়ালিনীর হাতের আঙ্গুলে ফোস্কা উঠে শুকে যাওয়ার মত এক ধরণের দাগ। তখনই তাঁর মনে এলো, শহরের এত মানুষের বসন্ত হচ্ছে অথচ এই গোয়ালিনীর বসন্ত হচ্ছেনা কেন? সে কী ঐ দাগটা থাকার জন্য?

তৎক্ষণাৎ আর এক ভদ্রমহিলার কথাও মনে পড়লো তাঁর! সেই ভদ্রমহিলাটির হাতেও দেখেছিলেন অনুরূপ একটি দাগ এবং বহু বসন্ত রোগীর মধ্যে থাকলেও তাঁকে বসন্ত আক্রমণ করতে পারেনি।

জেনার কৌতূহলী হয়ে গোয়ালিনীকে জিজ্ঞাসা করলেন—তোমার হাতের আঙ্গুলে ঐ ফোস্কাপড়ার মত দাগটা কিসের বলতে পারো?

গোয়ালিনী তাচ্ছিল্যের সুরে বললো—ও কিছু না। গোয়ালাদের হাতে এমন দাগ প্রায় সবারই আছে। প্রথমে একটা ফোস্কার মত উঠে, পুঁজ হয়, তারপর শুকে গেলে রেখে যায় এই ধরণের একটি দাগ।

কী ভেবে ডাক্তার জিজ্ঞাসা করলেন—যাদের হাতে ঐ দাগ আছে, তাদের বসন্ত হয়নি?

গোয়ালিনী বললো—না।

ডাক্তার কথায় কথায় আরও জানতে পারলেন, মাঝে মাঝে গাইর বাঁটে বিশেষ একধরণের ঘা হয়ে পুঁজ হয়। দুধ দুইতে গেলে সেখানকার পুঁজ হাতে লেগে যায় এবং কয়েকদিন পরে হাতেও গাইর বাঁটের অনুরূপ ফোস্কা উঠে।

সারাদিন ও সারারাত ধরে ঐ ফোস্কা ওঠার কথাই ভাবলেন জেনার। তাঁর ধারণা হলো, ঐ ফোস্কার সঙ্গে বসন্ত হওয়া বা না হওয়া নির্ভর করছে। পরদিন সকালে গোয়ালিনী পুনরায় এলে ডাঃ জেনার তাকে অনুরোধ করে বললেন—তুমি তোমাদের খাটালে গাইর বাঁটের ফোস্কা ওঠাটা আমাকে একবার দেখাও না!

গোয়ালিনী হেসে বললে—সে কী আর সবসময় উঠে থাকে! তবে যখনই হবে তখনই আপনাকে ডেকে নিয়ে যাবো।

অপেক্ষা করলেন জেনার। একদিন গোয়ালিনী এসে জানালো, খাটালের একটা গাইর বাঁটে সবে ফোস্কা উঠেছে। ইচ্ছা করলে তিনি দেখে আসতে পারেন।

একরাশ আগ্রহ নিয়ে ছুটে গেলেন ডাক্তার। খাটালে গিয়ে দেখলেন, গোয়ালিনীর কথাই ঠিক। বাঁটটা একটু ভালভাবে পরীক্ষা করতে আরও বিস্মিত হলেন ডাক্তার। ঠিক যেন একটা বসন্তের গুটি ঢলঢল করছে। জেনার অনেক ভেবে সেই বাঁট থেকে কিছু পুঁজ সংগ্রহ করে ফিরে এলেন বাসায়।

ডাক্তারের বাসায় টুকিটাকি কাজকর্ম করার জন্য থাকতো এক কিশোর। ছেলেটার স্বভাব খুবই ভাল। ডাক্তার যেমন ওকে পিতার স্নেহ দিয়ে আগলে

রেখেছিলেন তেমনই কিশোরটিও ডাক্তার ছাড়া আর কাউকে জানতো না। ডাক্তারের উপর অগাধ বিশ্বাসও ছিল তার। ডাক্তার যখন ঐ পঁুজকে কোন সুস্থ দেহে প্রবেশ করিয়ে পরীক্ষার কথা চিন্তা করছিলেন তখন ঐ ছেলেটিই স্বেচ্ছায় এগিয়ে এলো। ডাক্তার প্রথমতঃ দ্বিধা করলেও শেষে ঐ কিশোরটির কথায় সম্মত হলেন এবং তার বাহুতে সেই পঁুজের কিছু অংশ প্রয়োগ করলেন।

কয়েকদিন পরে কিশোরটির গায়ে এলো ভয়ানক জ্বর। আর পঁুজ যেখানে প্রবেশ করানো হয়েছিল সেইখানে দেখা দিল বসন্তের গুটির মত একটা গুটি! কিশোরটির অবশ্য কোন ক্ষতি হলো না। কয়েকদিন পরে আপনা হতে জ্বর ছেড়ে গেল এবং গুটিটি শুকিয়ে একটা স্থায়ী দাগ রেখে গেল।

আসল পরীক্ষাটি এখনও বাকি। কিশোরের গায়ে প্রয়োগ করতে হবে তীব্র বসন্তের বীজ। ডাক্তার এবার কিন্তু খুবই ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। অথচ কিশোরটি সাহস হারালো না। সেইই প্ররোচিত করালো ডাক্তারকে এবং সাহসও দিল। আর ডাক্তার সত্য সত্যই একদিন তারই দেহে প্রবেশ করিয়ে দিলেন রোগীর দেহ থেকে সংগ্রহ করা মারাত্মক বসন্তের তীব্র হলাহল।

ডাক্তার দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগলেন এবং পক্ষীমাতার মত আগলে রইলেন কিশোরটিকে। প্রচণ্ড ভয়ে রাতে ঘুমাতেও পারলেন না কয়েকটা দিন।

ধীরে ধীরে রোগ আক্রমণের সম্ভাব্য দিনগুলি অতিক্রান্ত হয়ে গেল। কিন্তু বালকটির বসন্ত হলো না। এতদিনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন ডাক্তার। বুঝতে পারলেন, গো-বসন্তের বীজ সীমিতভাবে সুস্থ দেহে প্রবেশ করালে শরীর বসন্ত রোগের প্রতিষেধক ক্ষমতা লাভ করে।

সেই প্রথম বসন্তের ভয়াবহতা দূরীকরণের জন্য মানুষের হাতে আসে ব্রহ্মাস্ত্ররূপে টিকা দেওয়ার পদ্ধতি। যদিও জেনারের আমলে পদ্ধতিটি আদৌ জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি। পরবর্তীকালে জীবাণুবিশেষজ্ঞদের হাতে পড়ায় চিকিৎসা বিজ্ঞানে নতুন এক সম্ভাবনার দ্বার খুলে গেছে।

✪ অণুবীক্ষণ যন্ত্র ✪

আজ থেকে প্রায় তিনশ' বছরেরও বেশী সময় আগে হল্যাণ্ডের ডেলফট শহরে বাস করতেন এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক। নাম তাঁর লিউয়েনহোয়েক। বড্ড খিটখিটে এবং বদরাগী গোছের হওয়ায় নিতান্ত প্রয়োজন ছাড়া কেউ বড় একটা ভিড়তেন না তাঁর কাছে।

ভদ্রলোকের আবার চশমার দোকান ছিল। কিন্তু এহেন স্বভাবের দোকানদারের কাছে কী খদ্দেরের ভিড় হয়? কালেভদ্রে দু-একজন আসতেন। আর বাকি

সময়টা দোকান একেবারে ফাঁকা থাকতো। লিউয়েনহোয়েক তার জন্য মাথা ঘামাতেন না আদৌ। দোকানে বসে বসে কাচকে ঘষে ঘষে নানা ধরণের লেন্স বানাতেন এবং তামার পাতের তৈরি নলের তলায় লেন্সকে পরিয়ে এটা ওটা পরীক্ষা করতেন। আর এতে মাঝে মাঝে এমন ব্যস্ত হয়ে উঠতেন যে, খদ্দেরদের সঙ্গে কথা বলতে সময়ও পেতেন না। কখনও কখনও বিরক্ত হয়ে খদ্দেরদের তাড়িয়েও দিতেন। তা সত্ত্বেও খদ্দেররা আসতেন ওঁর তৈরি চশমার গুণের জন্যই। অনেকে অবশ্য বুড়ো মানুষের ছেলেখেলা দেখতেও আসতেন, আড়ালে আবডালে বিদ্রূপ করতেন, আর ভাবতেন—ভদ্রলোকের মাথায় স্ক্রুটা একটু ঢিলে আছে।

লিউয়েনহোয়েক বাহিরের লোকের কথায় আদৌ কান দিতেন না। সব সময় মশগুল থাকতেন ঐ তামার পাতের নল ও লেন্সকে নিয়ে। সেই সাধারণ যন্ত্রটার ভেতরের লেন্সকে দূরে ও কাছে সরিয়ে সরিয়ে ছোট ছোট জিনিস-গুলোকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতেন। প্রকৃতপক্ষে লিউয়েনহোয়েকের এই যন্ত্রই আদি অণুবীক্ষণ যন্ত্র। যদিও এর প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে জ্যাকসন নামে এক ভদ্রলোক অনুরূপ যন্ত্র প্রস্তুত করেছিলেন বলে অনেকের বিশ্বাস।

যাই হোক, আপন হাতে তৈরি সেই অণুবীক্ষণযন্ত্র লিউয়েনহোয়েকের পাগলামোকে আরও যেন বাড়িয়ে দিয়েছিল। দোকানের কাজকর্ম একেবারে পরিত্যাগ করে মেতে উঠেছিলেন প্রাণীর চামড়া, লোম, জল প্রভৃতি বস্তুকে নিয়ে। একদিন কী খেয়াল হলো তাঁর! কোত্থেকে সংগ্রহ করে আনলেন কয়েকফোঁটা পচা জলকে। আর ঐ পচা জলের একফোঁটা একটা কাচের ফলকের উপর রেখে যন্ত্র দিয়ে পরীক্ষা করলেন।

এবার কিন্তু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন লিউয়েনহোয়েক। দেখলেন, জলের মধ্যে কিলবিল করছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব। এবার পরিষ্কার জলকে নিয়ে ভালভাবে পরীক্ষা করলেন। দেখতে পেলেন, এখানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবের সংখ্যা নিতান্ত কম।

লিউয়েনহোয়েক এইখানে থেমে গেলেন না। পরিষ্কার স্বচ্ছ জলকে টবে করে কিছুদিন খোলা জায়গায় বসিয়ে রাখার পর তাঁর সেই যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করলেন। এবারে দেখলেন, পূর্বের দূষিত জলের মত প্রচুর জীবের সমাবেশ ঘটেছে। সেদিন তাঁর ধারণা হয়েছিল, জলে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব বাস করে। ওরা এত ক্ষুদ্র যে, খালি চোখে দেখা যায় না। পচা জলে ওরা সংখ্যায় বেশী থাকে এবং এরা আপনা হতেই জন্মায়।

লিউয়েনহোয়েক তাঁর পরীক্ষার ফলাফল একদিন রয়েল সোসাইটিতে লিখে পাঠালেন। সোসাইটির সদস্যরা প্রথমে পাগলের পাগলামি ভেবে হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেদিন বিজ্ঞানীদের সম্পূর্ণ অসম্ভব বলেই মনে হয়েছিল লিউয়েনহোয়েকের কথাগুলো। সবার মনেই প্রশ্ন এসেছিল, একফোঁটা

জলে কী হাজার হাজার জীব বাস করতে পারে? জীব কী এত ক্ষুদ্র হতে পারে—যা চোখে দেখা যায় না? যে যন্ত্রের সাহায্যে দেখা যায়—সে যন্ত্রটাই বা কেমন হতে পারে?

কয়েকজন বিজ্ঞানী অবশ্য স্থির করলেন, পাগল লিউয়েনহোয়েকের পাগলামিটা একবার প্রত্যক্ষ করা যাক। ভদ্রলোক যখন বলেছেন, যন্ত্রের সাহায্যে সবাইকে দেখাবেন তখন সময় করে একদিন তাঁর ওখানে যেতে আপত্তি কোথায়!

সেদিনও লিউয়েনহোয়েক তাঁর যন্ত্রের সাহায্যে জল ও অন্যান্য জিনিসকে পরীক্ষা করছিলেন। ঠিক সেই সময় বিজ্ঞানীরা সদলবলে হাজির হলেন তাঁর দোকানে। বললেন—আমরা সবাই রয়েল সোসাইটি থেকে আসছি। আপনি কী সব অদ্ভুত পরীক্ষার কথা লিখেছিলেন—সেগুলি দয়া করে আমাদের সামনে করে দেখালে খুবই আনন্দিত হবো।

হাসলেন লিউয়েনহোয়েক। তারপর একে একে সমস্ত পরীক্ষাই করলেন বিজ্ঞানীদের সামনে। এবার বিজ্ঞানীদের অবাক হওয়ার পালা। জলে যে এত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব বাস করতে পারে—এ শুধু তাঁদের নয়, পৃথিবীর সব মানুষেরই কল্পনার বাহিরে ছিল। না দেখলে কোনদিনই বিশ্বাস করতে পারতেন না তাঁরা।

বিজ্ঞানীরা চিন্তিত হয়ে ফিরে এলেন রয়েল সোসাইটিতে। সঙ্গে করে আনলেন লিউয়েনহোয়েকের একটি যন্ত্র এবং কিছু দূষিত জল। তাঁরা সবাই মিলে আরও নানাধরণের পরীক্ষা চালালেন। শেষে প্রচার করলেন লিউয়েনহোয়েকের সেই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারের কথা এবং তখনই দেশময় একটা সাড়া পড়ে গেল।

লিউয়েনহোয়েকের সেই চশমার দোকান এবার যেন তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হলো। দলে দলে মানুষ ছুটে এলো দোকানে এবং পরীক্ষাগুলি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। কথিত আছে স্বয়ং রাজা ও রাণী উভয়ে একদিন এসেছিলেন লিউয়েনহোয়েকের দোকানে—জলে বসবাসকারী অত্যাশ্চর্য জীবগুলোকে দেখার জন্য। শোনা যায়, রাশিয়ার জার-ও এসেছিলেন একদিন।

লিউয়েনহোয়েকের পরীক্ষা কিন্তু ঐখানে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তিনি তাঁর যন্ত্রের সাহায্যে ধরতে পেরেছিলেন মানুষের মুখে, দাঁতে এবং খাদ্য নালীতেও অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব বাস করে। আর এও বুঝেছিলেন, সেই জীবাণুদের অনেকে যেমন ক্ষতি করে তেমনই উপকারও করে কেউ কেউ।

লিউয়েনহোয়েক মাঝে মাঝে পাগলামো যে করতেন না এমন নয়। অনেক সময় করতেন কী? নিজের মুখকে জীবাণুশূন্য করতে কখনও কখনও মুখে গরম কফি ঢেলে দিতেন এবং কষ্টও ভোগ করতেন।

সত্য কথা বলতে কী, জীবাণু সম্বন্ধে প্রকৃত গবেষণা প্রথমে ঐ পাগল

লিউয়েনহোয়েকই শুরু করেছিলেন। তবে তাঁর সেই পাগলামি যে বিশ্বের বিজ্ঞানকে এতখানি সমৃদ্ধ করবে—সেদিন কেউ স্বপ্নেও ভাবেননি। কিন্তু আজ! সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন, বিজ্ঞানে লিউয়েনহোয়েকের অবদানের কোন তুলনা নেই।

✪ লুই পাস্তুরের আবিষ্কার ✪

মানুষের দৃষ্টির অন্তরালে একধরণের অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব যে জলে রাজত্ব করে চলেছে—এই সত্য লিউয়েনহোয়েকের দ্বারা উদ্ঘাটিত হলে জীব-বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা প্রবল সাড়া পড়ে যায়। জল ছাড়া অন্য কোথাও ওদের অস্তিত্ব আছে কিনা—জানার জন্য আগ্রহী হয়ে উঠেন অনেকে এবং সেই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের মাধ্যমেই শুরু করেন গবেষণা। এ বিষয়ে যিনি কালজয়ী খ্যাতি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, তিনি ফ্রান্সের প্রখ্যাত বিজ্ঞানী লুই পাস্তুর।

পাস্তুরই সর্বপ্রথম ঘোষণা করেন, জীবাণুরা আপনা হতে জন্মায় না। অর্থাৎ এদেরও পূর্বপুরুষ আছে। অপরদিকে কেবল জল নয়, মাটিতে এবং বাতাসেও এরা ঘুরে বেড়ায়। এক কথায় জলে, স্থলে, আকাশে সর্বত্রই বিচরণ করছে ওরা। মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা প্রভৃতির অধিকাংশ রোগের মূলেও আছে ওদের কারও কারও প্রত্যক্ষ ভূমিকা।

প্রথম থেকে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পাস্তুর জীবাণুদের নিয়েই গবেষণা করে গেছেন। জীবাণুজগৎ সম্বন্ধে এত বেশী তথ্য মনে হয় আর কেউ উদ্ঘাটন করতে পারেননি এবং এটির সূত্রপাত হয়েছিল ফ্রান্সের এক বিশেষ সমস্যাকে কেন্দ্র করে।

কথিত আছে, প্রথম জীবনে পাস্তুর যখন অধ্যাপনা শুরু করেন, সেই সময় ফ্রান্সে গুটিপোকার মড়ক দেখা দেয়। গুটিপোকার চাষের মাধ্যমে রেশম উৎপাদন ছিল তখনকার ফ্রান্সের একটি জাতীয় ব্যবসা। যখনই মড়ক ভয়ানকভাবে আত্মপ্রকাশ করে তখন চাষীরা ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। সরকার থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবাই হলেন চিন্তিত। আর তখনই মড়কের কারণ অনুসন্ধানের ভার পড়ে লুই পাস্তুরের উপর।

লুই পাস্তুরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে একদিন ধরা পড়ে, গুটিপোকার মড়কের মূলে আছে এক ধরণের অদৃশ্য জীবাণু। ঐ জীবাণুদের তিনি সনাক্ত করেন এবং জীবাণুদের ধ্বংস করার উপায়ও উদ্ভাবন করেন।

এর পরবর্তী পর্যায়ে পাস্তুর আবিষ্কার করেন কোন কিছু টকে যাওয়া বা গেঁজে ওঠার মূলে আছে সেই অদৃশ্য জীবাণুদের হাত। তিনি প্রমাণ করেন দুধ টকে দই হয়ে যাওয়া, দইতে ছাতা পড়া, অ্যালকোহল ও মদ প্রভৃতির নষ্ট

হয়ে যাওয়া, ইত্যাদির মূলেও জীবাণুদের উপনিবেশ গঠল।

তৃতীয় পর্যায়ে পাস্তুরের গবেষণাগুলি চিকিৎসাবিজ্ঞানে এক একটি যুগান্তকারী অবদান। তিনিই প্রথম দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেন, জীবিত কিংবা মৃত কোন কোন রোগের জীবাণুদের সীমিতভাবে শরীরে প্রবেশ করালে শরীর সেই সেই রোগের প্রতিষেধক ক্ষমতা লাভ করে এবং ভবিষ্যতে ওর আক্রমণকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করে। [মহামতি এডওয়ার্ড জেনার এই সত্যটি বসন্ত রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। কিন্তু সেই সত্যটিকে তখনও কেউ মেনে নিতে পারছিলেন না।]

পাস্তুরের ঘোষণা শুনে জীববিজ্ঞানীরা সেদিন হেসেছিলেন। রোগ-জীবাণুকে শরীরে প্রবেশ করালে রোগই হবে, রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা লাভ করা কী কখনও সম্ভব! তাই কেউ মেনে নিতে পারেন নি পাস্তুরের কথা। বরং বিদ্রূপই করেছিলেন পাস্তুরকে।

পাস্তুর কিন্তু সহজে হার মানেন নি। তিনি সর্বসমক্ষে একটি পরীক্ষা করে দেখাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। অবিশ্বাসীরা এই প্রস্তাবে সম্মত হলেন। পাস্তুর করলেন কী! পঞ্চাশটা ভেড়া সংগ্রহ করে তাদের পঁচিশটির দেহে মৃদু অ্যানথ্রাক্সের জীবাণু প্রবেশ করালেন, বাকি পঁচিশটিকে তেমনই রাখলেন।

কয়েকদিন পরে পঞ্চাশটির প্রত্যেকের দেহে সমপরিমাণ তীব্র অ্যানথ্রাক্স-রোগজীবাণুদের ইনজেকশনের মাধ্যমে প্রবেশ করালেন। এবার দেখা গেল, যে পঁচিশটিকে পূর্বে টিকা দেওয়া হয়েছিল তাদের কেউ রোগাক্রান্ত হল না। কিন্তু টিকা না দেওয়া ভেড়াগুলির সব কটি উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল।

প্রকৃতপক্ষে ঐ পরীক্ষা করে দেখানোর পর চিকিৎসাজগতে টিকা দানের পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। কেবল মানুষ নয়, টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা হতে গবাদি পশুরা এবং গৃহপালিত পাখীরাও সংক্রামক ব্যাধির কবলমুক্ত হয়।

লুই পাস্তুরের আর একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার জলাতঙ্ক রোগের সিরাম। তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেন, ক্ষ্যাপা কুকুর, নেকড়ে, শেয়াল প্রভৃতি প্রাণীর লালায় একধরণের উগ্ররোগ জীবাণু বাসা বাঁধে। ঐ সব প্রাণী অপর সুস্থ প্রাণীকে কামড়ালে সেই রোগজীবাণুরা সুস্থ দেহে অনুপ্রবেশ করে এবং এর প্রভাবে জলাতঙ্ক রোগ হয়। ঐ রোগ অত্যন্ত মারাত্মক এবং এর কবল থেকে কেউ রক্ষা পায় না।

পাস্তুর ক্ষ্যাপা কুকুরের লালা থেকেই একধরণের সিরাম প্রস্তুত করে-ছিলেন। প্রথম প্রয়োগ করেছিলেন জোসেফ মিস্টার নামে একটি বালকের উপর। বালকটির জলাতঙ্ক রোগ না হওয়ায় সারা পৃথিবী জুড়ে ধন্য ধন্য রব পড়ে গিয়েছিল।

পাস্তুরের আবিষ্কারের সত্যই কোন তুলনা হয় না। তিনি মানুষ, জীবজন্তু ও গাছপালা সবাইকে রোগব্যাধির কবলমুক্ত করানোর উপায় উদ্ভাবন করে

গেছেন। মুরগীদের টিকা দানের পদ্ধতি তাঁরই আবিষ্কার এবং পোকামাকড়ের হাত থেকে গাছপালাকে রক্ষা করতে কীটনাশক প্রয়োগের সিদ্ধান্তও তাঁরই। তাই পৃথিবীর সর্বদেশের সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মানবহিতৈষীদের মধ্যে পাস্তুর অন্যতম। তাঁকে জন্মদান করে পৃথিবী নিজেই কৃতার্থ হয়েছেন।

✪ পেনিসিলিন ✪

এক ছিলেন ডাক্তার। নাম তাঁর আলেকজান্ডার ফ্লেমিং। রোগ জীবাণুদের প্রতিপালন করা এবং ওদের নিয়ে গবেষণা করার বড্ড সখ ছিল ডাক্তারের।

একদিন যে কাচের বাক্সের ভেতরে রোগজীবাণুদের রেখেছিলেন, সেই বাক্সের ঢাকনা খুলতে চোখে পড়লো তাঁর, বাক্সের ভেতরে কেমন করে যেন হঠাৎ গজিয়ে উঠেছে এক ধরণের ছত্রাক। ঐ ছত্রাকের ধারে পাশে রোগজীবাণুরা আদৌ বংশবিস্তার করতে পারেনি, বরং অনেকেই একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে।

কারণ অনুসন্ধানে যত্নবান হলেন ফ্লেমিং। একদিন বুঝতে পারলেন, বাক্সের ঢাকনা খুলে যখন তিনি রোগজীবাণুদের বপন করতেন, তখনই কোন এক অসতর্ক মুহূর্তে বিশেষ একধরণের বিরল ছত্রাকের বীজ বাতাস থেকে উড়ে এসে বাক্সে পড়েছে এবং অনুকূল পরিবেশ লাভ করে বংশবিস্তার করেছে।

ব্যাপারটা অতি সাধারণ হলে কী হবে ফ্লেমিং ঘটনাটিকে আদৌ তুচ্ছ মনে করলেন না। এ সম্বন্ধে তিনি মাথা ঘামাতে শুরু করলেন এবং তাঁর ধারণা হলো, অজ্ঞাত এই ছত্রাকটির নিশ্চয়ই রোগ নিরাময় ক্ষমতা আছে।

ছত্রাকটি নিয়ে এবার শুরু হলো তাঁর গবেষণা। অচিরেই জানতে পারলেন, এটি এক বিরল ধরণের ছত্রাক হলে কী হবে এদের বীজও বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। যখনই এরা বংশবিস্তার শুরু করে তখনই তাদের দেহ থেকে নির্গত হয় ঈষৎ হলুদ রঙের একপ্রকার রস। ঐ রস রোগজীবাণুদের বংশবৃদ্ধিকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত করে দেয়। অনেক ভেবে চিন্তে ফ্লেমিং ছত্রাকটির নামকরণ করলেন পেনিসিলিন নোটেটাম।

এবার ঐ ছত্রাকের রস জীবদেহে কীভাবে প্রতিক্রিয়া করে তা জানার জন্য ফ্লেমিং কয়েকটা খরগোশের দেহে প্রবেশ করালেন। দেখলেন, খরগোশদের দেহে কোন বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হলো না। অতঃপর একদিন কাচের স্লাইডে রাখা রক্তের উপরও প্রয়োগ করলেন। রক্তের সঙ্গেও কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া করলোনা। ফ্লেমিং নিশ্চিন্ত হলেন।

ফ্লেমিং চিকিৎসাবিজ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু রসায়নবিজ্ঞানী ছিলেন না। তাই মানবদেহে প্রবেশোপযোগী ওষুধ হিসেবে পেনিসিলিনকে নিষ্কাশন করতে ব্যর্থ হলেন তিনি। তাই তাঁর গবেষণার কথা প্রকাশই হলো না।

উক্ত ঘটনার পর কেটে যায় বেশ কয়েকটা বছর। দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমর তখন চলছে পুরো দমে। আর পাশ্চাত্যের হাসপাতালগুলো ভরে গেছে আহত সৈনিকে। বন্দুক, কামান ও বোমার ঘায়ে ক্ষতবিক্ষত সৈন্যরা গড়াগড়ি দিচ্ছে। বিষিয়ে উঠছে ক্ষতস্থান, তাদের আর্ত চিৎকারে ইওরোপের আকাশ বাতাস স্তব্ধ। কিন্তু বিষিয়ে যাওয়া ক্ষতস্থানকে নিরাময় করানোর কোন উপায় আবিষ্কৃত না হওয়ায় চিকিৎসকরা কেবল নিরুপায় দর্শকের ভূমিকায় আছেন। কোন চেষ্টাই তাঁদের সফল হচ্ছে না।

সেই সংকটময় পরিস্থিতিতে ঐ হতভাগ্য সৈনিকদের জন্য কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা—এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার জন্য চিকিৎসাবিজ্ঞানীদের নিয়ে একটি সম্মেলন করা হলো। যেহেতু ফ্লেমিং যুদ্ধক্ষেত্রে কাজ করতেন এবং দীর্ঘকাল হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত—তাই তাঁকেও আহ্বান জানানো হয়েছিল।

সম্মেলনের প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল আঘাতের ফলে ক্ষতস্থান বিষিয়ে ওঠা এবং রক্তদুষ্টি। তখনই ফ্লেমিংএর মনে পড়ে যায় বহুদিন আগে তাঁরই আবিষ্কৃত সেই বিরল ছত্রাক পেনিসিলিন নোটেটামের কথা।

সম্মেলন থেকে ফিরে এসে পুনরায় গবেষণা করলেন ছত্রাকটিকে নিয়ে। অবশেষে ওর গুণাগুণ সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখে পাঠিয়ে দিলেন নামকরা এক বিজ্ঞান পত্রিকায়।

পেনিসিলিন নোটেটাম থেকে ওষুধরূপে পেনিসিলিন নিষ্কাশন এক অতি চমকপ্রদ কাহিনী এবং এর মূলে আছে ডঃ আর্নেস্ট বোরিস চেইনের মুখ্য ভূমিকা।

চেইন ছিলেন জাতিতে য়িহুদী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে হিটলারের ভয়ে দেশছাড়া হয়ে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন লণ্ডনের রিফিউজি ক্যাম্পে। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন কেমিস্টের পদ খালি হলে চেইনকে ঐ পদে নিয়োগ করা হয় এবং গবেষণাপাগল চেইন তৎকালীন এক নামকরা প্যাথোলজির অধ্যাপক ডঃ হাওয়ার্ড ফ্লোরির সহযোগী হিসেবে গবেষণা শুরু করেন।

ফ্লোরির গবেষণার বিষয় ছিল "দূষিত-রোগ এবং তার প্রতিকার।" চেইনও এ বিষয়ে অত্যন্ত আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং গবেষণায় নিমগ্ন হন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, প্রথম প্রথম তাঁরা কোন সূত্র খুঁজে পাননি। কেবল অন্ধকারে হাত-ড়ানোর মত অবস্থা হয়েছিল তাঁদের। ঠিক সেইসময় চেইনের হাতে পড়ে ফ্লেমিং এর লেখা প্রবন্ধটি।

চেইন প্রবন্ধটি পাঠ করে খুবই উৎসাহী হলেন এবং ফ্লোরিকে প্ররোচিত করলেন পেনিসিলিনকে নিয়ে গবেষণা করতে। ফ্লোরি প্রথমটায় উৎসাহ প্রকাশ না করলেও চেইনের আগ্রহ দেখে তাঁকে বাধা দিতে পারলেন না। বর্ষীয়ান রসায়নবিজ্ঞানী নরম্যান হিটলীর সহযোগিতায় শুরু করে দিলেন পেনিসিলিন নোটেটামকে নিয়ে গবেষণা।

কথিত আছে, ফ্লোরি, চেইন এবং তাঁদের বহু সহযোগীর অক্লান্ত পরিশ্রমে

সুদীর্ঘ আটমাস পরে নিষ্কাশিত হয়েছিল মাত্র সাড়ে চার গ্রামের মত পেনিসিলিন। ঐ পেনিসিলিনকে মানবদেহে প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে এক সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো। কার উপরে প্রথম প্রয়োগ করবেন এই নতুন ওষুধকে।

অনেক ভেবে চিন্তে ফ্লোরি অক্সফোর্ডের র‍্যাডক্লিফ হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ডাঃ ফ্লেচারের শরণাপন্ন হলেন। ফ্লেচার ছিলেন ফ্লোরির বন্ধু। কথা দিলেন, সুযোগ এলেই তিনি ফ্লোরিকে খবর দেবেন।

উক্ত ঘটনার কয়েকদিন পরেই এক মুমূর্ষু রোগী এলো হাসপাতালে। মুখে তার বিষাক্ত ক্ষত। রোগীকে বাঁচানোর সবরকমের চেষ্টা যখন ব্যর্থ হল, সব চিকিৎসক যখন হাল ছেড়ে দিলেন এবং সবাই যখন বললেন মাত্র দু ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটবে তখনই ফ্লোরিকে খবর দেওয়া হলো।

ফ্লোরি সংবাদ পেয়ে একেবারে হন্তদন্ত হয়ে সেই কয়েকগ্রাম পেনিসিলিনকে নিয়েই ছুটে এলেন হাসপাতালে এবং প্রয়োগ করলেন মৃত্যুপথযাত্রী রোগীটির দেহে। সে দিনটি ছিল ১৯৪১ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী।

নতুন ওষুধ প্রয়োগ করে সবাই অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। ফ্লোরি তিন ঘণ্টা অন্তর দিতে থাকলেন পেনিসিলিন ইনজেকশন।

দু-ঘণ্টার বদলে দুদিন কেটে গেল। রোগী কিছুটা সুস্থ হয়ে বিছানার উপরে উঠে বসলো, মুখের ক্ষতও শুকিয়েছে অনেকখানি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন সবাই।

কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁদের এবং দুর্ভাগ্য সেই হতভাগ্য রোগীটির। যেটুকু পেনিসিলিন তৈরি হয়েছিল তা নিঃশেষ হয়ে গেছে এবং অত্যন্ত খরচবহুল বলে নিষ্কাশনের কাজও বন্ধ আছে। তাই আর পেনিসিলিন দেওয়া গেল না রোগীকে। আর রোগীটিও পুনরায় শয্যাগ্রহণ করলো এবং মারাও গেল।

এবার সবাই বুঝতে পারলেন, একটা রোগীকে বাঁচাতে গেলে এত অল্প পরিমাণ পেনিসিলিনের কর্ম নয়। তখন ফ্লোরি এবং চেইন নতুন উদ্যমে এবং প্রচুর ধারধোর করে উৎপাদন করলেন পর্যাপ্ত পেনিসিলিন। এবারও ফ্লেচারকে খবর পাঠানো হলো। ফ্লেচার পূর্বের মত তেমনই এক মুমূর্ষু কিশোরের উপর পেনিসিলিন প্রয়োগের নির্দেশ দিলেন।

এবার কিন্তু ব্যর্থ হলেন না তাঁরা। কিশোরটি সুস্থ হয়ে বাড়ী ফিরে গেল এবং নবাবিষ্কৃত ওষুধটির নাম ছড়িয়ে পড়লো সারা বিশ্বে।

জন্মমুহূর্তে পেনিসিলিন কিন্তু সহজলভ্য ছিলনা। ফ্লোরি ও চেইনের কোন সামর্থ্য ছিলনা পেনিসিলিন নিষ্কাশন করা এবং সরকারও এই খরচবহুল কাজে এগিয়ে আসেনি। কথিত আছে, দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমরে আহত সৈনিকদের ক্ষতস্থান নিরাময়ের জন্য পেনিসিলিনের চাহিদা হওয়ায় মার্কিন প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ফ্লোরিকে আমন্ত্রণ জানান এবং তথাকার রকফেলার ফাউণ্ডেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত পেনিসিলিন তৈরির ব্যবস্থা করেন।

এক ছিলেন ডাক্তার। নাম তাঁর সিম্পসন। সিম্পসন ছিলেন ভাল শল্য-চিকিৎসক। হাসপাতালের এক প্রসূতিসদনে মাঝে মাঝে প্রসূতিদের পেটে অস্ত্রোপচার করতে হতো তাঁকে।

সেকালে রোগীর দেহে অস্ত্রোপচার ছিল এক নির্মম ও পৈশাচিক ব্যবস্থা। রোগীকে জোর করে আটকে ধরে রাখা হতো এবং চিকিৎসক রোগীর চোখের সামনেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে কাটা ছেঁড়া করতেন।

ডাঃ সিম্পসনের ছিল অত্যন্ত দরদী মন। তিনি প্রায়ই দেখতেন মায়েদের দেহে অস্ত্রোপচারের সময় মায়েরা ভয়ে ও যন্ত্রণায় অনেক সময় মূর্ছা যেতেন। অনেকের সে মূর্ছা কোনদিনই ভাঙ্গতোনা।

মায়েদের এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে দেখে অত্যন্ত ব্যথিত হলেন ডাক্তার। মনে মনে ভাবলেন, ওদের যদি কিছুক্ষণ ধরে অজ্ঞান করিয়ে রাখা যেতো তাহলে তাঁরা ভয় ও যন্ত্রণার কবল মুক্ত হতে পারতেন এবং এত বিপত্তি ঘটতো না। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে তেমন জিনিস—যা কিছুক্ষণের জন্য রোগীকে সংজ্ঞাশূন্য করিয়ে রাখবে?

ডাক্তার সিম্পসন তেমন একটি জিনিস অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। যেখানে যত রাসায়নিক পদার্থ পেতেন সবগুলিকে সংগ্রহ করতেন এবং গন্ধ শুঁকে শুঁকে পরীক্ষা করতেন। কখনও কখনও দুচারজন বন্ধুবান্ধবকেও সঙ্গে নিয়ে পরীক্ষা চালাতেন।

সিম্পসনের ইচ্ছানুযায়ী যাঁরা যত রাসায়নিক জিনিস প্রস্তুত করতেন তাঁরা পাঠিয়ে দিতেন সিম্পসনের বাসায়। একদিন সিম্পসন সন্ধ্যার সময় যখন কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে বসে বসে গল্প করছিলেন তখনই তাঁর চোখে পড়ে নতুন তৈরি এক রাসায়নিক পদার্থ ক্লোরোফর্মের উপর।

সিম্পসনের গন্ধ শোঁকা ততদিনে যেন একটা বাতিকে পরিণত হয়ে উঠেছিল। শিশিটি দেখেই ছিপি খুলে শুঁকতে শুরু করে দিলেন। আঃ কী সুন্দর আর মিষ্টি গন্ধ! শুঁকতে গেলে আরও শুঁকতে ইচ্ছে হয় আর শরীরটাও কেমন যেন বিবশ হয়ে পড়তে চায়।

সিম্পসন বন্ধুদের দিকে শিশিটি এগিয়ে দিয়ে বললেন—শুঁকে দেখ, কী চমৎকার গন্ধ!

বন্ধুরাও একে একে শুরু করে দিলেন সেই মিষ্টি গন্ধকে প্রাণভরে গ্রহণ করতে। যত শোঁকেন ততই শুঁকতে ইচ্ছে হয়। বার বার তাঁরা পালা করে নাকের কাছে ধরতে শুরু করলেন।

তারপর—সে এক তুলকালাম কাণ্ড! সিম্পসন বেশ একচোট হো হো করে হেসে নিলেন এবং হাসতে হাসতে চেয়ার ছেড়ে গড়িয়ে পড়লেন মাটিতে। এবার আর হাসি নয়—গোঁ গোঁয়ানি।

বন্ধুরা যাঁরা এতক্ষণ ধরে ক্লোরোফর্ম শুঁকছিলেন তাঁরা সিম্পসনকে মাটিতে পড়ে গোঁ গোঁ করতে দেখে হাসিতে ফেটে পড়লেন। অবশেষে তাঁরাও গোঁ গোঁ করতে করতে মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে শুরু করলেন।

ঘরের ভেতরে কাজে ব্যস্ত ছিলেন সিম্পসনের স্ত্রী। বাহিরের ঘরে দুমদাম শব্দ, হাসি-হৈহুল্লোড়, পরিশেষে গোঙানির শব্দ শুনে ছুটে এলেন। ঘরে প্রবেশ করে যা দেখলেন, তাতে ভয়ে একেবারে আঁৎকে উঠলেন তিনি। সিম্পসন সহ সবাই অজ্ঞান-অচৈতন্য। মুখ থেকে বিষ খাওয়া রোগীর মত ফেনা বেরুচ্ছে, আর ছটফটানি ও গোঁ গোঁয়ানি।

কোন কিছুকে শুঁকে দেখার বদভ্যাস যে সিম্পসনের আছে, তা জানতেন ভদ্রমহিলা। এই করতে গিয়ে সিম্পসনকে বহুবার মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। কিন্তু আজ! ওঁদের আর বোধ হয় বাঁচানো যাবে না। কী করবেন ভেবে না পেয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে উঠলেন।

ঠিক সেই সময়ে জ্ঞান ফিরে এলো সিম্পসনের। তিনি অল্প ঘ্রাণ নিয়েছিলেন এবং আগে নিয়েছিলেন। মেঝে থেকে উঠে চেয়ারে বসলেন। স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিলেন এবং বন্ধুদের পড়ে থাকতে দেখে আদৌ ঘাবড়ালেন না। বরং মনটা তাঁর অনাবিল আনন্দে ভরে গেল। পেয়েছেন, পেয়েছেন—যাকে তিনি এতকাল ধরে খুঁজছিলেন তাকে পেয়েছেন। আর ভয় নেই!

পরীক্ষার সুযোগ এসে গেল মাত্র কয়েকটা দিন পরেই। প্রসববেদনায় ভয়ানকভাবে কষ্ট পাচ্ছিলেন জনৈকা প্রসূতি। তাঁর পেটে অস্ত্রোপচার না করলে নয়। সিম্পসন প্রথম তাঁকেই প্রয়োগ করলেন ক্লোরোফর্ম। সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘুমিয়ে পড়লেন প্রসূতিটি। সিম্পসন তাঁর নিপুণ হাতে জ্ঞান ফিরে পাওয়ার পূর্বেই রোগিণীর দেহে অস্ত্রোপচারের কাজ শেষ করলেন।

সম্ভাব্য সময়ের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে এলো মেয়েটির। সিম্পসন যেমন স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন তেমনই আনন্দে আত্মহারাও হয়ে উঠলেন। [অনেকে মনে করেন, ঐ প্রসূতিটি ছিলেন সিম্পসনের নিজের ভাইয়ের একটি মেয়ে। নিজের মেয়ের চেয়ে কোন অংশে কম ভালবাসতেন না তিনি। প্রথমে একটু ইতস্ততঃ করেছিলেন। কিন্তু ঐ মেয়েটিই উৎসাহিত করেছিলেন তাঁকে এবং স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছিলেন ক্লোরোফর্মকে।]

ঐ দিনটিও চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি শুভদিন হিসেবে চিহ্নিত হয়ে আছে। আর ঐ শুভদিনটির সূচনা যিনি করেছিলেন—তিনি ডাঃ সিম্পসন, এক সামান্য রুটিওয়ালার পুত্র। ঐ ক্লোরোফর্ম প্রয়োগের মাধ্যমে অপারেশন করার পদ্ধতিকে চালু করতে গিয়ে সারাজীবন যে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে এবং যে সংগ্রাম চালাতে হয়েছে, তাও এক ইতিহাসের নামান্তর। প্রচলিত সংস্কারকে ভাঙতে যে দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়েছেন সিম্পসন তা চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ক্লোরোফর্মের সাহায্যে সংজ্ঞাহীনা করিয়ে মায়েদের অপারেশন করতে যাও-যার সঙ্গে সঙ্গেই চারদিকে গড়ে উঠেছিল বিরুদ্ধ মনোভাব, শুরু হয়েছিল তীব্র বাদানুবাদ। ধর্মযাজকেরা জনগণকে বোঝালেন, সিম্পসন ধর্মবিরুদ্ধ কাজ করছেন। বাইবেলে উল্লেখ আছে, মেয়েরা হচ্ছে সহ্যশীলা ধরিত্রীর অংশ সম্ভূতা। ঈশ্বরের নির্দেশে তারা কষ্টের ভেতর দিয়ে সন্তানকে জন্মদান করবে এবং কষ্টের ভেতর দিয়ে সন্তানকে প্রতিপালন করবে। আর ঐখানেই 'মা' নামের সার্থকতা। সিম্পসন মেয়েদের কষ্ট লাঘবের ব্যবস্থা করেছেন এবং তিনি মেয়েদের আরামপ্রিয় করে তুলেছেন।

সিম্পসন বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গেলেন। খুঁজেই পেলেন না, মেয়েদের কষ্ট লাঘব করানোর ব্যবস্থা করলে কেমন করে ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়?

দৃঢ়কণ্ঠে প্রতিবাদ জানালেন সিম্পসন এবং মানলেন না ধর্মযাজকদের নির্দেশ। একাই রুখে দাঁড়ালেন সমগ্র দেশের জনমতের বিরুদ্ধে। অপারেশনও বন্ধ করলেন না।

কিন্তু ফল হলো উল্টো। ধর্মে পতিত হওয়ার ভয়ে কেউ মেয়েদের পাঠালোনা সিম্পসনের কাছে অপারেশনের জন্য। অপরদিকে সিম্পসনকেও ধর্মদ্রোহী বলে ঘোষণা করা হলো এবং সমাজ তাকে একঘরেও করলো।

তথাপি দমলেন না সিম্পসন। সমানে প্রতিবাদ চালিয়ে যেতে লাগলেন এবং আগ্রহীদের আমন্ত্রণ জানালেন অপারেশনের জন্য। এইভাবে চলেছিল সুদীর্ঘ দশ বছর কাল।

তবে এই কয়েক বছরে কোন প্রসূতি যে অপারেশন করেনি এমন নয়। যারা প্রচণ্ড কষ্ট পেতো তাদের আত্মীয়স্বজনেরা গোপনে গোপনে—রাত্রির অন্ধকারে প্রসূতিদের নিয়ে আসতো সিম্পসনের কাছে। সিম্পসন ব্যবস্থা করে দিতেন, কিন্তু জানাতেন না কাউকে। শুধু জাতিচ্যুত অবস্থায় একাই প্রতিবাদের ঝড় তুলে যেতেন।

প্রতিটি দেশে বিবেকবান মানুষের সংখ্যা কিছু কম থাকেননা। তাঁরা ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা আর মনে মনে সমর্থন করলেন সিম্পসনের কাজ। কিন্তু প্রতিবাদ জানাতে সাহসী হলেন না। অবশেষে, অর্থাৎ দশ বছর পরে স্বয়ং ইংলণ্ডেশ্বরী মহারানী ভিক্টোরিয়া ঐ বাদানুবাদের অবসান ঘটালেন আপন সন্তানকে জন্মদান করতে গিয়ে স্বেচ্ছায় ক্লোরোফর্ম গ্রহণ করে। মহারানীর দেহে অস্ত্রোপচার করেছিলেন সিম্পসন নিজেই।

আর বিরোধিতা করতে কেউ সাহসী হয় নি। প্রচলিত সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে করতে এতদিনে জয়ী হলেন সিম্পসন। সেই সঙ্গে নাম তাঁর ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বের সর্বত্র। আর শল্যচিকিৎসার উন্নতিও সেই থেকে শুরু বলা যায়। অর্থাৎ আজকের উন্নত শল্যচিকিৎসার প্রধান পুরোহিত তিনিই। আজকের দিনে ক্লোরোফর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বহু চেতনানাশকের সন্ধান পাওয়া

গেছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্লোরোফর্মকে ব্যবহারও করা হচ্ছে না। তবু রোগীকে অজ্ঞান করিয়ে অস্ত্রোপচার করানোর কল্পনা প্রথম সিম্পসনের মাথায়ই এসেছিল। এই কল্পনাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

প্রকৃত মায়ের সন্তান বলতে ঐ সিম্পসনদেরই বোঝায়।

✪ কুইনাইন ✪

দক্ষিণ আমেরিকায় পেরু নামে একটি রাজ্য আছে। একসময় সেখানকার বড়লাট ছিলেন কাউণ্ট অব সিনকেন।

খুব ভাল লোক ছিলেন সিনকেন। অত্যন্ত সরল ও অমায়িক। একবার হলো কী! পেরুতে থাকতে থাকতেই তাঁর হলো ভয়ানক অসুখ। কত ডাক্তার এলেন, কত কবিরাজ এলেন, কিন্তু অসুখটা কেউ ধরতে পারলেন না। প্রতিদিন একটা বিশেষ সময়ে কম্প দিয়ে জ্বর আসতো। তারপর কেটে যেতো কয়েক ঘণ্টা পরে।

জ্বর ভোগ করতে করতে লাট সাহেবের অবস্থা একেবারে কাহিল হয়ে পড়লো। উঠতে বসতে মাথা ঘুরে, ক্ষিধে হয় না আদৌ, চলতে গেলে হাঁফ ধরে, একটুও কোন কাজ করতে পারেন না। দেশ বিদেশের শত শত চিকিৎসকের বিদ্যে যখন সারা হলো তখন ঘোষণা করা হলো, যিনি লাটসাহেবের অসুখকে সারিয়ে দিতে পারবেন তাঁকে প্রচুর পুরস্কার প্রদান করা হবে।

এবার কত দেশ থেকে কত চিকিৎসক এলেন, তবু কিছুতেই কিছু হলো না। পরিশেষে চিকিৎসকদের আসাও একরকম বন্ধ হয়ে গেল এবং সবাই লাটসাহেবের জীবনের আশা ছেড়ে দিল। আর লাটসাহেবও নিশ্চিত মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

লাটসাহেবের অবস্থা যখন একেবারে কাহিল, ঠিক সেইসময় এলেন এক থুত্থুরে বুড়ো কবিরাজ। তিনি লাটসাহেবকে দেখার আগ্রহ প্রকাশ করলে লোকজন যারা ছিল, তারা খুব আদর করে নিয়ে গেল কবিরাজকে। কারণ, এখনতো আর কোন চিকিৎসক আসেন না। তাই বিনা ওষুধেই লাটসাহেবকে থাকতে হয়ে ছিল। কপালগুণে যখন একজনকে পাওয়া গেল, তখন অন্তত একটু ওষুধ পাবেন লাটসাহেব।

কবিরাজ মশাই খুব ভাল করে দেখলেন রোগীকে। চোখ দেখলেন, জিভ দেখলেন এবং পেট টিপলেন। তারপর থলে থেকে বার করলেন শুকনো কতকগুলো গাছের ছাল। বললেন, ঐ ছালগুলোকে বেটে দিনে তিনবার করে রোগীকে খাওয়ালে চারদিনেই জ্বর ছেড়ে পালাবে।

অবাক কাণ্ড! মাত্র দুদিন সেবনের পরেই জ্বর আর এলো না। চারদিকে জয়জয়কার পড়ে গেল বুড়ো কবিরাজের। যেন রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেলেন

তিনি। অন্যান্য চিকিৎসকরা এবার ধরে বসলেন কবিরাজকে। গাছটা তাঁদের চিনিয়ে দিতেই হবে!

কবিরাজ মশাই আদৌ আপত্তি করলেন না। সেই দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চলেই জন্মায় এমন একটা গাছকে দেখিয়ে দিলেন। আর তখনই গাছটার নামকরণ করা হলো সিন্‌কোনা গাছ। বলা বাহুল্য, কাউন্ট অব্ সিনকোনের নামেই গাছটার নামকরণ করা হয়েছিল।

সেকালে ম্যালেরিয়া রোগের একমাত্র ওষুধ ছিল সিন্‌কোনা গাছের ছাল এবং এর আদি জন্মস্থান দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চল। গাছটার আশ্চর্য গুণের কথা প্রকাশ পাওয়ায় পৃথিবীর প্রায় সব দেশের লোক পেরু থেকে সিন্‌কোনা গাছের চারা সংগ্রহ করেন এবং অতি অল্প দিনের ভেতরেই সারা পৃথিবীতে সিন্‌কোনা গাছের চাষ শুরু হয়ে যায়। ভারতবর্ষের দার্জিলিং জেলার আবহাওয়া ঐ গাছের অনুকূল বলে একমাত্র মংপুতে সিন্‌কোনা চাষ শুরু হয়েছিল।

প্রথম প্রথম ওর ছালকেই ব্যবহার করা হতো। পরের দিকে বিজ্ঞানী ক্যাভেন্টু ও বিজ্ঞানী পেলটিয়ার সিন্‌কোনা গাছের ছাল থেকে কুইনাইন প্রস্তুত করেন। আরও পরে কুইনাইনের চাহিদা মেটাতে সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে কুইনাইন প্রস্তুত করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। [কারও কারও মতে জ্বরে কাউন্ট অব্ সিন্‌কোনের কন্যা মারা যায় ও পরে তার স্ত্রীকে আক্রমণ করে। সিনকোনের নিজের জ্বর হয়নি।]

✪ স্টেথস্‌কোপ ✪

এক ছিলেন ডাক্তার। নাম তাঁর থিয়োফিল লেনেক। প্যারিসের এক নামকরা হাসপাতালে চাকরি করতেন তিনি।

একদিন হাসপাতালে ভর্তি হলো একটি বিশেষ ধরণের রোগী। রোগটা বেশ জটিল বলে ডাক্তার লেনেক অনেকক্ষণ ধরে রোগীকে দেখলেন। শেষে বুঝতে পারলেন, রোগটা বুকের।

সেকালে স্টেথস্‌কোপ আবিষ্কৃত না হওয়ায় ডাক্তারকে বুকে কান ঠেকিয়ে হৃৎপিণ্ডের "ধুক" "ধুক" শব্দটা শুনতে হতো। ডাক্তার লেনেকও তাই করলেন। কিন্তু রোগীর হৃৎপিণ্ডের সেই ধুক ধুক শব্দটা এত ক্ষীণ ছিল যে ডাক্তার কিছুতেই ধরতে পারলেন না রোগটাকে।

বড় মনমরা হয়ে উঠলেন ডাক্তার। এত বেশী মন খারাপ হলো যে, ডিউটি শেষে তিনি বাসায় না ফিরে ভাবতে ভাবতে সোজা চলে গেলেন কাছের একটা পার্কের দিকে। তারপর সেইখানে একটা জায়গায় বসে চিন্তা করতে লাগলেন রোগীটির কথা।

সূর্য তখন অস্ত গেছে, আর পার্কও তখন ভরে উঠেছে লোকজনে। বিশেষ

করে শিশুদের কলধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছে পার্ক। তারা তখন নানা রকমের খেলাধূলায় মত্ত। ওদের হাসিখুশি, দৌড়ঝাঁপ ও খেলার ধরণ ধারণ দেখে লেনেক মুহূর্তের ভেতরে যেন হারিয়ে ফেললেন নিজেকে। সবুজ ঘাসের গালিচায় বসে, সবুজ মন নিয়ে কেবল সবুজদের খেলাধূলাই উপভোগ করতে লাগলেন।

এক সময় তাঁর মন কেড়ে নিল, পার্কের এককোণে বসে থাকা দুটি ছোট ছোট ছেলে। তাদের সামনে পড়ে আছে একটা কাঠের পুরু তক্তা। তক্তার দুপাশে দুজন বসে। একজন তক্তাটার একপাশে মুখ ঠেকিয়ে কী যেন বলছে এবং টোকা মারছে আর ওপাশের ছেলেটা কান ঠেকিয়ে শুনছে এবং হি হি করে হাসছে। তারপর ওপাশের ছেলেটার পালা। সেও আগের ছেলেটির মত টোকা মারছে আর কথা বলছে। তখন এ পাশের ছেলেটা কান পেতে শুনে হাসছে।

ছেলে দুটোর ঐ মজার খেলা দেখে বিদ্যুৎ চমকের মত একটা কথা ডাক্তার লেনেকের মাথায় এসে গেল। বাসায় না গিয়ে সোজা হাজির হলেন হাসপাতালে। একরকম ছুটতে ছুটতে তাঁকে হাসপাতালে পৌঁছাতে দেখে নার্সরা অবাক হলেন। ডাক্তার সামনের নার্সটির দিকে তাকিয়ে একখানা মোটা কাগজ আনার নির্দেশ দিলেন এবং নিজে সোজা ঢুকে পড়লেন নতুন রোগীটির ঘরে।

যথাসময়ে নার্সটি একখানা মোটা কাগজ এনে দিলেন ডাক্তারকে। ডাক্তার তখন ঐ কাগজটাকে গোল করে পাকালেন। চোঙের মত করে মাঝখানটা ফাঁকাও রাখলেন। এবার সেই নলের একপ্রান্ত রোগীর বুকে ঠেকিয়ে অপরপ্রান্তে ঠেকালেন নিজের কান।

যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই-ই হলো। অতি ক্ষীণ শব্দটাও জোরালো হয়ে ডাক্তারের কানে এসে ধরা পড়লো। খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো ডাক্তারের মুখখানা। রোগটা ধরা পড়ায় একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাসায় ফিরে গেলেন।

ডাক্তার লেনেক এরপর থেকে ঐ কাগজের নল রোগীর বুকে চেপে বুক পরীক্ষা করতেন। মাঝে মাঝে এক আধটু অসুবিধে হতো। সেই অসুবিধাকে দূর করার জন্য তিনি ছুতোর মিস্ত্রীকে ডাকিয়ে দুটি কাঠের নল তৈরি করে নিয়েছিলেন। দুটি নলকে যুক্ত করেছিলেন একটা পাতলা কাঠের চাকতির উপর। যখন রোগীর বুক পরীক্ষা করতে হতো তখন ঐ চাকতিটা রোগীর বুকে চেপে ধরতেন এবং দুটি নলের প্রান্ত গুঁজে দিতেন কানের ভেতরে।

ডাক্তারদের বুক পরীক্ষার যন্ত্র স্টেথস্কোপের জন্ম হয়েছে ঠিক এইভাবে—ডাক্তার লেনেকের হাতে। পরবর্তীকালে যন্ত্রটির অনেক উন্নতি হয়েছে এবং উন্নতি হতে হতে আজকের স্টেথস্কোপ অবোধ শিশুদের অতি সাধারণ একটা খেলাকে অবলম্বন করে এমন একটা মহৎ আবিষ্কার—আশ্চর্যজনক ঘটনা নয় কী?

✪ স্প্রু রোগের ওষুধ ✪

এক ছিলেন তরুণ।

মাদ্রাজ শহরে এক দরিদ্র কেরাণীর ঘরে জন্ম তাঁর। বাবা যা রোজগার করতেন

তা দিয়ে কোন রকমে টেনেটুনে সংসার চলতো। একবার ঐ তরুণের একটি ভাইয়ের হলো সাংঘাতিক অসুখ। প্রথমে দু-একজন সাধারণ চিকিৎসককে দেখানো হলো। কিন্তু অসুখ যখন সারলোনা তখন ধারধোর করে বাবা ডেকে আনলেন শহরের এক নামকরা চিকিৎসককে।

চিকিৎসক এলেন। রোগীকে ভালভাবে পরীক্ষাও করলেন। শেষে বাবাকে একান্তে ডেকে নিয়ে বললেন—ওর স্প্রু হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ঐ রোগের কোন প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি। অতএব আমি নিরুপায়।

ডাক্তারের কথা ঠিক হলো। কিছুদিন রোগ ভোগের পর ভাইটি মারা গেল।

বড্ড আঘাত পেলেন তরুণটি। কয়েকদিন ধরে কেবলই কাঁদলেন। তারপর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, যেমন করে হোক তাঁকে ডাক্তার হতে হবে এবং ঐ স্প্রুরোগটাকে পৃথিবী ছাড়া করতে হবে।

স্কুলের পাঠ শেষ করার পর তরুণটি বাবাকে বললেন—বাবা আমি ডাক্তারী পড়বো।

ছেলের কথা শুনে মুষড়ে পড়লেন বাবা। শুকনো গলায় বললেন—ডাক্তারী পড়ার যে অনেক খরচ বাবা! সামান্য মাহিনের চাকরী, আমি কেমন করে সামলাবো?

ম্লান মুখে তরুণটি বললেন—সে আমি জানি বাবা! ভাবছি, আত্মীয়স্বজনদের কাছ থেকে ধারধোর করে পড়াশোনা চালাবো। পরে রোজগার করলে ওঁদের সব টাকা শোধ করে দেবো।

ছেলের পরিকল্পনা পিতাকে আদৌ সন্তুষ্ট করতে পারলো না। বিরসমুখে বললেন—তুমি বড় হয়েছো, যা ভাল বোঝ কর। তবে আমিও চেষ্টা করবো সংসারের খরচ কমিয়ে তোমাকে সাহায্য করতে!

পিতার অনুমোদন লাভ করে তরুণটি এবার ধর্ণা দিলেন আত্মীয়দের বাড়ী বাড়ী। তাঁদের দেওয়া সামান্য প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করে ভর্তি হয়ে গেলেন মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজে।

তরুণটির অমানুষিক পরিশ্রম ব্যর্থ হলো না। একদিন ভালভাবেই পাশ করলেন এবং একদিন ঐ কলেজেরই ডেমনস্ট্রেটরের পদ লাভ করলেন।

এবার গবেষণার পালা। বলাবাহুল্য, তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল সেই স্প্রুরোগ। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে গবেষণার পর বুঝতে পারলেন, ভারতে পড়ে থাকলে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে না। যেতে হবে সুদূর সাগর পারে।

তরুণটির দৃঢ় মনোবলের কাছে মহাসাগরকেও মাথা নত করতে হলো। জনৈক অধ্যাপকের উপদেশে সামান্য একটা বৃত্তিকে অবলম্বন করে পাড়ি দিলেন লণ্ডনে।

লণ্ডনে গবেষণা করলেন কিছুকাল। কিন্তু এখানেও কোন আশার আলো দেখতে পেলেন না। যাঁদের অধীনে গবেষণা করতেন, তাঁরা জানালেন স্প্রু রোগটা হচ্ছে গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগ। উক্ত রোগ সম্বন্ধে গবেষণার কোন প্রতিষ্ঠান লণ্ডনে নেই। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের রোগগুলোকে নিয়ে গবেষণা করতে হলে যেতে হবে আমেরিকায়।

তরুণটি আর লণ্ডনে পড়ে থাকতে চাইলেন না। কিন্তু হাতে পয়সা ছিল না আদৌ। জাহাজের খালাসীর কাজ নিয়ে মাত্র পঁচিশ ডলার সঙ্গে নিয়ে পৌঁছলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে।

নতুন নির্বান্ধব জায়গা। তরুণটি ভেবেছিলেন, আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছলেই চাকরী পাওয়া যাবে। কিন্তু তাও পাওয়া গেল না। তখন বাধ্য হয়ে তরুণটিকে একটি কারখানায় শ্রমিকের কাজ গ্রহণ করতে হলো।

শ্রমিকের কাজ করতে করতে বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে গেল। অবশেষে তরুণটির আপ্রাণ চেষ্টায় একটা ছোট্ট গবেষণামূলক বৃত্তি লাভ করে একটি হাসপাতালে গবেষণা শুরু করলেন। অচিরে বুঝতে পারলেন-স্প্রু সম্বন্ধে গবেষণা করতে হলে সুসজ্জিত গবেষণাগার, অনেক লোকজন ও বহু অর্থের প্রয়োজন।

তরুণটি উপায় না পেয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। এবার আর কোন অসুবিধা হলো না। তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে মার্কিন সরকার সমস্ত দায়িত্ব নিজে বহন করলেন এবং তরুণটিও লাভ করলেন প্রচুর সহযোগী, বহু অর্থ এবং বিরাট এক গবেষণাগার।

উক্ত গবেষণাগার থেকে একে একে আত্মপ্রকাশ করলো নানা ধরণের ওষুধ। তাঁর এতদিনের স্বপ্নও সার্থক হলো। স্প্রুরোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার ভ্রাতৃপ্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। সেই থেকে পৃথিবীর কোন ভাই-বোনকে আর স্প্রুরোগে আক্রান্ত হয়ে অকালে প্রাণ হারাতে হলো না।

এই তরুণটি ভারত মাতার অন্যতম সুসন্তান ডাঃ ইয়েল্লো প্রাগদা সুব্বা রাও। তাঁর মত এত বেশী ওষুধ বোধ হয় কেউ আবিষ্কার করতে পারেন নি। স্প্রু ব্যতীত পেলেগ্রা নামক আর একটি মারাত্মক ওষুধেরও প্রতিষেধক আবিষ্কার করে গেছেন তিনি। তাছাড়া পেনিসিলিনের ব্যর্থতা ঢাকতে বহু অ্যাণ্টিবায়োটিকেরও আবিষ্কর্তা তিনি। তাঁদের মধ্যে আমাদের অতি পরিচিত ওরিওমাইসিন ও সুব্বা মাইসিন নামে দুটি অ্যাণ্টিবায়োটিকও আছে। বলাবাহুল্য সুব্বা মাইসিন তাঁরই নামকে বহন করে চলেছে। এত বেশী ওষুধ তিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে, সেকালে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন "আশ্চর্য ওষুধ সমূহের আবিষ্কারক অত্যাশ্চর্য ডাক্তার"।

✪ পৃথিবীর সূর্য-পরিক্রমা ✪

আপাতদৃষ্টিতে আমরা সবাই দেখি, সূর্য ঊর্দ্ধাকাশে থেকে পৃথিবীকে পরিক্রমা করছে। মানবসভ্যতার আদি থেকে একরকম ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত ঐ একই ধারণা মানুষের মধ্যে ছিল। অর্থাৎ সবাই মনে করতো ঈশ্বরের বিধান অনুযায়ী সূর্যকে পূবে উদিত হয়ে পশ্চিমে অস্ত যেতে হচ্ছে। কেবল সূর্য নয়, আকাশের

গ্রহ নক্ষত্রদেরও ঘুরতে হচ্ছে।

আজকের দিনে তোমরা অবশ্য কেউ এমন কথা মুখে আনলে তাকে পাগল বলেই উপহাস করবে। কিন্তু সেদিন যদি কেউ সূর্য না ঘুরে পৃথিবী ঘুরছে বলতো, তাহলে সে বিদ্রূপের পাত্র হয়ে দাঁড়াতো। আর বলতে যাবেই বা কেমন করে! সবাইতো দেখছে, সূর্য ঘুরছে আর পৃথিবী রয়েছে স্থির।

মানুষের উপরোক্ত ধারণার পরিবর্তন হতে একশ' বছরেরও বেশী সময় লেগেছে। কেউ কী আর সহজে মেনে নিয়েছে! যখনই কেউ অনুরূপ মনোভাব পোষণ করতে গেছেন, তখনই জনমতের চাপে তাঁকে নাস্তানাবুদ হতে হয়েছে। কত অপ্রীতিকর ঘটনা যে ঘটেছে, কতজনকে কত অপমান যে সহ্য করতে হয়েছে, তা বলে শেষ করা যায় না।

প্রথমে মনে হয় পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমার কথা উল্লেখ করেছিলেন প্রখ্যাত গ্রীক গণিতজ্ঞ অ্যারিস্টার্কাস (খ্রীঃ পূঃ ৩১০—২৭৩)। কিন্তু সেদিন কেউ আমল দেয়নি তাঁর কথায়। দ্বিতীয় ব্যক্তিটি হলেন প্রখ্যাত ভারতীয় জ্যোতির্বিদ প্রথম আর্যভট (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী)। বলেছিলেন "চলা পৃথ্বি স্থিরা ভিমি"।

আর্যভটকে কেউ সমর্থন করেন নি। বরং সে আমলে যাঁরা জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চা করতেন, তাঁরা অত্যন্ত জঘন্য মনোভাব পোষণ করেছিলেন। বরাহ মিহির বলেছিলেন "পৃথিবী যদি ঘুরছে তাহলে পাখীরা কেমন করে তাদের বাসায় ফিরে আসে?" শোন কথা!

আর্যভটের পরে প্রায় হাজার বছরে আর কেউ উচ্চারণ করেনি এমন কথা। ইওরোপে ধর্মান্ধতার যুগে সেই একই সন্দেহ প্রকাশ করেন কোপার্নিকাস (১৪৭৩-১৫৪৩ খ্রীঃ)। তখন চলছিল ধর্মগুরুদের অপ্রতিহত প্রভাব। তাঁরা বলতেন, ঈশ্বর পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন আর সৃষ্টি করেছেন মানুষকে। মানুষের জন্য চাঁদ সূর্য প্রভৃতি ঈশ্বরের নির্দেশে পৃথিবী পরিক্রমা করছে।

ধর্মগুরুদের সেকালে এমন দাপট ছিল যে, শাস্ত্রের বিরুদ্ধে টুঁ শব্দটি করার উপায় ছিল না কারও। এমন কি রাজারও নয়। কোপার্নিকাস তাই ভয়ে কিছু বলতে পারেননি। কিন্তু একটা বইতে লিখে গেলেন সেকথা এবং তাঁরই ইচ্ছানু-যায়ী বইটি প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পরে। শোনা যায়, বইটি পড়ে ধর্মগুরুরা একেবারে ক্ষেপে উঠেছিলেন। কিন্তু কী আর করবেন? কোপার্নিকাস তখন ধরা-ছোঁয়ার বাহিরে। বাধ্য হয়ে বইটাকেই বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল।

কোপার্নিকাসের পরে যিনি সেই একই মনোভাব পোষণ করেছিলেন—তিনি গ্যালিলিও (১৫৬৪-১৬৪২ খ্রীঃ)। তিনি অবশ্য অনুমানের দ্বারা উক্ত মতবাদ রাখেননি। দস্তুরমত নিজ হাতে দূরবীণ তৈরি করে এবং আকাশের জ্যোতিষ্কদের গতিবিধি লক্ষ্য করে তবেই বলেছিলেন।

এবারও ফল হলো উল্টো। ধর্মযাজক থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সবাই গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করলেন। সূর্য দেবতা বলে কথা! তার উপর স্বয়ং ঈশ্বর তাঁকে ঐ কাজে নিয়োগ করেছেন! ঈশ্বরের রোষবহ্নিতে দেশটা ছারখারে যাবে যে!

ধর্মযাজকরা বোধ হয় এবার একটু চিন্তিত হলেন। কেন একই কথা বারবার ঘুরে-ফিরে আসছে ? তাছাড়া গ্যালিলিও তো মহাপণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি তো মিছে কথা বলবার লোক নয় ! তাই বলে গ্যালিলিওর কথাকে মেনে নেওয়াও যায় না। যদি মেনে নেওয়া হয়, তাহলে তাঁদের জারিজুরি আর খাটবে না। ধর্মের প্রতি সাধারণ মানুষ একেবারে আস্থাহীন হয়ে উঠবে। এখন উপায় !

ধর্মযাজকরা এবার কোমর বেঁধে গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে প্রচারে নেমে পড়লেন। তাঁরা বোঝাতে শুরু করলেন, গ্যালিলিও এক পাষণ্ড। সে ধর্ম মানে না, ঈশ্বরও মানে না। ওকে যদি শাস্তি না দেওয়া হয় এবং ওঁর মুখ যদি বন্ধ করা না হয় তাহলে ঐ একজনের পাপেই সারা দেশটা রসাতলে যাবে। ঈশ্বরের কোপে অচিরেই নেমে আসবে নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মড়কে উজাড় হয়ে যাবে দেশ এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে !

ধর্মযাজকরা সাধারণের মধ্যে কেবল গ্যালিলিওর বিরুদ্ধে প্রচার করে ক্ষান্ত হলেন না, রাজার কাছে নালিশও করলেন। শাস্ত্র থেকে সহস্র সহস্র উদ্ধৃতি সহযোগে রাজার কাছে ব্যাখ্যা করলেন, গ্যালিলিও দেশের কী সর্বনাশ সাধন করতে যাচ্ছেন।

রাজা কুপিত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ দিলেন গ্যালিলিওকে ধরে আনার জন্য।

গ্যালিলিও এলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি নাকি বলে বেড়াচ্ছো, সূর্য ঘোরে না—পৃথিবীই ঘুরে ?

শান্ত ও সংযত কণ্ঠে গ্যালিলিও উত্তর দিলেন—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ !

রাজা ভ্রূকুঞ্চিত করে তাকালেন গ্যালিলিওর দিকে। জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি কী বলতে চাও, আমাদের সবার চোখ খারাপ আর তোমার চোখটাই ঠিক ? এতকাল মানুষ যা দেখে আসছে, শাস্ত্র যা বলেছে-সবই ভুল ?

—আজ্ঞে সবই ভুল মহারাজ ! পৃথিবী পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ক্রমাগত পাক খাচ্ছে বলে আমরা সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে পরিভ্রমণ করতে দেখেছি।

রাজা এবার রীতিমত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। বললেন—তোমার মত এক পাগলের প্রলাপ শোনার মত সময় আমার নেই। তোমার কথা প্রত্যাহার করতে হবে—এই আমার আদেশ।

গ্যালিলিও কী বলবেন ভেবে পেলেন না। কেবল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলেন রাজার মুখের পানে।

একটু পরে রাজার নির্দেশে এক অনুচর একটি সাদা কাগজ পেতে ধরলো গ্যালিলিওর সামনে। রাজা এবার দৃঢ়কণ্ঠে বললেন—জীবনে এমন কথা মুখে আনবে না—এই প্রতিজ্ঞা করে তুমি ঐ কাগজে সহি করে দাও।

থতমত খেয়ে গেলেন গ্যালিলিও। বললেন—আপনারা আমার কথা বিশ্বাস করছেন না। পৃথিবী কিন্তু সত্যিই ঘুরছে। এমন একদিন আসবে, যেদিন সূর্য ঘুরছে বললে সবাই ঠাট্টা করবে।

অবাধ্য গ্যালিলিওকে রাজা পাঠিয়েছিলেন জেলখানায়। সর্ত আরোপ করা

হল, যদি গ্যালিলিও তাঁর কথা প্রত্যাহার করে নেন তাহলে মুক্তি পাবেন। আর প্রত্যাহার না করলে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

শেষ পর্যন্ত গ্যালিলিও প্রাণের ভয়ে তাঁর মতবাদকে প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। তবে ঐ ঘটনা থেকে অনেকের মনে সন্দেহ উপস্থিত হয় এবং বহুজনে পরীক্ষা শুরু করেন। ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় গ্যালিলিওর সেই ভূ-ভ্রমণ মতবাদ।

✪ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ✪

তোমরা জানো, পৃথিবী তার বুকের উপর অবস্থানকারী অতি ক্ষুদ্র ধূলিকণা থেকে বৃহৎ বৃহৎ বস্তুপিণ্ড মমতাময়ি জননীর মত অদৃশ্য এক আকর্ষণে পরম স্নেহ-ভরে আটকে রেখেছে। সে আকর্ষণ বলকে সহজে ছিন্ন করা যায় না এবং এই আকর্ষণ বলের নাম মাধ্যাকর্ষণ বল বা পৃথিবীর অভিকর্ষ।

পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের কথা দীর্ঘকাল ধরে মানুষের কাছে একেবারে অপরিচিতই ছিল। শুধু একটিবার ক্ষীনস্বরে উচ্চারণ করেছিলেন জনৈক ভারতীয় বিজ্ঞানী। নাম তার ভাস্করাচার্য (খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী)। তারপরে এই সত্যটিকে যিনি জোরালোভাবে প্রচার করেন এবং পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করেন, তিনি মহাবিজ্ঞানী নিউটন। উক্ত ঘটনাটি আবিষ্কারের মূলে একটি ছোট্ট কাহিনী আছে। যদিও অনেকে কাহিনীটিকে কিংবদন্তীমূলক বলে আখ্যা দিয়ে থাকেন, তথাপি সেই কাহিনীটি উল্লেখ করা হলো।

একদিন সন্ধ্যার সময় নিউটন বসেছিলেন তাঁর বাগানে। বিজ্ঞানী তো! তাই কত হরেক রকমের চিন্তা তাঁর মাথায় এসে ভর করছিল। খোলা আকাশের দিকে তাকিয়ে হয়ত ভাবছিলেন আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রদের কথা, পৃথিবীর কথা, ইত্যাদি। কিংবা ভাবছিলেন, পৃথিবী যদি মেরুদণ্ডের উপর অনবরত পাক খাচ্ছে, তাহলে আমরা ছিট্‌কে মহাশূন্যে নিক্ষিপ্ত হচ্ছিনা কেন? কেন সে পাক খেতে খেতে সূর্যের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে না!

এক সময় অদূরে ঝুপ করে একটা শব্দ উঠলো। আর সেই শব্দে নিউটনের চিন্তাসূত্রও ছিন্ন হয়ে গেল। দেখলেন, একটা পাকা আপেল এইমাত্র গাছ থেকে মাটিতে পড়ে গেছে এবং সেই শব্দই তিনি শুনেছেন।

নিউটনের মাথায় এবার অন্য চিন্তা এলো। ভাবলেন, পাকা ফল গাছের ডগা থেকে খসে কেন মাটিতে পড়ে? সে মাটিতে না পড়ে উপরের দিকে তো যেতে পারতো, অথবা অবলম্বনচ্যুত অবস্থায় সেইখানে তো ঝুলে থাকতে পারতো? কেন আকাশের দিকে ঢিল ছুঁড়লে সেটি পুনরায় মাটিতে নেমে আসে, শূন্যে কেন বিলীন হয়ে যায় না!

ঘরে ফিরে এলেন নিউটন। আর ঐ অজস্র "কেন" কে নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করলেন। শেষে একদিন স্থির করলেন, পৃথিবীর নিশ্চয়ই নিজস্ব এক আকর্ষণ

বল আছে। যাকে অতিক্রম করা আদৌ সহজ নয়। নিউটন তখন ভেবে-চিন্তে এই আকর্ষণ বলের নাম রাখেন মাধ্যাকর্ষণ বল।

এই প্রসঙ্গে নিউটন আরও মাথা ঘামিয়েছিলেন। তাই পৃথিবীকে আরও একটি নতুন কথা শুনিয়েছিলেন। বলেছিলেন, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতিটি বস্তু তথা ছোট ছোট ধূলিকণা থেকে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি বিশাল বিশাল বস্তুপিণ্ড পর্যন্ত সবাই একে অপরকে আকর্ষণ করছে। দূরত্ব কম হলে বড়র উপর ছোটরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে এবং দূরত্ব বেশী হলে বড়র চারদিকে ছোটরা পাক খেতে খেতে পরিভ্রমণ করে। তখন আর হুমড়ি খেয়ে পড়তে হয় না।

নক্ষত্রের চারদিকে গ্রহরা, গ্রহের চারদিকে নক্ষত্ররা, এমনকি নক্ষত্ররা নিজেরাই যে মহাকাশে পরিভ্রমণরত অবস্থায় আছে এবং তারা যে ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারছে না তার মূলে আরও বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে প্রাথমিকভাবে এই তথ্যটি প্রদান করে জ্যোতির্বিজ্ঞানে অমর হয়ে আছেন নিউটন।

✪ সেলুলয়েড, প্লাস্‌টিক ও সেলোফেন ✪

আজ থেকে মাত্র একশ বছর আগেও খেলনা এবং সৌখিন জিনিসপত্র প্রস্তুতিতে হাতির দাঁতের চাহিদা ছিল যথেষ্ট। ভারি সুন্দর, শক্ত, মজবুত ঐ হাতির দাঁত। এখনও তার কৌলিন্য হ্রাস পায়নি এতটুকু। দামও অনেক। অর্থশালী ব্যক্তি ছাড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে হাতির দাঁতের জিনিস ব্যবহার এক রকম অসম্ভব। পাশ্চাত্যের বেশীর ভাগ ধনী এবং সৌখিন ব্যক্তিরা এককালে হাতির দাঁতের জিনিসের প্রতি একটা বড় রকমের আকর্ষণ অনুভব করেছিলেন। তাই সেকালে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি তাঁদের চাহিদা মেটাতে একেবারে হিমসিম খেয়ে যেত। এত হাতির দাঁত কোত্থেকে জোগাড় করবে তারা ?

ইংরেজী ১৮৬৫ সাল। নিউ ইয়র্কের এক বড় শিল্প প্রতিষ্ঠান হাতির দাঁতের চাহিদা মেটাতে গিয়ে মহা অসুবিধায় পড়ল। ঘোষণা করল, যদি কোন ব্যক্তি হাতির দাঁতের বিকল্প কোন কৃত্রিম জিনিস প্রস্তুত করতে পারে, তাহলে তাকে নগদ দশ হাজার ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে।

দশ হা-জা-র-ডলার! অর্থের পরিমাণটা বেশ লোভনীয়। ঘোষণার কথা শুনে বহু বিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন। কত রকমের কত পরীক্ষা চলতে লাগল। কত বিজ্ঞানী আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে গবেষণাগারে পড়ে রইলেন। কিন্তু আশার আলো কেউ দেখতে পেলেন না। শেষে খবরটা এসে পৌঁছোল গবেষণা পাগল দু-ভাই—ওয়েসলিহায়াট এবং ইসাইয়া হায়াটের কানে। ভাবলেন, একবার চেষ্টা করে দেখাই যাক না কেন! যদি এতগুলো অর্থ হাতে এসে যায়! যেই ভাবা সেই কাজ। শুভক্ষণে দু'জনেই আরম্ভ করলেন গবেষণা। কী খেয়াল হল তাঁদের! প্রথমেই আরম্ভ করলেন নাইট্রো সেলুলোজকে নিয়ে পরীক্ষা। কারণ একটা অবশ্য ছিল। হায়াট ভ্রাতৃদ্বয় সদ্য আবিষ্কৃত নাইট্রো সেলুলোজের প্রতি

একটা বড় রকমের আকর্ষণ বোধ করতেন।

নাইট্রো সেলুলোজ আবিষ্কারের পেছনে একটু ইতিহাস আছে। যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে, তার কিছু পূর্বে সেলুলোজকে নিয়ে গবেষণার ধূম পড়ে গিয়েছিল। সেলুলোজ হচ্ছে—উদ্ভিদের দেহকোষের একটা বিশেষ উপাদান। তুলো, পাট প্রভৃতির আঁশে সেলুলোজ যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়!

সে সময় বার্মিংহোমে বাস করতেন এক রসায়ন বিজ্ঞানী। নাম তাঁর আলেকজাণ্ডার পার্কস। খেয়ালী তিনিও বড় একটা কম ছিলেন না। একদিন কী মনে হল তাঁর! সেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিডকে মিশিয়ে ফেললেন। আর যায় কোথায়! আপন খেয়ালের ফসল হিসেবে পার্কস সেদিন উপহার দিলেন একটি বিস্ফোরক পদার্থকে। নামকরণ তিনিই করলেন। যেহেতু নাইট্রিক অ্যাসিড ও সেলুলোজের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়েছিল, তাই নাম হ'ল নাইট্রো সেলুলোজ।

পার্কস বিস্ময়ের সঙ্গে আরও লক্ষ্য করেছিলেন, সেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড বেশী পরিমাণ মেশালে উৎপন্ন হয় দাহ্য ও বিস্ফোরক পদার্থ, কিন্তু অ্যাসিডের পরিমাণ কম হলে উৎপন্ন পদার্থটি দাহ্যও হয় না এবং বিস্ফোরকও নয়। উভয় বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থগুলোকে যদিও নাইট্রো সেলুলোজ বলা হলো তবু বিস্ফোরক নাইট্রো সেলুলোজের নাম দেওয়া হলো "গানকটন"।

পার্কসের এই আবিষ্কারের পর দেশে দেশে যথেষ্ট সাড়া পড়ে গিয়েছিল এবং বহু রসায়ন বিজ্ঞানী পার্কসের এই আবিষ্কারকে নিয়ে মেতে উঠেছিলেন।

হায়াট ভ্রাতৃদ্বয়ও ছিলেন এই দলের। তাঁদের খাস কাজ ছিল সেলুলোজের সঙ্গে এটা ওটা মিশিয়ে দেখা। নাইট্রো সেলুলোজকে নিয়ে গবেষণা করতেন তাঁরা। পুরস্কারের কথা শোনার পর ভাবলেন তাঁরা, সেলুলোজ থেকে যদি বিস্ফোরক পদার্থ তৈরী হতে পারে তাহলে শক্ত ও মজবুত জিনিস কেন তৈরি করা যাবে না?

একদিন কী মনে হল তাঁদের! পার্কসের ঐ নাইট্রো সেলুলোজের সঙ্গে মিশিয়ে ফেললেন একটুখানি কর্পূর। ফলটা কী দাঁড়ায় দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরেই চোখে পড়ল, নাইট্রো সেলুলোজ রূপান্তরিত হয়ে গেল অর্ধ তরল এক ধরনের বিশেষ পদার্থে। একেবারে স্বচ্ছ সেই পদার্থ। মালিন্য নেই কোথাও এতটুকু। এবার ওকে কঠিনে রূপ দেওয়ার পালা। কিন্তু খুব বেশী বেগ পেতে হল না। অল্পায়াসেই তরলটাকে কঠিন করে নেওয়া গেল।

বেজায় খুশী হলেন হায়াট ভ্রাতৃদ্বয়। নিজ হাতে তৈরি করলেন একটা ছাঁচ। ঢালাই করার পর দেখলেন ভারি সুন্দর হয়েছে জিনিষটা। হাতির দাঁতের মত না হলেও বেশ শক্ত এবং মজবুত। বুঝতে পারলেন, ছাঁচে ঢালাই করলে সব রকমের জিনিসই তৈরি করা যেতে পারবে।

নাইট্রো সেলুলোজের সঙ্গে কর্পূর মেশানোর ফলে যে অর্ধ তরলটি পাওয়া গেল তাতে রঙ মিশিয়েও আনন্দিত হলেন। লাল, নীল, সবুজ, হলদে প্রভৃতি যে কোন রঙের জিনিস তৈরি করতে কোন বাধা নেই। হায়াট ভ্রাতৃদ্বয়ের এই

আবিষ্কার লুফে নিল শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি। পুরস্কার তো লাভ করলেনই, অধিকন্তু তাঁদেরই প্রচেষ্টায় শিল্পজগতে এল দারুণ এক সাড়া। মূল পদার্থ সেলুলোজ থেকে উৎপন্ন হল বলে এই বিশেষ পদার্থটির নাম হল সেলুলয়েড।

শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি নবাবিষ্কৃত সেলুলয়েডকে কাজে লাগিয়ে তৈরি করতে লাগল প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনীয় নানাবিধ জিনিসপত্র, কত ধরনের সৌখিন জিনিস, কত খেলনা, ইত্যাদি দামে সস্তা এবং দেখতে সুন্দর সেলুলয়েড দু'দিনেই জনচিত্ত জয় করে নিল।

এমন চমৎকার যে সেলুয়েড তারও একটা মস্ত বড় ত্রুটি ছিল। সে ত্রুটিটা হল, কোন প্রকারে আগুনের সংস্পর্শে এলেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠত। তাই যাঁরা সেলুলয়েড ব্যবহার করতেন তাঁদের যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হত।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু চুপ করে বসে রইলেন না। সেলুলয়েডের এই ত্রুটিটুকু দূর করতে হলেন বদ্ধপরিকর। কিন্তু হায়! কতদিন, কতমাস, শেষে কত বছর গড়িয়ে গেল তবুও কোন বিজ্ঞানী আবিষ্কার করতে পারলেন না অদাহ্য সেলুলয়েডকে।

বাধ্য হয়ে শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঐ দাহ্য সেলুলয়েডকে নিয়েই কাজ করতে হল। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে হায়াট ভ্রাতৃদ্বয় যে সেলুলয়েড তৈরী করেছিলেন সেই সেলুলয়েডের যুগই চলেছিল দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে। তারপর ইউরোপের মাথার উপর জ্বলে উঠল প্রথম বিশ্ব মহাসমরের আগুন। প্রথমে ধিকি ধিকি তার পরেই দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে সারা পৃথিবীটাকে গ্রাস করে নিল। চারদিকে গুলি-গোলা, বারুদ-বিস্ফোরক পদার্থ তৈরির ধুম পড়ে গেল। নিত্য নতুন সমরাস্ত্র এবং বিস্ফোরক প্রস্তুতির জন্য রাষ্ট্রগুলোও নিয়োগ করল হাজার হাজার বিজ্ঞানীকে। বেশীর ভাগ বিজ্ঞানীই পার্কসের তৈরি নাইট্রো সেলুলোজকে নিয়ে মেতে রইলেন। শেষে অবলীলাক্রমে এক বিজ্ঞানী একদিন তৈরি করে ফেললেন সেলুলোজ অ্যাসিটেট নামে সেলুলয়েডের সমগোত্রীয় এক ধরণের জিনিস—যা আগুনের স্পর্শে জ্বলে উঠল না! মানুষের বহুদিনের আশা পূর্ণ হল। বস্তুটির নাম রাখা হল সেলুলোজ অ্যাসিটেট প্লাস্টিক।

নাম থেকেই বোঝা যায় সেলুলোজের সঙ্গে অ্যাসেটিক অ্যাসিড মিশিয়ে সেলুলোজ অ্যাসিটেট প্লাস্টিক তৈরি হয়। অর্থাৎ সেলুলোজের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড মেশালে হয় নাইট্রো সেলুলোজ আর অ্যাসেটিক অ্যাসিড মেশালে হয় সেলুলোজ অ্যাসিটেট। সেলুলোজ অ্যাসিটেটকে কঠিনে রূপান্তরিত করলে যে বস্তুটি পাওয়া যায় তার নাম সেলুলোজ অ্যাসিটেট প্লাস্টিক বা সংক্ষেপে শুধু প্লাস্টিক। আজকের দিনে আমরা যে সব নিত্য ব্যবহার্য জিনিসপত্র ব্যবহার করছি—যেমন চিরুনী, বোতাম, ছাতার বাঁট, ফিতা, প্যাকেট, খেলনা, ফাউন্টেন পেন প্রভৃতি প্রায় সবগুলিই ঐ জাতীয় প্লাস্টিক। এরা আগুনের সংস্পর্শে এলে জ্বলে উঠে না। তবে যেখানে আগুন লাগে সেইখানটায় গলে যায়।

সেলুলোজ অ্যাসিটেট প্লাস্টিকও সম্পূর্ণ ত্রুটি মুক্ত নয়। ধীরে ধীরে ধরা পড়ে, ওরা বাতাস থেকে জলীয় বাষ্প শোষণ করে নেয় এবং কিছুদিন পরে

অব্যবহার্য হয়ে পড়ে। ফলে পুনরায় শুরু হয় গবেষণা। সর্বশেষে সেল্লোজের সঙ্গে অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং প্রোপিওনিক অ্যাসিড নামে দু'টি অ্যাসিড মিশিয়ে তৈরী করা হল সেল্লোজ অ্যাসিটেট প্রোপিওনেট প্লাস্টিক। এবার সত্য সত্যই ত্রুটি মুক্ত হল প্লাস্টিক। এই ত্রুটি মুক্ত প্লাস্টিককে কাজে লাগিয়ে তৈরী হচ্ছে বহু মূল্যবান জিনিস। তাদের মধ্যে সুন্দর ও সৌখীন দ্রব্য, রেডিও ক্যাবিনেট, টেলিফোন যন্ত্র প্রভৃতি প্রধান।

এই প্লাস্টিক আগুনের স্পর্শে এলে জলে না। অধিকন্তু এর কোন খারাপ গন্ধও নেই। যান্ত্রিক উপায়ে ওকে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুতে পরিণত করে খুব সুন্দর রেয়ন প্রস্তুত করা হচ্ছে। সত্য কথা বলতে কী, আজকাল রঙ বেরঙের প্লাস্টিক সূতায় বাজার এক রকম ছেয়ে গেছে!

আরও এক ধরণের প্লাস্টিক আছে। নাম তার সেলোফেন প্লাস্টিক। আমরা সেলোফেন প্লাস্টিক না বলে কেবলমাত্র সেলোফেন কথাটাই ব্যবহার করে থাকি এবং এক বিশেষ ধরণের পাতলা ও স্বচ্ছ কাগজকেই বুঝে থাকি। মজবুত এবং নমনীয়, হঠাৎ ছিঁড়ে ফেলা যায় না, দেখতেও ভারি সুন্দর। দোকানের যে কোন চক্চকে ও স্বচ্ছ প্যাকেট ঐ সেলোফেন কাগজ দিয়েই তৈরী! তাছাড়া অন্যান্য কাজেও সেলোফেনকে ব্যবহার করা হয়।

সেলোফেনও হচ্ছে সেল্লোজ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তূলোর আঁশকে প্রথমে কস্টিক সোডার সঙ্গে বিক্রিয়া করিয়ে ক্ষারীয় সেল্লোজ উৎপাদন করা হয়। তারপর তার সঙ্গে মেশানো হয় কার্বন-ডাই-সালফাইড। এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় সেলুলোজ জ্যান্থেট নামে একটি যৌগিক পদার্থ। পরিস্রাবণ পদ্ধতিতে সেল্লোজ জ্যান্থেট পৃথক করে এবং ওকে সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে চালনা করে অতি দ্রুত অ্যামোনিয়াম সালফেট ও সালফিউরিক অ্যাসিড মিশ্রিত একটি পাত্রের মধ্যে ঢালা হয়। সর্বশেষে পদার্থটিকে সালফার মুক্ত করিয়ে গ্লিসারলপূর্ণ পাত্রের মধ্যে চালনা করা হয়। গ্লিসারল শোষণ করে নেওয়ার পর বস্তুটি হয়ে উঠে সুন্দর ও নমনীয়। তারপর রজন, মোম প্রভৃতি মিশিয়ে চমৎকার সেলোফেনে রূপান্তরিত করা হয়।

✪ কৃত্রিম রেশম ✪

রেশমের কাপড় আমরা কে না ভালবাসি! কিন্তু এই রেশম পাওয়া যায় গুটিপোকার কাছ থেকে। ঝামেলাও অনেকখানি। গুটিপোকার চাষ করতে হয়, তাদের খাওয়ার জন্য আবার চাষ করতে হয় তুঁত গাছ, রোগ আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য গ্রহণ করতে হয় বিশেষ সুব্যবস্থা, ইত্যাদি। তার উপর আছে রেশম সংগ্রহ করা এবং রেশম থেকে সূতা তৈরীর করার ঝামেলা।

সেল্লোজ থেকে কৃত্রিম তন্তু প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কারের পর রসায়ন বিজ্ঞানীরা রেশমের দিকে নজর দেন। তাঁদের যেন ধারণা হয়, এত প্রাকৃতিক জিনিসকে

যখন রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত করা যাচ্ছে তখন রেশমকেই বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করা যাবে না কেন ?

অনেক বিজ্ঞানী এগিয়ে এসেছিলেন এ বিষয়ে গবেষণা করতে এবং বহু শিল্প প্রতিষ্ঠানও লোক নিয়োগ করেছিল। শেষে বহুজনের বহু গবেষণার ফলকে কেন্দ্র করে একদিন প্রস্তুত হয়েছিল নকল রেশম—যা স্বাভাবিক রেশম অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নয়। বরং দেখা গেছে, রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রাপ্ত রেশম, গুটিপোকা থেকে সংগ্রহ করা রেশম অপেক্ষা বেশ কিছুটা উন্নত। শিল্পের পরিভাষায় নকল রেশমকে বলা হল রেয়ন।

রেয়ন বা নকল রেশম তৈরী করার মূল উপাদান সর্বক্ষেত্রে এক নয়। তবে সর্বক্ষেত্রে কাঁচা মাল হিসাবে সেলুলোজকেই ব্যবহার করা হয়। এই সেলুলোজ আবার পাওয়া যায় তুলো, পাট, বাঁশ, কাঠ ইত্যাদি থেকে। কাঠ সবচেয়ে সহজ লভ্য বলে এখানে কাঠ থেকে সেলুলোজ এবং সেলুলোজ থেকে রেয়ন প্রস্তুতির নীতি বর্ণনা করা হল।

প্রথমে কাঁচা কাঠকে কেটে টুকরো টুকরো করে নেওয়া হয়। সেই কাঠের টুকরোগুলোর গায়ে যাতে ছাল লেগে না থাকে সেজন্য তাদের কয়েকদিন ধরে জলে ভিজিয়ে রাখতে হয়। তার ফলে ছালগুলো পচে গিয়ে আপনা হতেই খসে পড়ে, নয়ত অতি অল্পায়াসে পৃথক করা যায়।

ছাল ছাড়ানো কাঠের টুকরোগুলোকে এবার আরও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করা হয়। তারপর কাঠের মধ্যে রেজিন প্রভৃতি যে অপদ্রব্যগুলো থাকে সেগুলোকে পৃথক করার জন্য বিশেষ কয়েকটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্য নিতে হয়। পরিশেষে কাঠের টুকরোগুলো আরও গুঁড়া করে কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ যোগ করে ভালভাবে ফুটানো হয়। তখন দূর হয়ে যায় সমস্ত অপদ্রব্য, আর কাঠের গুঁড়োগুলো হয়ে যায় এক রকম মণ্ডের মত।

ভাবছো, এবার বুঝি সেলুলোজ তৈরী হয়ে গেল।

না, সেলুলোজ তৈরী করতে হলে ঐ কাঠের মণ্ডটাকে আবার ফুটাতে হয় এবং কতকগুলো রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে গ্রহণ করতে হয়। সে প্রক্রিয়াগুলো অনাবশ্যক বোধে আলোচনা করা হল না।

উপরে বর্ণিত উপায়ে যে সেলুলোজটা পাওয়া গেল তা কিন্তু বিশুদ্ধ নয়। বিশুদ্ধ সেলুলোজ পেতে হলে ঐ সেলুলোজকে প্রথমে গরম বাষ্পের সংস্পর্শে রেখে ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হয়। তারপর মেসিনের সাহায্যে মিহি গুঁড়ায় পরিণত করা হয়। সর্বশেষে সেই গুঁড়াকে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় কস্টিক সোডার দ্রবণের সঙ্গে ক্রিয়া করালে পাওয়া যায় বিশুদ্ধ সেলুলোজ।

পুনরায় গুঁড়া করা হয় সেই সেলুলোজকে। এবং খোলা জায়গায় ফেলে রাখা হয় বেশ কয়েক ঘণ্টা। ধীরে ধীরে সেলুলোজের রঙটা হয়ে উঠে ধব্ধবে সাদা। এতক্ষণে সেলুলোজটা নকল রেশম তৈরীর উপযোগী হয়।

রেশম তৈরীর প্রথম ধাপে তৈরী করা হয় সেলুলোজ জ্যানথেট। এটি থক্‌থকে সাদা জেলির মত পদার্থ। প্রস্তুত করা হয় বিশুদ্ধ সেলুলোজের গুঁড়ার সঙ্গে

কার্বন-ডাই-সালফাইড মিশিয়ে। সেলুলোজ জ্যানথেট তৈরী হওয়ার পর তাকে জলের সঙ্গে মিশিয়ে প্রবলভাবে আলোড়িত করা হয়। এবার উৎপন্ন হয় আর একটি জিনিস—নাম তার ভিসকোজ।

এই ভিসকোজেও থাকে অশুদ্ধি। বিশেষত কিছু সালফার অবশ্যই মিশে যায়। অশুদ্ধিগুলিকে পরপর কয়েকটি প্রক্রিয়ায় দূর করা হয় এবং কয়েকদিন ধরে খোলা জায়গায় ফেলে রাখা হয়। ভিসকোজের মধ্যে কোন গ্যাস কিংবা বাতাস যাতে মিশে থাকতে না পারে সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখা হয়।

প্রকৃতপক্ষে ভিসকোজ থেকেই তৈরী হয় নকল রেশম। প্রথমে ভিসকোজকে পুরে দেওয়া হয় একটা ধাতব নলের মধ্যে। নলটির তলায় থাকে কয়েকটা অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র। ছিদ্র মুখটা আবার ডোবানো থাকে পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণের মধ্যে। নলের উপরে চাপ দিলে ভিসকোজ ছিদ্রপথে চালিত হয়ে সরু সূতার আকার প্রাপ্ত হয় এবং তৎক্ষণাৎ সালফিউরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে এসে শক্ত হয়ে পড়ে।

সূতো প্রস্তুত হওয়ার পরেও ওকে বিশুদ্ধ করে নিতে হয়। কারণটা অবশ্য অন্য কিছু নয়। অ্যাসিডের মধ্যে চালনা করতে হয় বলে কিছু অ্যাসিড সূতার সঙ্গে লেগে থাকে। সেই অ্যাসিডকে দূর করার জন্য সূতাকে জল ঢেলে ভাল করে ধুয়ে নেওয়া হয় এবং ঘূর্ণায়মান বাক্সের মধ্যে জড়িয়ে সূতার কুণ্ডলী প্রস্তুত করা হয়। সূতাগুলো ভিজে অবস্থায় থাকে। সেই কারণে গরম চুল্লীর উপর রেখে শুকিয়ে নেওয়া হয়। সর্বশেষে ব্লিচিং মেসিনে পাঠিয়ে বিরঞ্জন করা হয়।

এত কাণ্ড করার পরও সূতোর মধ্যে অশুদ্ধি হিসাবে অলপ স্বলপ গন্ধক থেকে যায়। সূতাকে গন্ধক মুক্ত করার জন্য সোডিয়াম সালফাইডের দ্রবণ সূতার উপর স্প্রে করা হয়। স্প্রে করার ফলে গন্ধক দূরীভূত হয় বটে কিন্তু আর একটি নতুন দোষ প্রকাশ পায়। সেটি হচ্ছে, সূতার ক্ষারীয় ধর্ম। তাকেও নষ্ট করা হয় তরল অ্যাসেটিক অ্যাসিড সূতার উপর ঝরিয়ে।

এতক্ষণে সর্বপ্রকার ত্রুটি মুক্ত হয় সূতা। পরিশেষে ভাল করে সাবান জলে ধুয়ে নিয়ে এবং গরম চুল্লীতে শুকিয়ে নিয়ে কারখানায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে মেসিনের সাহায্যে সূতাকে পাকিয়ে বস্ত্র বয়নের উপযোগী করা হয়।

✪ পলিথিন ও টেরিলিন ✪

মানব সভ্যতার অগ্রগতিতে জৈব রসায়নের ভূমিকা অনেকখানি। দীর্ঘকাল ধরে বহু প্রতিভা নিয়োজিত হয়ে আসছে এই জৈব রসায়নের পেছনে এবং আবিষ্কৃত হয়েছে প্রায় অবিশ্বাস্য এমন বহু তথ্য। কার্বন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন প্রভৃতিমাত্র কয়েকটি মৌলিক পদার্থের সংযোগে মানুষ প্রস্তুত করেছে কত হাজার হাজার এমন কি কত লক্ষ লক্ষ জৈব পদার্থ। সত্য বলতে কী, মানুষের প্রাচীন ধারণা একেবারে ওলট পালট করে দিয়েছে জৈব রসায়ন সম্বন্ধে

গবেষণা। এক কালের চিন্তাধারা অর্থাৎ "মানুষ কৃত্রিম উপায়ে প্রকৃতি জাত জিনিস তৈরি করতে পারে না" বহু আগে পরিত্যক্ত হয়েছে। বর্তমানে এমন এক অবস্থা এসেছে, কোন বস্তুকেই প্রকৃতি জাত বলে চিহ্নিত করার উপায় নাই। যে দু'একটা জিনিস মানুষ আজও তৈরি করতে সক্ষম হয়নি, সেগুলো যে ভবিষ্যতে তৈরি হবে না এমন কথা আর্দৌ বলা যাবে না। বরং মানুষের বদ্ধমূল ধারণা, কৃত্রিম উপায়ে একদিন না একদিন সে জীব কোষও তৈরি করতে পারবে।

তুলা, রেশম, পাট প্রভৃতি নিঃসন্দেহে প্রকৃতি জাত পদার্থ। এক সময় মানুষের বস্ত্রের চাহিদা মেটাতো ঐ বস্তুগুলি। কিন্তু আজ দেখা যাচ্ছে, তুলা ও রেশমের স্থান দখল করেছে কৃত্রিম তন্তু। আরও দেখা যাচ্ছে, প্রাকৃতিক তন্তু অপেক্ষা কৃত্রিম তন্তু অনেক বেশী টেকসই ও সুন্দর। তাই বোধ হয় রেয়ন. নাইলন, টেরিলিন আজ বস্ত্র জগতে যুগান্তর এনেছে। এদের মধ্যে আবার টেরিলিনের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে উত্তরোত্তর। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রায় সব দেশে টেরিলিন তৈরির কারখানা গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে কিন্তু এর উৎপাদনের পরিমান আশানুরূপ নয়। তবে যেভাবে টেরিলিনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে, তাতে ভবিষ্যতে উৎপাদনের পরিমাণ যে বাড়বে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

টেরিলিনকে ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়। ইংলণ্ডের লোকেরাই বলে টেরিলিন। আমাদের দেশ ইংলণ্ডের দেওয়া নামকেই বহাল রেখেছে। আমেরিকায় টেরিলিনকে বলে টেরন, কখনও বলে ডেক্রন। ফ্রান্সের লোকেরা বলে তারগাল, জার্মানীতে ত্রেভিরা, রাশিয়ায় ল্যাৎসন এবং জাপানে বলে তোরেতেতোরান। অন্যান্য দেশেও আছে কত হরেক রকমের নাম।

টেরিলিন প্রস্তুত করা হয় সম্পূর্ণ অজৈব উপাদান থেকে। রেয়ন তৈরির জন্য উদ্ভিদের দেহোপাদান সেলুলোজই প্রয়োজন হয়। তাছাড়া অন্য উপায়ও আছে। কিন্তু টেরিলিনের জন্য প্রয়োজন হয় একমাত্র পলিএস্টার নামে বহু যৌগিক পদার্থ। 'পলি' কথাটার অর্থ হচ্ছে 'বহু'। এস্টারকে রাসায়নিক ভাবে পুনঃ পুনঃ সংযোজন করে গঠন করা হয় পলিএস্টার।

অবশ্য এস্টার অনেক ধরনের হয়ে থাকে। টেরিলিন তৈরির জন্যে যে এস্টারটির দরকার হয় সেটিকে বলে ইথিলিন টেরপথ্যালেট এস্টার।

এস্টার সম্বন্ধেও একটু বলার আছে। এস্টার সাধারনতঃ জৈব কিংবা অজৈব অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের ক্রিয়ায় উৎপন্ন যৌগিক পদার্থ। যেমন ধরা যেতে পারে, ইথাইল অ্যালকোহল ও অ্যাসেটিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় ইথাইল অ্যাসিটেট নামে একটি এস্টার। জৈব অ্যাসিডের সংখ্যাও যেমন প্রচুর, অ্যালকোহলের সংখ্যাও তেমনই। তাই বিভিন্ন অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের ক্রিয়ায় হরেক রকমের এস্টার তৈরি করা যায়।

সব এস্টার তাই যৌগিক পদার্থ এবং এদের নিজস্ব একটা গন্ধ থেকে চেনা যায়। আরও একটা মজার কথা, সম্পূর্ণভাবে রাসায়নিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত

হওয়া সত্ত্বেও এস্টারদের নিজস্ব একটা সুগন্ধ আছে এবং সে সুগন্ধটা অনেক ক্ষেত্রে কাঁচা বা পাকা ফলের গন্ধ। যেমন, কোন এস্টারের গন্ধ পাকা কলার মত, কোনটির পাকা আনারসের মত, কোনটি কাঁচা আমের মত, কোনটিতে বা চকোলেটের গন্ধ পাওয়া যায়। আজকাল বাজারে যে সব চকোলেট এবং গন্ধ দ্রব্যের প্রতি আমরা আকৃষ্ট হই তাদের অধিকাংশের মূলেই আছে এস্টার।

এবার আসা যাক পলিমারের কথায়। পলিমার হচ্ছে বহু যৌগিক পদার্থ। যখন কোন বিশেষ রাসায়নিক এককের পুনঃ পুনঃ সংযোগের ফলে একটা বৃহৎ অণুর সৃষ্টি করা যায় তখনই বলা হয় পলিমার।

উদাহরণ স্বরূপ পলিথিনের কথা ধরা যেতে পারে। পলিথিন হচ্ছে, দুটি কারবন পরমাণু এবং চারটে হাইড্রোজেন পরমাণুর একক (C_2H_4), পুনঃ পুনঃ সংযোগের ফলে উৎপন্ন বৃহত্তম আণবিক ওজনের এক অতিকায় কার্বন ও হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত অণু। অবশ্য এই বিক্রিয়াটি ৩০ থেকে ৪০ বায়ুমণ্ডল চাপে উত্তপ্ত ক্রোমিক অক্সাইড নামক প্রভাবকের উপস্থিতিতে এবং ১২০° সেণ্টিগ্রেড থেকে ১৫০° সেণ্টিগ্রেড উষ্ণতায় বহু সংখ্যক ইথিলিন অণু (C_2H_4) পর পর সংযুক্ত করে। উৎপন্ন পদার্থটি শেষে কঠিনে পরিণত হয়। ইথিলিন থেকে উৎপন্ন বলে নাম তার পলি ইথিলিন বা পলিথিন। ফরমূলাটি তখন হয় (C_2H_4) n। এখানে n একটি অজানা বৃহত্তম সংখ্যা।

এইভাবে যদি কোন এস্টারের অণুকে একক করে বারবার সংযোজন করা হয় তাহলে পরিশেষে উৎপন্ন হবে এক অতিকায় এস্টার অণু। তখন এই এস্টারকে বলা হবে পলিএস্টার। টেরিলিন প্রস্তুতির জন্য যে এস্টারটির প্রয়োজন হয় তার নাম ইথিলিন টেরিপথ্যালেট এস্টার। এস্টারটিকে প্রস্তুত করা হয় টেরো-পথ্যালিক অ্যাসিড ও ইথিলিন গ্লাইকলের বিক্রিয়ায়। ইথিলিন টেরিপথ্যালেট এস্টারের অণুকে অসংখ্য বার পুনরাবৃত্তি করলে উৎপন্ন হয় যে পলিএস্টারটি, সেইটির নাম টেরিলিন। এই হল টেরিলিন প্রস্তুতির গোড়ার কথা।

ইথিলিন টেরিপথ্যালেট এস্টার বা টেরিলিন তৈরী হওয়ার পর তাকে বিগলিত অবস্থায় রেয়নের মতই অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রের ভেতর দিয়ে পাঠিয়ে সূতার রূপ দেওয়া হয়।

আজকাল বাজারে রঙ বেরঙের টেরিলিনের কাপড় দেখা যায়। কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় যখন তন্তু প্রস্তুত করা হয় তখন তার কোন রঙ থাকে না। টেরিলিনের সূতাকে তাই রঙ করে নিতে হয়। কিন্তু ওকে রঙ করার অসুবিধা অনেক। তার প্রধান কারণ, টেরিলিনের অণুগুলো খুব ঠাসাঠাসিভাবে অবস্থান করে বলে ওতে কোন রঙ ধরে না। তূলোর ক্ষেত্রে কিন্তু আলাদা। তূলোর অণুর মধ্যে বেশ দূরত্ব থাকে। জলে ভিজলে সূতা ফুলে উঠে এবং রঙের অণুগুলোকে তার মধ্যে প্রবেশ করার জন্য জায়গা করে দেয়।

বিজ্ঞানীরা এই সমস্যারও সমাধান করেছেন। রঙ করার যে কয়েকটা উপায় আছে তাদের একটি হচ্ছে, টেরিলিনের তন্তুর উপর কোন রঙের প্রলেপ লাগিয়ে উত্তপ্ত করা। তখন রঙের অণুগুলো টেরিলিনের তন্তুর মধ্যে ঢুকে পড়ে এবং

সহজে বেরুতে পারে না। সেই জন্য তুলোর তন্তু অপেক্ষা টেরিলিন তন্তুর রঙ পাকা।

টেরিলিন তন্তুকে প্যাকিং করে এবার পাঠান হয় মেসিনে। সেখানে যন্ত্রের দ্বারা পাকিয়ে সূতা তৈরি করা হয়। তারপর সেই সূতা দিয়ে তৈরি করা হয় কাপড়।

তুলাজাত সূতার কাপড় অপেক্ষা টেরিলিনের কাপড়ের গুণ অনেক। টেরিলিনের প্রধান গুণ হচ্ছে, ও সহজে ভাঁজ পড়ে না। অল্প উত্তাপে ইস্ত্রি দিয়ে ভাঁজ ধরিয়ে দিলে ভাঁজ চিরদিনের জন্যে পাকা হয়ে যায়। ফুটন্ত জলে টেরিলিনের ক্ষতি হয় না বা আগুন লাগলে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে না। কেবল যে জায়গায় আগুন ধরে যায় সেই জায়গাটা গলে গিয়ে জমাট বেঁধে যায়। তাছাড়া টেরিলিন জল শোষণ করতে পারে না বলে শুকায়ও তাড়াতাড়ি। পোকামাকড় এবং ছত্রাক সূতোর কাপড়ের মত তত বেশি ক্ষতিও করতে পারে না। আজকাল সূতা, রেশম এবং উলের সঙ্গে টেরিলিন মিশিয়ে নানা জাতীয় কাপড় তৈরি করা হচ্ছে। সেসব কাপড়ের চাহিদাও কম নয়। এই জাতীয় মিশ্রিত সূতার কাপড়ের মধ্যে "টেরিন কটন" বা "টেরিকট" আমাদের কাছে খুবই পরিচিত। ওতে শতকরা ৫০ থেকে ৮০ ভাগ টেরিলিন এবং বাদ বাকী থাকে সূতা। এইভাবে টেরিলিন ও উলের মিশ্রণকে বলা হয় টেরিউল।

টেরিলিনের দোষও আছে। সবচেয়ে বড় দোষ হচ্ছে, এর দ্বারা অতি সহজে স্থির তড়িৎ উৎপন্ন হয় বলে ধূলা বালি আকৃষ্ট হয় এবং তাড়াতাড়ি ময়লা হয়ে উঠে।

কাপড় ছাড়াও অন্যান্য অনেক কাজে টেরিলিন ব্যবহার করা হচ্ছে। দড়ি, মাছ ধরার জাল, নৌকার পাল ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রায়ই টেরিলিনের ডাক পড়েছে।

কৃত্রিম তন্তু টেরিলিনের প্রয়োজনীয়তা এখন উপলব্ধি করেছে প্রতিটি দেশ। টেরিলিন অত্যন্ত টেকসই। একটা দেশের বস্ত্রের চাহিদা মেটাতে কত লক্ষ লক্ষ একর জমিতে তুলা চাষের প্রয়োজন! শুধু চাষ করলে হয় না, তার জন্য খরচ করতে হয় সার এবং কীটনাশক ওষুধ। আবার আছে জলসেচের ব্যবস্থা। কৃত্রিম তন্তু উৎপাদন করলে তুলো চাষের জমিতে খাদ্য শস্য চাষ করা যেতে পারে। এই কারণে কৃত্রিম তন্তুর ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল।

✪ ডিনামাইট ✪

এক ছিলেন রসায়ন বিজ্ঞানী। নাম তাঁর হেনরী ব্রেকনন্ট।

একদিন কী খেয়াল হল তাঁর! রসায়নাগারে এটা-ওটা মিশিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ চিনির সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে ফেললেন। সেটি ছিল ইংরাজী ১৮৩২ সাল। ব্রেকনন্ট আপন অজান্তেই প্রথম জন্মদান করলেন একটি বিস্ফোরক পদার্থকে।

অবশ্য এই আবিষ্কারের আগে মানুষ বিস্ফোরক পদার্থ হিসাবে বারুদকে বুঝত। কিন্তু বারুদে অগ্নি সংযোগ করলেই বিস্ফোরণ ঘটে। হেনরী ব্রেকনণ্ট যে জিনিসটি তৈরি করলেন সেটি আপনা হতেই বিস্ফোরণ ঘটাল। অগ্নি সংযোগের প্রয়োজন হল না। তরল পদার্থ নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে বিস্ফোরক তৈরি হতে পারে, এই প্রথম জানল মানুষ।

কথাটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে অপরাপর বিজ্ঞানীরাও বিস্ফোরক পদার্থের সন্ধান করতে লাগলেন। হেনরী ব্রেকনণ্টের আবিষ্কারের বছর ছ-সাত পরে 'ডুমাস' এবং 'পেলিউস' নামে দুজন বিজ্ঞানী আর একটি বিস্ফোরক তৈরি করে ফেললেন। তাঁরা তৈরি করছিলেন তুলা এবং কাগজের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড মিশিয়ে। এবারের বিস্ফোরকটিও পূর্বের অনুরূপ ছিল।

কিন্তু বিজ্ঞানীরা সন্তুষ্ট হতে পারলেন না। তাঁরা চাইলেন আরও তীব্র বিস্ফোরক পদার্থ তৈরি করতে। সে আশাও পূর্ণ হল। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে 'অ্যাস্কানি' ও 'সোব্রেরো' নামে দুজন বিজ্ঞানী বিস্ফোরক পদার্থের খোঁজ করতে গিয়ে দৈবক্রমে একদিন মিশিয়ে ফেললেন চিনি ও গ্লিসারিনের সঙ্গে নাইট্রিক অ্যাসিড। আর যায় কোথায়? সঙ্গে সঙ্গে ঘটল জোর বিস্ফোরণ। চমকে উঠলেন তাঁরা। এই বিস্ফোরণ পূর্বের সমূহ বিস্ফোরণের মাত্রাকে ছাড়িয়ে গেল।

গ্লিসারিন এবং নাইট্রিক অ্যাসিড থেকে জন্ম নিল বলে বিস্ফোরকটির নাম হল নাইট্রোগ্লিসারিন। প্রকৃতপক্ষে সেইদিনই ভয়াবহ বিস্ফোরককে করায়ত্ত করল মানুষ। নাইট্রোগ্লিসারিন এমন জিনিস—যাকে সামান্য একটু আঘাত করলেই বিস্ফোরণ সহকারে জ্বলে উঠে।

দেশে দেশে সাড়া পড়ে গেল। শত শত বিজ্ঞানী কাজ আরম্ভ করলেন নাইট্রোগ্লিসারিনকে নিয়ে। বিজ্ঞানীদের মধ্যে যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল। কে কতভাবে ধ্বংসাত্মক কাজে নিয়োগ করতে পারে নাইট্রোগ্লিসারিনকে! এই কাজ করতে গিয়ে কত বিজ্ঞানীকে হারাতে হল প্রাণ, কত জনে হয়ে গেলেন পঙ্গু, তবুও তাঁরা পেছু হটলেন না। সৃষ্টির নেশায় সাক্ষাৎ মৃত্যুকেও পরোয়া করলেন না বিজ্ঞানীরা।

এবার এগিয়ে এলেন সুইজারল্যাণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ রসায়ন বিজ্ঞানী আলফ্রেড বার্নাড নোবেল। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল, নাইট্রোগ্লিসারিনকে নিরাপদে ব্যবহার করা। দীর্ঘদিন ধরে উপায় খুঁজছিলেন তিনি। শেষে তাঁর সাধনা বাস্তবে রূপায়িত হল। আবিষ্কৃত হ'ল ডিনামাইট।

পরীক্ষা করতে করতে একদিন টের পেলেন নোবেল "কাইজেলগার" নামে এক রকমের সচ্ছিদ্র মাটি নাইট্রোগ্লিসারিনকে শোষণ করতে পারে। নোবেল তখন কাইজেলগার দিয়ে নাইট্রোগ্লিসারিনকে শোষণ করালেন। সামান্য আঘাতে নাইট্রোগ্লিসারিন বিস্ফোরণ ঘটানোর ক্ষমতা হারাল। তারপর স্যার নোবেল নাইট্রোগ্লিসারিন যুক্ত কাইজেলগার দিয়ে তৈরি করলেন এক বিস্ফোরক। এর মধ্যে নাইট্রোগ্লিসারিনের ক্ষমতা পুরোপুরি অটুট থাকল অথচ ওকে নিরাপদে ব্যবহারও করা গেল। এইভাবে উৎপন্ন হল সে যুগের সবচেয়ে বিস্ফোরক

ডিনামাইট। কাইজেলগার শোষিত নাইট্রোগ্লিসারিন দ্বারা নির্মিত ডিনামাইটের নাম দিলেন নোবেল "গার ডিনামাইট"।

নোবেল কিন্তু গার ডিনামাইট প্রস্তুত করে ক্ষান্ত হলেন না। নাইট্রোগ্লিসারিনকে আরও নিরাপদে ব্যবহার করা যায় কিনা সেই চেষ্টাই করতে লাগলেন। তিনি দেখলেন, ভাল শোষক হলেই নাইট্রোগ্লিসারিনের নিরাপত্তা বেড়ে যায়। ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ভাল শোষক খুঁজতে।

তাঁর খোঁজাখুঁজি ব্যর্থ হলনা। একদিন হাতড়াতে হাতড়াতে পেয়ে গেলেন সোরাকে। দেখলেন তিনি, কাইজেলগারের চেয়ে সোরা উত্তম শোষক। তার উপর সোরা উত্তম জারকও বটে। সোরাতে থাকে পর্যাপ্ত অক্সিজেন। বিস্ফোরণ ঘটলে তার সঙ্গে অক্সিজেন যুক্ত হয়ে বিস্ফোরণের ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দেয়।

নোবেল এবার তৈরি করতে লাগলেন নানা ধরণের ডিনামাইট। নাইট্রোগ্লিসারিনের পরিমাণ বাড়িয়ে কিংবা কমিয়ে উচ্চশক্তিসম্পন্ন এবং নিম্নশক্তিসম্পন্ন উভয় প্রকার ডিনামাইট তৈরি হল মানুষের ভিন্ন ভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য।

নোবেলের পরীক্ষা কিন্তু এইখানে থেমে গেল না। একদিন প্রস্তুত করলেন অ্যামোনিয়া ডিনামাইট। এই ডিনামাইটের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য হল, এর আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা অনেক বেশি এবং আগুন লাগার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরন ঘটে না। অপরাপর ডিনামাইট অপেক্ষা অ্যামোনিয়া ডিনামাইট হল অনেক বেশি নিরাপদ।

এত বিভিন্ন প্রকার ডিনামাইট প্রস্তুত করা সত্ত্বেও নোবেল তাঁর গবেষণা অব্যাহত রাখলেন। পরীক্ষা করতে করতে একদিন আকস্মিক ভাবে আবিষ্কার করলেন জিলাটিন ডিনামাইট। প্রকৃতপক্ষে এই ডিনামাইটই সবার সেরা।

জিলাটিন ডিনামাইট আবিষ্কারের কাহিনীটি নিম্নরূপ ঃ—

একদিন আপন রসায়নাগারে কাজ করছিলেন নোবেল। দৈবক্রমে কাচের টুকরো লেগে তাঁর ডান হাতের কড়ে আঙুলটা একটু কেটে গেল। বিস্ফোরক পদার্থ নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে বলে কাটা অংশটার উপর একটা আস্তরণ দিয়ে ভাল ভাবে ঢেকে দেওয়ার জন্য লাগিয়ে দিলেন কলয়ডিয়ন।

(সেলুলোজকে সালফিউরিক অ্যাসিড ও নাইট্রিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটালে গান কটন তৈরি হয় এবং গান কটনকে ইথার ও অ্যালকোহলের মিশ্রণে গলিয়ে নিলে প্রস্তুত হয় কলয়ডিয়ন)

নোবেল আঙুলে কলয়ডিয়ন লাগিয়ে পুনরায় কাজে মন দিলেন। যে পরীক্ষাধীন বস্তুটিকে নিয়ে কাজ করছিলেন তারই সঙ্গে সংমিশ্রণ হল কলয়ডিয়নের। পরীক্ষাধীন বস্তুটির সঙ্গে নাইট্রোগ্লিসারিনও ছিল। অল্প পরে বুঝতে পারলেন নোবেল, দৈবক্রমে যে জিনিসটি তিনি পেয়ে গেলেন তার বিস্ফোরণ ক্ষমতা যেকোনও ডিনামাইটের চেয়ে বেশি। এই বিস্ফোরকটির নাম হল বিস্ফোরক জিলেটিন।

নোবেল এবার তৈরি করলেন জিলেটিন ডিনামাইট। নিজেই বিস্মিত হলেন জিলেটিন ডিনামাইটের বিস্ফোরণ ক্ষমতা দেখে। অপর দিকে দেখা গেল, এই ডিনামাইটের সুবিধা অনেক বেশি। জলে ভিজে গেলে নষ্ট হয় না, মাটির ভেতরে

গর্ত করে ঢুকিয়ে দিয়েও বিস্ফোরণ ঘটানো যায় এবং বহন করাও অনেক বেশি নিরাপদ। এতদিনে নোবেলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। তিনি যেমনটি চেয়েছিলেন, ঠিক সেই মতই প্রস্তুত হল ডিনামাইট।

স্যার আলফ্রেড বার্নাড নোবেল নানা ধরণের ডিনামাইট তৈরি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিলেন। তাঁর সঞ্চিত অর্থের একটা মোটা অংশ তিনি দান করে গেছেন পৃথিবীর বিশিষ্ট আবিষ্কারকদের পুরস্কার প্রদানের জন্য। দাতার নামানুসারে পুরস্কারটির নাম নোবেল পুরস্কার। পুরস্কারের অঙ্কটা বেশ মোটা। অর্থাৎ পৃথিবীতে নোবেল পুরস্কারের মত মোটা অঙ্কের পুরস্কার দ্বিতীয় নেই।

নোবেল তাঁর উইলে বলে গেছেন, সেরা বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ছাড়াও অপর দুটি বিষয়ে এই পুরস্কার প্রদান করতে হবে। একটি বিশ্বের সেরা সাহিত্য কর্মের জন্য, অপরটি শান্তির জন্য।

নোবেল বোধ হয় বুঝতে পেরেছিলেন, ডিনামাইট আবিষ্কার করে তিনিই পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজের সূচনা করে গেলেন। তাই শান্তির জন্য একটি পুরস্কার।

আজকাল অবশ্য ডিনামাইটের চেয়ে লক্ষ লক্ষ গুণে ধ্বংসাত্মক জিনিস আবিষ্কৃত হয়েছে। সামান্য বিস্ফোরক নিয়ে আজ মানুষ মাথা ঘামাচ্ছে না। সে এখন পরমাণু শক্তিতে বলীয়ান। এসব আবিষ্কারের জন্য নোবেল দায়ী নন। তাছাড়া আবিষ্কারক তিনি। সমুদ্র মন্থনে অমৃতের সঙ্গে গরলও উঠেছিল। আবিষ্কারকদের কাছ থেকে আমরা কেমন করেই বা শুধু আশা করব কেবল মাত্র কল্যাণকর জিনিস!

প্রত্যেকটি জিনিসের যেমন একটা অন্ধকার দিক থাকে তেমন তার উজ্জ্বল দিকও থাকে। ডিনামাইটের উজ্জ্বল দিকটা আমাদের সচরাচর চোখে পড়ে না। অথচ পাহাড় কেটে তার ভেতর দিয়ে রাস্তা তৈরি করতে হলে ডিনামাইটের দরকার, নদী গর্ভ গভীর করে পুল তৈরি করতে হলে ডিনামাইট অপরিহার্য, তৈল অনুসন্ধান কাজেও প্রয়োজন হয় ডিনামাইটের। এইসব কাজ লোকজন দিয়ে করাতে হলে একদিকে যেমন প্রয়োজন হত দীর্ঘ সময়ের, অপর দিকে তেমনই দরকার হত প্রচুর অর্থের। সভ্যতার অগ্রগতিতে ডিনামাইটের এমনকি আণবিক বোমারও প্রয়োজন আছে।

এক কথায় কোন আবিষ্কারই অকল্যাণকর নয়। মানুষের স্বার্থবুদ্ধিই তার জন্য একমাত্র দায়ী। মাঝে মাঝে আমাদের শুভবুদ্ধি স্বার্থবুদ্ধির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে উঠে। মহান বিজ্ঞানীদের আজীবন সাধনার ফলকে আমরা নিয়োগ করি ধ্বংসাত্মক কর্মে। কল্যাণকররূপ চাপা পড়ে যায় এবং বিশ্বের মানুষের কাছে ভীতিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়। এগুলিকে বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগই বলা যেতে পারে।

✪ বারুদ ✪
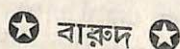
বারুদের কথা আমরা সবাই জানি। বন্দুকের টোটা, হাত বোমা, আতসবাজি

প্রভৃতির মূল উপাদান বারুদ। কিন্তু এই বারুদ যে কবে এবং কীভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল সে কথা বলা বড় শক্ত।

শোনা যায়, প্রথম বারুদ নাকি চীনারা তৈরি করেছিলেন। খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় সাড়ে চারশ বছর আগে গ্রীকরা বারুদ জাতীয় যে জিনিসটি ব্যবহার করতেন তার উপাদান ছিল পিচ, গন্ধক ও পোড়াচূণ। এইগুলোকে ভালভাবে গুঁড়া করে বিভিন্ন অনুপাতে মেশানো হতো। তবে সে বারুদ যে কেমন ছিল এবং কোন্ কোন্ কাজে ব্যবহার করা হত তা আজ সঠিক করে বলা যায় না।

অনেকে মনে করেন বাইজেনটাইনরাই প্রথম প্রকৃত বারুদকে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। সে সময়টা ছিল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি। আরও মনে করা হয়, বাইজেনটাইনদের তৈরি বারুদের মূল উপাদান ছিল সোরা। অবশ্য এই সোরা এখনও বারুদের উপাদানগুলির মধ্যে অন্যতম। তবে এসব শুধু অনুমান মাত্র। তাঁরা প্রকৃত বারুদের মত জিনিস প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছিলেন কিনা এবং সে বারুদে সোরা ছাড়া অন্যান্য কোন্ কোন্ জিনিস মেশান হত তা একেবারেই অজ্ঞাত। প্রকৃতপক্ষে বারুদের বর্ণনা করেন ১২৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোজার বেকন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। বারুদের ব্যবহার তখনও হয়নি। জ্ঞানী গুণীদের মতে ১৩২৮ খ্রীষ্টাব্দে বারথোল্ড সোয়ার্জই প্রথম বারুদ আবিষ্কার করেন এবং তাঁরই সময় থেকে বারুদের ব্যবহার প্রচলিত হয়।

বারুদ বিস্ফোরক পদার্থ। এর উপাদানগুলির মধ্যে আছে সোরা, গন্ধক এবং কাঠ কয়লা। বারথোল্ড সোয়ার্জের আবিষ্কারের প্রায় বিশ বছর পরে কামান বন্দুকের গুলি ছোঁড়ার কাজে ব্যবহার করা হয় বারুদকে। সেই থেকে যুদ্ধের কাজে বারুদ হয়ে উঠে অপরিহার্য এবং যুদ্ধক্ষেত্র থেকে তরবারি, বর্শা, কুঠার প্রভৃতি অস্ত্রগুলির বিদায় আসন্ন হয়ে উঠে।

কিন্তু বারুদের প্রাথমিক অবস্থায় ব্যবহারের ভয়ানক অসুবিধা ছিল। সে সময় যে বারুদ তৈরি হত, তা গুঁড়া ছিল না। শক্ত শক্ত ডেলার আকারে থাকত। তাই সেই বারুদকে ভালভাবে চেপে বন্দুক কামানের নলের মুখে পোরা যেত না। আবার সে সময় বন্দুক ও কামানের উন্নতিও হয়নি বা আজকের দিনের মত টোটাও তৈরি হয়নি। বন্দুকধারীকে একবার গুলি ছোঁড়ার পর বেশ কিছুক্ষণ ধরে নলের মধ্যে বারুদ পুরতে হত। কামানের নল বেশ মোটা থাকার জন্য সুবিধে হত বেশী কিন্তু বারুদ খরচ হত বস্তার পর বস্তা। অনেক পরে গুঁড়া করার যন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় বারুদ ব্যবহারের সুবিধে হয় এবং বন্দুক কামানেরও উন্নতি হয়।

প্রথমে বলা হয়েছে, বারুদ একটি বিস্ফোরক পদার্থ। বিস্ফোরণ ঘটার একমাত্র কারণ হচ্ছে, দ্রুত জারণ ক্রিয়া। জারণ ক্রিয়ার অর্থ যদিও ব্যাপক তবুও মোটামুটি যা বোঝায়, তা হল অক্সিজেনের সংযোগ ঘটা। অক্সিজেন অত্যন্ত সক্রিয় মৌলিক পদার্থ। কতকগুলো নিষ্ক্রিয় গ্যাস ছাড়া আর প্রায় সব মৌলিক পদার্থের সঙ্গে সে ক্রিয়া করতে পারে। তবে এই ক্রিয়া কারও সঙ্গে হয় অতি দ্রুত আর কারও সঙ্গে অতি মন্থর। আবার এমন কতকগুলো পদার্থ আছে, যাদের সঙ্গে অক্সিজেন চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই যুক্ত হয়ে যেতে পারে। তেমন

ভাবে যুক্ত হলেই বিস্ফোরণের সৃষ্টি হয়।

ধরা যাক, একগাদা কয়লার ডেলা খোলা জায়গায় পড়ে আছে। কয়লা অক্সিজেনের সঙ্গে ক্রিয়া করে এবং আশেপাশে বাতাসেও আছে অক্সিজেন। কিন্তু অক্সিজেন কয়লার সঙ্গে ভালভাবে ক্রিয়া করতে পারছে না বলে আমাদের চোখে কোন পরিবর্তন ধরা পড়ছে না। এবার কয়লার ডেলাকে একটু ভেঙ্গে আগুনে গরম করলে অক্সিজেনের সংযোগ দ্রুত হবে এবং আমরা তাপ ও আলো উভয়ই লাভ করব। পরিশেষে সেই কয়লাকে অতি মিহি গুঁড়ায় পরিণত করে অক্সিজেনের পরিবেশে যদি উত্তপ্ত করা হয় তাহলে বিস্ফোরণ ঘটবে।

উপরোক্ত প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করলে ভালভাবে বুঝতে পারা যায়, কয়লার আকার যখন খুব বড় ছিল তখন অক্সিজেন কয়লার অণুর সঙ্গে ঠিকমত মিশতে পারছিল না। সেই কয়লাকে যখন মিহি গুঁড়ায় পরিণত করে অক্সিজেনের পরিবেশে রাখা হল তখন গুঁড়ার চারপাশে অক্সিজেন অতি দ্রুত জারণ ক্রিয়া সম্পন্ন করল।

এবার বোঝা গেল, কয়লার গুঁড়াকে অক্সিজেনের সংস্পর্শে রাখলে বিস্ফোরণ ঘটবে। কিন্তু যেখানে সেখানে বিস্ফোরণ ঘটাতে গেলে কোথায় পাওয়া যাবে অক্সিজেনের পরিবেশ?

পণ্ডিতেরা অনুমান করলেন, কয়লার সঙ্গে এমন একটা জিনিস মিশিয়ে দিতে হবে, যাকে গরম করলে আপনা হতেই পাওয়া যাবে প্রচুর অক্সিজেন। তেমন জিনিস খুঁজতে গিয়ে তাঁরা হাতের কাছে পেলেন সোরাকে। সোরার মধ্যে থাকে পটাসিয়াম, নাইট্রোজেন এবং প্রচুর অক্সিজেন। তাপ পেলে সোরা ভেঙ্গে গিয়ে উৎপন্ন করে পর্যাপ্ত অক্সিজেন—যা কয়লার গুঁড়ার সঙ্গে ক্রিয়া করে পলকের মধ্যে বিস্ফোরণ ঘটায়।

বারুদ প্রস্তুতির প্রাথমিক যুগে সোরা এবং কাঠ কয়লার মিশ্রণকেই বলা হত বারুদ। ঐ বারুদের ব্যবহার এখনও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত আছে। যার নাম কালো বারুদ বা ব্ল্যাক পাউডার।

বারুদ কঠিন পদার্থ। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে সেটি উচ্চ চাপের গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যায়। তখন সেই গ্যাস আশেপাশের বাতাসকে জোরে ধাক্কা দেয় এবং বাতাসে কতকগুলো ঘনীভূত ও তনীভূত স্তরের সৃষ্টি হয়। তারপর সেই স্তরগুলো তরঙ্গের আকারে এগিয়ে যায় দূরে। বিস্ফোরণ অতি দ্রুত হলে তরঙ্গের বেগ দ্রুত হয় এবং ধ্বংস করার ক্ষমতা লাভ করে। তরঙ্গের বেগ অপেক্ষাকৃত কম হলে ধ্বংস করার চেয়ে জোরে ধাক্কা দেওয়ার ক্ষমতাই লাভ করে বেশী।

বন্দুক ও কামানে যে বারুদ ব্যবহার করা হয় তার কার্যপ্রণালী হচ্ছে, জোরে ধাক্কা দিয়ে কতকগুলো ধাতব টুকরা বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ধাতব বলকে অতি দ্রুত ঠেলে দেওয়া। যাঁরা বন্দুক ছোঁড়েন, তাঁরা এ ব্যাপারটা ভাল করেই বোঝেন। বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলো ছোট ছোট সীসার বল সজোরে বেরিয়ে আসে।

প্রথম যখন কামান ও বন্দুক তৈরি হয়েছিল, তখন ওদের রেঞ্জ ছিল খুবই কম। তার প্রধান কারণ, ডেলা ডেলা বারুদ ব্যবহার করা হত সেদিন। আগুন ধরলে

বারুদের বহির্ভাগই কেবল জ্বলতে থাকত কিন্তু ভেতরে আগুন প্রবেশ করত পরে। ফলে অযথা বহু গ্যাস নষ্ট হয়ে যেত। এই অসুবিধা দূর করেন উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ক্যাপ্টেন টমাশ রডম্যান নামে জনৈক সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ। তিনি বারুদের ডেলার মধ্যে ছিদ্র করে দিয়ে ব্যবহারের প্রচলন করেন।

দীর্ঘকাল ধরে বারুদ কামান, বন্দুক প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রে এবং আতসবাজি প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে "মার্টিন ওয়েজেল" নামে এক বিজ্ঞানী ঘোষণা করলেন, বারুদকে শিল্পক্ষেত্রেও ব্যবহার করা যেতে পারে। ভূগর্ভ থেকে ধাতব আকরিককে উত্তোলন করার কাজে তিনিই প্রথম বারুদের সাহায্য নেন এবং সাফল্যও অর্জন করেন। রাস্তা তৈরির কাজেও একদিন বারুদের সাহায্য নেওয়া হত। এখন বারুদের চেয়ে ঢের বেশী শক্তিশালী বিস্ফোরক পদার্থ আবিষ্কৃত হওয়ার ফলে বারুদের ব্যবহার সীমিত হয়ে এসেছে।

✪ ক্লোরিন ও হ্যালোজেন পরিবারের অন্যান্য সভ্য ✪

ফ্লোরিন আবিষ্কারের ইতিহাস একটি বেদনাপূর্ণ ও করুণ কাহিনী। এই মৌলিক পদার্থটিকে আবিষ্কার করতে কত যে বিজ্ঞানী দীর্ঘকাল প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং কত বিজ্ঞানী যে অকালে প্রাণ হারিয়েছেন তার-ঠিক-ঠিকানা নেই। শোনা যায়, ইংলণ্ডের প্রতিভাধর বিজ্ঞানী ডেভিও অকালে লোকান্তরিত হয়েছেন ঐ ফ্লোরিনকে নিয়ে গবেষণার জন্য।

ফ্লোরিন একটি মৌলিক পদার্থ এবং সে হ্যালোজেন পরিবারের একজন সদস্য। হ্যালোজেন পরিবারে আছে মাত্র পাঁচটি মৌলিক পদার্থ। প্রথম সদস্য ফ্লোরিন। অন্যান্য সদস্যরা হচ্ছে ক্লোরিন, ব্রোমিন, আয়োডিন ও অ্যাস্টাটিন। সমুদ্র লবণ থেকে এদের পাওয়া যায় বলে নাম হয়েছে হ্যালোজেন। গ্রীক ভাষায় "হ্যালস" অর্থে "সমুদ্র" এবং "জেনাও" অর্থে "তৈরি করি" বোঝায়। তাই এই ধরণের নামকরণ।

পরিবারের প্রথম মৌলিক পদার্থটিই দীর্ঘকাল ধরে মানুষের কাছে অপরিচিত ছিল। ক্লোরিন, আয়োডিন এবং ব্রোমিনের পরিচয় অনেক আগেই জানতে পেরেছিল মানুষ। তবে ফ্লোরিনের যোগগুলি মানুষের অপরিচিত ছিল না।

আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে জার্মানীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন জর্জ অ্যাগ্রিকালো নামে এক ধাতুবিদ্যা বিশারদ। সে সময়ে ধাতু সম্বন্ধে এত গভীর জ্ঞান আর একজনেরও ছিল না। মানুষ তখনই তাঁকে সম্মানিত করেছিল "ধাতু-বিদ্যার জনক" এই আখ্যায় ভূষিত করে। আজও অবশ্য ধাতুবিদ্যার জনক বলতে জর্জ অ্যাগ্রিকালোকেই বোঝায়।

জর্জ অ্যাগ্রিকালোর একটা অভ্যাস ছিল। সে অভ্যাসটা হল, যেখানে যত রকমের পাথর, যত খনিজ পদার্থ পেতেন সবই সংগ্রহ করে রাখতেন এবং পরীক্ষা

করে দেখতেন সেগুলো মানুষের কোন প্রয়োজনে আসতে পারে কি না।

একবার তিনি এক অদ্ভুত ধরণের খনিজ পদার্থ পেলেন। অদ্ভুত এই কারণে যে, সেটি সামান্য উত্তাপ প্রয়োগ করতেই একেবারে গলে গেল—যা সাধারণতঃ কোন খনিজ পদার্থের বেলায় দেখা যায় না। বিস্মিত অ্যাগ্রিকালো বস্তুটির গলনশীলতার পরিচয় পেয়ে নাম রাখলেন "ফ্লোর"। ফ্লোর শব্দটি তিনি অবশ্য ল্যাটিন ভাষা থেকে গ্রহণ করেছিলেন—যার অর্থ হচ্ছে প্রবাহিত হওয়া। তবে এই খনিজটির নাম দীর্ঘকাল অটুট থাকল না। বিজ্ঞানীরা একটু রদ বদল করে নাম রাখলেন ফ্লোরস্পার।

এরপরে কেটে গেল কত কাল। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ন্যুরেমবার্গে আবির্ভূত হলেন এক শিল্পী। নাম তাঁর "শ্ভান হার্ট"। একদিন কী খেয়াল হল তাঁর! ফ্লোরস্পারের একটা টুকরাকে সালফিউরিক অ্যাসিডে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হল এক গ্যাস। গ্যাসটি শ্ভানহার্টের চশমায় লেগে কাচ দুটোকে ঘোলাটে করে দিল।

শ্ভানহার্ট শিল্পী ছিলেন, কিন্তু রসায়ন বিজ্ঞানী ছিলেন না। গ্যাসটার পরিচয় কী, কিংবা কী জন্য উৎপন্ন হল, সে কথা তাঁর মনে এল না। বিদ্যুতের মত একটা ধারণা তাঁর মাথায় এসে গেল, এই গ্যাসটিকে ব্যবহার করে কাচের গায়ে নক্সা করা যেতে পারে।

শিল্পী মানুষ। বসে গেলেন কাচের গায়ে ফুল কাটতে। তাঁর হাতে জন্ম নিল এক নতুন শিল্প—যার নাম এচিং। কাচের উপর নক্সা করতে ফ্লোরস্পারের ডাক পড়ল সর্বত্র। কিন্তু সেখান থেকে উৎপন্ন গ্যাসটির অবগুণ্ঠন মোচন করতে কেউ এগিয়ে এলেন না।

ধীরে ধীরে অতিক্রান্ত হয়ে গেল একশ'টি বছর। এল সুইডেনের বিখ্যাত বিজ্ঞানী "শীলের" কাল। একদিন শুভক্ষণে তাঁর দৃষ্টি পড়ল ফ্লোরস্পারের দ্বারা উৎপন্ন সেই অজ্ঞাত গ্যাসটির উপর। পূর্বোক্ত উপায়ে গ্যাসটিকে তৈরি করে জলে দ্রবীভূত করিয়ে দেখলেন, জলে অ্যাসিডের গুণ প্রকাশ পেল। কিন্তু গ্যাসটিকে কিছুতেই সনাক্ত করতে পারলেন না। শুধু ঘোষণা করলেন, অজ্ঞাত এই গ্যাসটির জলীয় দ্রবণ অ্যাসিড ধর্মী। জলীয় দ্রবণের নাম দিলেন ফ্লোরিক অ্যাসিড।

শীলের ঘোষণার পর এগিয়ে এলেন দলে দলে বিজ্ঞানী। কতজন কত রকমের সিদ্ধান্ত পোষণ করলেন, কিন্তু প্রকৃত তথ্য কেউ প্রদান করতে পারলেন না। কেবল মৌলটির নামকরণ করলেন ফ্লোরিয়াম।

বছর গড়িয়ে চলল। শীলের পর এল ডেভির কাল। ডেভিও বাদ পড়লেন না। লেগে গেলেন গ্যাসটিকে সনাক্ত করতে। কত পরীক্ষা নিরীক্ষা করলেন এবং উদঘাটন করলেন এক নতুন রহস্যের। সেদিনও পর্যন্ত মানুষের ধারণা ছিল অ্যাসিড মাত্রেই অক্সিজেনের যৌগিক অর্থাৎ প্রত্যেকটি অ্যাসিডে অক্সিজেন থাকবেই। "অক্সিজেন" এই নাম করণের পেছনেও আছে সেই উদ্দেশ্য। অক্সিজেন অর্থে অম্ল উৎপাদক।

ডেভি দেখলেন অজ্ঞাত গ্যাসটির জলীয় দ্রবণ অ্যাসিড ধর্মী হলেও তার মধ্যে অক্সিজেন নেই। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, হাইড্রো আয়োডিক অ্যাসিড প্রভৃতিতেও দেখা গেল অক্সিজেন নেই। ডেভির পরীক্ষা প্রমাণ করল, সব অ্যাসিডে অক্সিজেন নাও থাকতে পারে তবে হাইড্রোজেন থাকবেই। "অক্সিজেন" এই নাম করণটাই সেদিন ভ্রমাত্মক প্রমাণিত হল।

ডেভির আবিষ্কারের কিছুদিন পরে ফরাসী বিজ্ঞানী "আঁপেয়ার" বললেন, ফ্লোরিক অ্যাসিডে দুটি মাত্র মৌলিক পদার্থ আছে। একটি পূর্বকথিত হাইড্রোজেন, আর একটি নতুন মৌল—যার পরিচয় আজও মানুষ পায়নি। ডেভি এবং আঁপেয়ার এবার দুজনেই মেতে উঠলেন গবেষণায়। শেষে বুঝতে পারলেন, অজ্ঞাত এই গ্যাসটির সঙ্গে ক্লোরিনের সাদৃশ্য আছে। নামটা ঠিক করলেন দুজনেই। ফ্লোরস্পার থেকে পাওয়া যাচ্ছে মৌলটি, ক্লোরিনের সঙ্গেও আছে তার মিল। ফ্লোরস্পারের প্রথম অক্ষর "ফ্লো" ক্লোরিনের শেষ দু অক্ষর "রিন"—এই নিয়ে মৌলটির নাম হল "ফ্লোরিন"। তাছাড়া শীলের প্রদত্ত ফ্লোরিক অ্যাসিড এই নামটিও বদল করলেন। গ্যাসীয় অবস্থায় নাম রাখা হল হাইড্রোজেন ফ্লোরাইড এবং জলে দ্রবীভূত অবস্থায় নাম রাখা হল হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড।

এরপর একটানা ব্যর্থতার ইতিহাস। কত বিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন গ্যাসটিকে রসায়নাগারে প্রস্তুত করতে, কতজনে প্রচেষ্টা চালালেন ফ্লোরস্পার থেকে ফ্লোরিনকে বিচ্ছিন্ন করতে, কিন্তু কেউই সফল হতে পারলেন না। এই গ্যাসকে বিচ্ছিন্ন করতে দুটি পথ বেছে নিয়েছিলেন বিজ্ঞানীরা। একটা ফ্লোরস্পার থেকে; অপরটা হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড থেকে। ফ্লোরস্পারকে হরেক রকম পদার্থের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটাতে চেষ্টা করলেন, তারপর কেউ কেউ তড়িতের সাহায্যে বিশ্লেষণ করারও চেষ্টা করলেন কিন্তু কোন পদ্ধতিতেই ফ্লোরিনকে বিচ্ছিন্ন করতে পারলেন না।

শেষে দৃষ্টি দিলেন হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডের প্রতি। এই অ্যাসিড অত্যন্ত বিষাক্ত। তার উপর অ্যাসিড থেকে ফ্লোরিন বিচ্ছিন্ন করাটাও ভয়ানক বিপজ্জনক। কিন্তু কোন বিপদের ভয় করেন না বিজ্ঞানীরা। যতই ব্যর্থতা আসে, ততই তাঁদের রোখ চেপে যায়। শেষে প্রাণ হারাতে হয় অনেক বিজ্ঞানীকে। সবার নাম জানা নেই। তবে বেলজিয়ামের বিজ্ঞানী "ল্যুয়েট" এবং ফরাসী বিজ্ঞানী "নিকলে" যে ফ্লোরিনের শিকার হয়েছেন সে বিষয়ে সকলেই নিঃসন্দেহ। একদিন ডেভিও এই গ্যাসের খপ্পরে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। সেই থেকে তাঁর অসুস্থতা বেড়ে উঠে এবং মাত্র একান্ন বছর বয়সে পরলোক গমন করেন।

প্রাথমিক পর্যায়ে ফ্লোরস্পারকে তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে যখন বিজ্ঞানীরা ব্যর্থ হলেন তখন অন্য কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ফ্লোরিন তৈরি করা যায় কিনা সেই চেষ্টাই চলতে লাগল।

প্রথম প্রচেষ্টা চালালেন "এইমে" নামে এক রসায়ন বিজ্ঞানী। তিনি সিলভার ফ্লোরাইডের সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় ফ্লোরিন তৈরির চেষ্টা করলেন। এই পদ্ধতিতে ফ্লোরিন প্রস্তুত হল ঠিকই, কিন্তু উদ্ভুত ফ্লোরিন পাত্রের রবার কর্কের সঙ্গে

ক্রিয়া করল। এইমের পর 'নক্স ভ্রাতৃদ্বয়' ফ্লোরস্পারের পাত্রে পূর্বোক্ত বিক্রিয়া ঘটালেন কিন্তু ব্যর্থতা বরণ তাঁদেরও করতে হল।

কেটে গেল আরও কত বছর। ব্যর্থতা বরণ করলেন আরও কত বিজ্ঞানী। এল ফরাসী বিজ্ঞানী "ফ্রেমী"র কাল। তাঁরও দৃষ্টি আকর্ষণ করল ফ্লোরিন। পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলি বাদ দিয়ে অন্য উপায়ে ফ্লোরিন প্রস্তুত করতে পারা যায় কিনা সেই চিন্তা করতে লাগলেন। একদিন ভাবলেন তিনি, হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড-কেই তিনি তড়িৎ বিশ্লেষণ করবেন। কিন্তু তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দেখলেন, ফ্লোরিন আদৌ পাওয়া গেল না। পাওয়া যাবেই বা কোত্থেকে? তড়িৎ বিশ্লেষণ দ্বারা হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড থেকে বিচ্ছিন্ন ফ্লোরিন সঙ্গে সঙ্গে জলের সাথে ক্রিয়া করে পুনরায় উৎপন্ন করে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিডকে। ব্যর্থতা বরণ করতে হল তাঁকেও।

ফ্রেমীর চিন্তাধারা পুনরায় পরিবর্তিত হল। এবার তিনি অনার্দ্র হাইড্রো-ফ্লোরিক অ্যাসিড তৈরি করে তার ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ পাঠাতে চেষ্টা করলেন। দেখলেন, অনার্দ্র অ্যাসিড তড়িতের কুপরিবাহী। এত প্রচেষ্টা, এত পরিশ্রম, সবই হল ব্যর্থ।

ফ্রেমীর পর প্রচেষ্টা চালালেন "গোরে" নামে এক বিজ্ঞানী। তিনি ক্যাল-সিয়াম ফ্লোরাইড, সিলভার ফ্লোরাইড এবং পটাসিয়াম ফ্লোরাইডকে এক সঙ্গে দ্রবীভূত করিয়ে, দ্রবণের ভেতর দিয়ে চালালেন বিদ্যুৎ। কিন্তু হায়! তিনিও হার মানলেন শেষ পর্যন্ত। এই প্রক্রিয়ায় ফ্লোরিন যে উৎপন্ন হল না এমন নয়। তবে যা উৎপন্ন হল সবই তড়িৎ বিশ্লেষণের পাত্র এমন কি তড়িৎদ্বারকে পর্যন্তও আক্রমণ করে বিক্রিয়া ঘটাল।

সর্বশেষ এগিয়ে এলেন ফ্রেমীর এক সুযোগ্য ছাত্র হেনরী ময়সাঁ। তিনি বুঝে-ছিলেন, ফ্লোরিন বেজায় সক্রিয়। কাচকেও ক্ষয় করতে পারে সে। তাই প্রথম থেকেই তাঁর মনে এল, যতদূর সম্ভব কম তাপমাত্রায়ই তড়িৎ বিশ্লেষণ করতে হবে। কারণ তাপমাত্রা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ওর সক্রিয়তা আরও বেড়ে যাবে।

প্রথমবারে বোরন ও সিলিকন ফ্লোরাইডকে নিয়ে কাজ আরম্ভ করলেন। কিন্তু সফল হতে পারলেন না। দ্বিতীয়বার গ্রহণ করলেন ফসফরাস ফ্লোরাইড। এবারও তাঁর কপালে জুটল ব্যর্থতা। কিন্তু হাল ছাড়লেন না তিনি। আপন চিন্তাধারাকে পরিবর্তন করে হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড থেকেই ফ্লোরিনকে আলাদা করতে চেষ্টা করলেন।

ধাতব পাত্র এবং কাচপাত্রের উপর ফ্লোরিনের ক্রিয়া হয় বলে ময়সাঁ প্ল্যাটিনামের পাত দিয়ে পাত্র তৈরি করলেন। পাত্রের আকার করলেন অনেকটা ইংরেজী "ইউ" অক্ষরের মত। তাতে অনার্দ্র হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড ও পটাসিয়াম ফ্লোরাইড মিশ্রিত দ্রবণ রেখে তড়িৎ চালালেন। তাপমাত্রা নামিয়ে আনলেন 0° ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের নিচে। এবার আর ব্যর্থ হলেন না ময়সাঁ। যে ফ্লোরিন এতকাল আত্মগোপন করেছিল এবার তাকে বাধ্য হয়ে আত্মপ্রকাশ করতে হল।

ইংরাজী ১৮৮৬ সাল। বিজ্ঞানীরা জানতে পারলেন, ময়সাঁ ফ্লোরিন তৈরির

কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। খুশি হলেন সবাই। শত শত বিজ্ঞানীর অধ্যবসায় ময়সাঁর হাতে সফল হল। অক্ষয়কীর্তি রচিত হল তাঁর জন্য।

হ্যালোজেন পরিবারের অপরাপরদের ইতিহাস এত সুদীর্ঘকালের নয়। পরিবারের দ্বিতীয় মৌল ক্লোরিন অনেক আগেই আবিষ্কৃত হয়েছিল। ক্লোরিনের পরিচয় প্রথম প্রদান করেছিলেন বিজ্ঞানী "গ্লবার"। তিনি ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে খাদ্য লবণের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটিয়ে প্রস্তুত করেছিলেন এই গ্যাসটি। প্রথমে বিজ্ঞানীরা মনে করতেন এই গ্যাসটি অক্সিজেনের একটি যৌগিক। ১৮১০ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী ডেভিই ঘোষণা করেন, গ্যাসটি কোন যৌগিক নয় এবং এর মধ্যে অক্সিজেনও নেই। তিনিই নামকরণ করেছিলেন ক্লোরিন।

ক্লোরিনের পর আবিষ্কৃত হয়েছে আয়োডিন। আবিষ্কর্তা বিজ্ঞানী কুর্তোয়াঁ। ফ্রান্সের লোক তিনি। ১৮১১ খ্রীষ্টাব্দে এই গ্যাসটিকে তৈরি করে রেখে দিতেই অল্প পরে কঠিনে রূপান্তরিত হয়েছিল।

কুর্তোয়াঁ আবিষ্কারক বটে কিন্তু আয়োডিন সম্বন্ধে কোন তথ্য প্রদান করতে পারেননি। তাঁর ধারণা ছিল, এটি কোন মৌলিক পদার্থ নাও হতে পারে। শেষে "ডেভি" ও "গেলুসাক" জানালেন, আয়োডিন মৌলিক পদার্থ। সামুদ্রিক উদ্ভিদে এরা প্রচুর পরিমাণে থাকে এবং এর ধর্মের সঙ্গে ক্লোরিনের ধর্মের যথেষ্ট মিল আছে।

ব্রোমিনের আবিষ্কর্তা ফরাসী বিজ্ঞানী "বালার"। ভূমধ্যসাগরের লোনা জল থেকে নুনকে পৃথক করে নেওয়ার পর অবশিষ্ট তরলটির সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়া ঘটিয়ে এক ধরনের ঘোর লাল বর্ণের তরল পেয়েছিলেন বালার। তরলটি ছিল ভয়ানক দুর্গন্ধযুক্ত। গ্রীক ভাষায় দুর্গন্ধকে বলা হয় Bromos। রসায়ন বিজ্ঞানীরা ক্লোরিনের সঙ্গে কিছুটা সাদৃশ্য এবং দুর্গন্ধযুক্ত দেখে নামকরণ করেছেন ব্রোমিন। শোনা যায় বালারের সমসাময়িক সময়ে বিজ্ঞানী "লাভিগ"ও ব্রোমিনকে নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।

সর্বশেষে আবিষ্কৃত হয়েছে হ্যালোজেন পরিবারের শেষ সদস্য "অ্যাস্টাটিন"। মেণ্ডেলীফ যে পর্যায় সারণীর প্রবর্তন করেছিলেন, তাতে অনেক ঘরকে শূন্য রেখে-ছিলেন। তার কারণ, তখনও বহু মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়নি, অথচ ভবিষ্যতে আবিষ্কার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। আয়োডিনের নিচে অনাবিষ্কৃত মৌলের শূন্য ঘরটির নামকরণ করছিলেন তিনি "একা আয়োডিন"। পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক ঠিক করে পরে ঘোষণা করা হয়েছিল, যদি মৌলটিকে প্রকৃতিতে লাভ করা যায় তাহলে সেটি হবে তেজস্ক্রিয় মৌল।

বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করেন একা আয়োডিনকে উদ্ধার করতে। প্রথমে চলে তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থগুলির মধ্যে অনুসন্ধান কার্য। কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না একা আয়োডিনকে। শেষে একদিন "অ্যালিসন" নামে এক বিজ্ঞানী জানালেন "মোনাজাইট" বালুকার মধ্যে তিনি একা আয়োডিনের সন্ধান পেয়েছেন। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞানী "রাজেন্দ্রলাল দে" জানালেন, ত্রিবাঙ্কুরের মোনা-

✪ টারবাইন ও রিঅ্যাক্টর ✪

টারবাইন কথাটির সঙ্গে আমাদের প্রায় সবারই পরিচয় আছে। বিশেষতঃ নদীতে বাঁধ দিয়ে বা জলপ্রপাতের জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হলে টারবাইন যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। এই কথাটা কার না জানা আছে?

টারবাইন শব্দটি এসেছে প্রাচীন ল্যাটিন ভাষা থেকে। এর অর্থ হচ্ছে যা আবর্তন করে বা ঘোরে। এটি কেবলমাত্র একটি ধাতু নির্মিত চক্র। গতিশীল জলের দ্বারা অথবা অন্য কোন তরল পদার্থের দ্বারা ওকে আবর্তন করানো হয়।

টারবাইনের আবিষ্কার হয়েছে অতি প্রাচীনকালে। কে যে টারবাইনের আবিষ্কর্তা, সে কথা আজ কেউই বলতে পারেন না। শোনা যায়, সুদূর অতীতে গ্রীস ও মিশর দেশের অধিবাসীরা শস্যকে গুঁড়া করার কাজে এবং জল সেচের কাজে টারবাইন জাতীয় এক রকমের চাকা ব্যবহার করতো। মধ্যযুগেও টারবাইনের ব্যবহার অব্যাহত ছিল এমন প্রমানও পাওয়া গেছে। তবে সেগুলির কোনটিই আজকের মত ছিল না।

আধুনিক টারবাইনের প্রথম রূপকার একজন ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার। নাম তাঁর ফুর্ণের। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তিনি এক ধরনের টারবাইন নির্মাণ করেন। পঞ্চাশ অশ্বক্ষমতা যুক্ত এই টারবাইনটি অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল। সেদিন ওটিকে ব্যবহার করে যখন সুফল পাওয়া গেল তখন অনেক ইঞ্জিনিয়ার ও বিজ্ঞানী যন্ত্রটির আরও উন্নতি সাধনে যত্নবান হলেন। ধীরে ধীরে আবিষ্কৃত হল নানা ধরনের টারবাইন।

প্রথমে জলের দ্বারাই ঘোরানো হত টারবাইনকে। পরে জলীয় বাষ্প, গ্যাস এমন কি বাতাসের সাহায্যে টারবাইনকে ঘোরানোর প্রচেষ্টা চললো। বিজ্ঞানীদের সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হল না। একে একে আত্মপ্রকাশ করলো জলীয় বাষ্প, গ্যাস এবং বাতাসের উপযোগী টারবাইন।

বাষ্পীয় টারবাইনের আবিষ্কর্তা দুজন বিজ্ঞানী। তাঁদের একজন সুইডেনের প্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার 'লাভাল' আর একজন বিশিষ্ট ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ার 'পার্সন'। দুজনেই ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে পৃথক পৃথক ভাবে আবিষ্কার করেন বাষ্প চালিত টারবাইন। তাঁদের আবিষ্কারের পর থেকে গ্যাস এবং বায়ু চালিত টারবাইন আবিষ্কার করা অত্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকেই টারবাইনের ব্যবহার ব্যাপকভাবে সুরু হয়। আজকাল ঘুরন্ত টারবাইন বড় বড় কল-কারখানায়, জলযানগুলিতে এমনকি উড়োজাহাজ চালানোর কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। এককথায় জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সর্বত্র ডাক পড়েছে টারবাইনের।

বর্তমানে চার রকমের টারবাইন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সেগুলি হল, জলের উপযোগী টারবাইন, জলীয় বাষ্পের উপযোগী টারবাইন, গ্যাসের উপযোগী টারবাইন এবং বাতাসের উপযোগী টারবাইন।

জল টারবাইন নদী কিংবা জলপ্রপাতের জল থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা হয়। উচ্চ স্থান থেকে জল যখন প্রবল বেগে টারবাইনের চক্রের উপর পতিত হয়, তখন টারবাইন আপনা হতেই প্রবল বেগে আবর্তন করে। টারবাইন চক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে ডায়নামো। ডায়নামো ঘোরানোর জন্য আর ইঞ্জিনের আবশ্যক হয় না। টারবাইন ঘুরলেই ডায়নামো থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এখন অবশ্য জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

বাষ্পীয় টারবাইন সবচেয়ে শক্তিশালী যন্ত্র। এই টারবাইনকে আবর্তন করানোর জন্য জলের পরিবর্তে উচ্চ চাপের জলীয় বাষ্প ব্যবহার করা হয়। টারবাইনের এক প্রান্ত দিয়ে গ্যাসকে অতিক্রম করান হয়, অপর প্রান্তে বাষ্পকে শীতল করে জলে পরিণত করার ব্যবস্থা থাকে। গ্যাস যখন টারবাইনের ভেতর দিয়ে পরিচালিত হয় তখন তার আয়তন বৃদ্ধি পায় এবং টারবাইন চক্রকে ঘোরাবার ব্যবস্থা করে। এই টারবাইন ইঞ্জিন ডিজেল ইঞ্জিন অপেক্ষাও বেশী শক্তিশালী আর ব্যবহার করারও অনেক সুবিধে। যে সব জায়গায় ইঞ্জিন ব্যবহার করার অসুবিধা আছে সেখানে বাষ্পীয় টারবাইন বেশ কার্যকর।

গ্যাস টারবাইন অনেকটা বাষ্পীয় টারবাইনের মতই। গ্যাস টারবাইনকে আবর্তন করানো হয় জলীয় বাষ্পের পরিবর্তে উত্তপ্ত গ্যাস প্রবাহের দ্বারা। সাধারণতঃ কেরোসিন গ্যাস বা অন্য কোন প্রাকৃতিক গ্যাস এই টারবাইনের উপযোগী। আজকাল হামেশাই জাহাজ, উড়োজাহাজ এবং রেল ইঞ্জিন চালানোর কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে গ্যাস টারবাইনকে। এই টারবাইন যন্ত্র ব্যবহার করার সবচেয়ে সুবিধা এই যে, যে কোন টারবাইন অপেক্ষা গ্যাস টারবাইন হালকা এবং ছোট।

আজকাল আবার টারবাইনকে সুদৃঢ় এবং উচ্চ তাপ সহনশীল করার জন্য নানা প্রকার ধাতুসঙ্কর ব্যবহার করা হচ্ছে। জলীয় বাষ্প, গ্যাস, বাতাস প্রভৃতি সব কিছু বাদ দিয়ে গ্যাস টারবাইনকে ঘোরানো হচ্ছে পরমাণু শক্তির দ্বারা। টার-বাইনের ভবিষ্যৎ আরও উজ্জ্বল।

আজকাল নিউক্লিয়ার রিঅ্যাক্টর দ্বারা উৎপন্ন তাপ শক্তির সাহায্যে বাষ্প বা উচ্চ চাপ যুক্ত উত্তপ্ত গ্যাস প্রস্তুত করে টারবাইন এবং বিদ্যুৎ উৎপাদক যন্ত্রকে চালিয়ে বিদ্যুৎ শক্তি উৎপন্ন করা হচ্ছে। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত রিঅ্যাক্টরকে বলা হয় পাওয়ার রিঅ্যাক্টর।

সম্প্রতি নানা ধরনের রিঅ্যাক্টর আবিষ্কৃত হয়েছে। সব রিঅ্যাক্টরের মূল নীতি হল, পরমাণুর কেন্দ্রককে বিভাজন করে শক্তি উৎপন্ন করা। তবে বিভিন্ন প্রকার রিঅ্যাক্টরের কার্যপ্রণালী বিভিন্ন। সাম্প্রতিককালে যে রিঅ্যাক্টরগুলি ব্যবহৃত হচ্ছে, তাদের মধ্যে তাপীয় রিঅ্যাক্টর, ফাস্ট রিঅ্যাক্টর, ব্রীডার রিঅ্যাক্টর ও পাওয়ার রিঅ্যাক্টর প্রধান। তাপীয় রিঅ্যাক্টরের ক্ষেত্রে জ্বালানী হিসাবে ইউরে-নিয়ামকে ব্যবহার করা হয়। অপরাপর ক্ষেত্রে উচ্চ শক্তি সম্পন্ন নিউট্রনের দ্বারা পরমাণু কেন্দ্রককে বিভাজন করে তাপশক্তি উৎপন্ন করা হয়।

তাপীয় রিঅ্যাক্টরে জল, গ্রাফাইট, ভারি জল প্রভৃতি প্রশমক বা মডারেটর

জাইট মৃত্তিকা থেকে তিনি একা আয়োডিনকে পৃথক করতে সমর্থ হয়েছেন। রাজেন্দ্রলাল মৌলটির নাম একা আয়োডিনের পরিবর্তে "ডোকিন" রাখেন। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও মৌলটির কোন আইসোটোপ তৈরি করতে পারেননি।

পরিশেষে "করসন", "ম্যাকেঞ্জী" ও "সেগ্রে" এই তিনজন বিজ্ঞানী মৌলটির আইসোটোপ তৈরী করতে সক্ষম হলেন। তাঁরা দেখলেন, মৌলটির পারমাণবিক ক্রমাঙ্ক ৮৫ এবং এটি একটি অস্থায়ী তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ। গ্রীক ভাষায় "অস্থায়ী"কে বলে Astatos। তাই মৌলিক পদার্থটির হ্যালোজেন পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নাম ঠিক করা হয় "অ্যাস্টাটিন"।

✪ বৈদ্যুতিক বাতি ✪

শত শত বিজ্ঞানীর শত শত বছরের সাধনার ফলে একদিন বিদ্যুৎ হয় করায়ত্ত। চমকিত হয়েছিল মানুষ বিদ্যুতের প্রচণ্ড শক্তির পরিচয় লাভ করে। অতঃপর ডায়নামো আবিষ্কার হলে বিজ্ঞানীদের মাথায় আসে নতুন চিন্তা। ভাবলেন, যেমন করেই হোক বিদ্যুৎকে নিয়ে আলো জ্বালাতে হবে। বিজ্ঞানীরা কাজে নেমে দেখলেন, যখন কোন তারের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হয় তখন তারটি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। অবশ্য এর আগে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন ঘুড়ি উড়িয়ে আকাশের বিদ্যুৎকে মাটিতে নামিয়ে এনে প্রমাণ করেছিলেন আকাশের বিদ্যুতের সঙ্গে মানুষের তৈরি বিদ্যুতের কোন ভেদ নাই।

বিজ্ঞানীরা চিন্তা করলেন, আকাশে বিদ্যুৎ স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে ওঠে, অপরদিকে বিদ্যুৎ স্পর্শে ধাতব তার গরম হয়ে উঠে, তবে কেন আলো জ্বালানো যাবে না? অনেক ভেবে-চিন্তে প্রথম তৈরি করা হল আর্ক ল্যাম্পকে। শহরের রাস্তায় বসানো হল এই ল্যাম্পকে এবং তখনই জয় জয়কার পড়ে গেল চারদিকে।

তখন চলেছে বিজ্ঞানের যাদুকর টমাস আলভা এডিসনের আমল। এমন তাঁর বৈজ্ঞানিক প্রতিভা ছিল যে, যা একবার তাঁর হাতের ছোঁয়া পেত তা সজীব হয়ে উঠতই। মনে হয় কোন কাজেই ব্যর্থতা বরণ করেননি এডিসন। যেদিন তিনি আর্কল্যাম্প দেখলেন, সেইদিনই তাঁর মাথায় চিন্তা এল, যদি ছোট ছোট বৈদ্যুতিক বাতি বসানো যেত, তাহলে আমাদের কতই না সুবিধা হত! রান্না ঘরে, পড়ার ঘরে, বৈঠকখানায়, অফিস ঘরে, সর্বত্রই আলো জ্বালাবার হাঙ্গামা চুকে বুকে যেত। ঠিক করলেন মনে মনে, যেমন করেই হোক তাঁর কল্পনাকে বাস্তবে রূপ দেবেনই।

পরীক্ষায় বসে গেলেন এডিসন। কত হরেক রকমের মোটা ও সরু তার দিয়ে আরম্ভ হল তাঁর গবেষণা। একদিন তাঁর নজরে পড়ল, যেসব তারের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ চলাচল করতে পারে, বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে সেগুলো সবই উত্তপ্ত হয়ে উঠে। আবার যে তারের রোধ যত বেশী, সেই তারের কুণ্ডলীর ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ চালালে তত বেশী উত্তপ্ত হয়। পরীক্ষার দ্বারা আরও বুঝতে পারলেন, পরিবাহী

তার সরু হলেই রোধ বেশী হয়।

চলল গবেষণার পর গবেষণা। সরু তার বা ফিলামেণ্ট তৈরি করতে গিয়ে যথেষ্ট অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল তাঁকে। দেখলেন, সব পরিবাহীর সরু তার এ কাজের উপযোগী নয়। বেশীর ভাগ সরু তারই বিদ্যুৎ প্রবাহ পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

যতই বাধা পেতে লাগলেন, ততই তাঁর উৎসাহ বেড়ে চলল। শেষে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর আবিষ্কার করলেন, কার্বন দিয়ে ফিলামেণ্ট প্রস্তুত করলে সহজে পুড়ে ছাই হয়ে যায় না। একবার নয়, দুবার নয়, বেশ কয়েকবার ধরেই পরীক্ষাটা করলেন। কোন বারেই কার্বন ফিলামেণ্ট পুড়ে গেল না। আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল এডিসনের মুখ। বুঝি বা এতদিনে তাঁর স্বপ্ন সার্থক হল!

ইংরাজী ১৮৭৯ সাল। এডিসন একটা কাচের বাল্বে কারবন ফিলামেণ্ট সংযোগ করে বাল্বটিকে বায়ুশূন্য করলেন। তারপর তার ভেতর দিয়ে পাঠালেন বিদ্যুৎ। দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে লাগলেন—ফলটা কী দাঁড়ায় দেখার জন্য।

বেশ কয়েক ঘণ্টা অতিক্রান্ত হয়ে গেল। এডিসন দেখলেন, ফিলামেণ্টটা পুড়ে গেল না, অধিকন্তু বেশ কিছুটা আলোও পাওয়া গেল। সে আলোটা আজকের দিনে বৈদ্যুতিক বাতি থেকে যে পরিমাণ আলো পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক কম ছিল। তবুও বেজায় খুশি হলেন এডিসন। শোনা যায়, দুদিন এবং দুরাত ধরে ফিলামেণ্টের ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহ অব্যাহত রেখেছিলেন। তবুও ফিলামেণ্টটি পুড়ে যায়নি।

পরের বছর অর্থাৎ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে একটি প্রদর্শনীতে এডিসন সর্বসমক্ষে প্রদর্শন করেন তাঁর এই ঐতিহাসিক আবিষ্কারটি। কিন্তু সেই প্রদর্শনীতে আরও একজন বিজ্ঞানী উক্ত পরীক্ষাটি তুলে ধরলেন। তাঁর বাতিটিও ছিল কার্বন ফিলা-মেণ্ট দিয়ে তৈরি। সেই বিজ্ঞানীর নাম "জোসেফ উইলসন স্বোয়ান"।

দুজনেরই এক আবিষ্কার। দর্শকদের মধ্যে বাক্‌বিতণ্ডা সুরু হল। প্রথম কে আবিষ্কার করেছেন? একদল বলল এডিসন, কিন্তু স্বোয়ানের সমর্থক দল সেকথা কিছুতেই স্বীকার করতে চায় না। তারা স্বোয়ানকেই প্রথম আবিষ্কর্তার সম্মানে ভূষিত করতে চায়।

শেষে দুই সমর্থক দলের মধ্যে তর্কাতর্কি এমনকি হাতাহাতি হওয়ার উপক্রম। কেউ কেউ এই নিয়ে মামলা দায়ের করতে ছুটল। এডিসন দেখলেন, ব্যাপারটা ভয়ানক বিশ্রী অবস্থায় এসে যাচ্ছে। তিনি তৎক্ষণাৎ ছুটলেন জোসেফ স্বোয়ানের কাছে। ইচ্ছা, এই নিয়ে একটা আপোষ করবেন তিনি।

জোসেফও ব্যাপারটা আদৌ পছন্দ করেননি। এডিসন আসতেই মীমাংসা করতে সম্মত হয়ে গেলেন। প্রস্তাবটা এডিসনই করলেন। বললেন, "আমরা দুজনে যখন একই সময়ে এবং একই জিনিস আবিষ্কার করেছি, তখন বাতিটির নাম আমাদের উভয়ের নামেই নামকরণ করা হোক।"

আপত্তি করলেন না জোসেফ উইলসন স্বোয়ান। উভয় আবিষ্কারকের নামানুসারে বাতিটির নাম হল "এডি স্বোয়ান ল্যাম্প"।

বৈদ্যুতিক বাতি প্রস্তুতির আদি পর্ব এইভাবে সমাপ্ত হয়েছিল, যদিও পরবর্তী-কালের বিভিন্ন আবিষ্কারকের হাতে পড়ে বাতির চেহারা সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে।

✪ শব্দোত্তর তরঙ্গ ✪

স্থির জলাশয়ে যদি একটুকরা ইটকে নিক্ষেপ করা যায় তাহলে জলাশয়ের জলে ঢেউ উঠবে এবং সেই ঢেউ চক্রাকারে এগিয়ে যাবে তীরের দিকে। সেই সময় পুকুরে যদি এক টুকরা শোলাকে ভাসিয়ে দেওয়া যায় তাহলে দেখা যাবে, ঢেউগুলো এগিয়ে যাওয়ার সময় সোলাটা এগিয়ে যাবে না। সে তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে অবস্থান করে উপরে নিচে ওঠানামা করবে এবং নাচতে থাকবে মাত্র।

আমাদের চারিদিকে আছে অদৃশ্য বায়ুসমুদ্র। কোথাও কোন শব্দ সৃষ্টি হলে সেই শব্দ বায়ু সমুদ্রে কম্পন তোলে। সেই কম্পনটা আবার তরঙ্গাকারে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু বায়ুর কোন স্থান পরিবর্তন হয় না। পুকুরের ঢেউগুলো যেমন একটু দূরে গেলে ক্ষীণ হয়ে যায় তেমনই শব্দ তরঙ্গ যত দূরে যাবে ততই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে উঠবে। তবে সবচেয়ে বড় কথা, শব্দ কোন মাধ্যম ছাড়া চলাচল করতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, সূর্যে সব সময় চলছে প্রচণ্ড পারমাণবিক বিস্ফোরণ। কিন্তু পৃথিবী থেকে কয়েকশ মাইল উপরে বায়ু-মণ্ডল শেষ হয়ে গেছে বলে বিস্ফোরণের শব্দ আমাদের কানে এসে পৌঁছোচ্ছে না। যদি সূর্য থেকে পৃথিবী পর্যন্ত গোটাটা বায়ুস্তর থাকত তাহলে বিস্ফোরণের শব্দ আমরা শুনতে পেতামই। মাধ্যম ছাড়া শব্দ যে ছড়িয়ে পড়তে পারে না সে পরীক্ষা আমরা পরীক্ষাগারে হাতে-নাতে করে দেখতেও পারি। সে সব কথা অপ্রাসঙ্গিক বলে এখানে বর্ণনা করা হল না।

শব্দের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে অতি প্রাচীনকালেই গবেষণা হয়েছিল। কারও কারও মতে প্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক ও গণিতজ্ঞ পিথাগোরাস এবং অ্যারিষ্টটলের হাতেই শব্দ বিজ্ঞানের সূচনা। তাঁদের পরে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ দুই বিজ্ঞানী গ্যালিলিও এবং নিউটন শব্দ তরঙ্গ সম্বন্ধে নানাবিধ পরীক্ষা করেন। এঁদের মধ্যে আবার মহামতি নিউটন বায়ু বা অন্য কোন স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের ভেতর দিয়ে শব্দ যাতায়াত করলে তাপমাত্রা, ঘনত্ব, আর্দ্রতা এবং চাপের ফলে শব্দের বেগের কী ভাবে পরিবর্তন ঘটে সে বিষয় গাণিতিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। সত্য কথা বলতে কী, নিউটনের আগে শব্দ বিজ্ঞানকে নিয়ে এত ব্যাপক গবেষণা হয়নি। তিনিই প্রথম শুনিয়েছেন শব্দ একপ্রকার শক্তি। কঠিন, তরল এবং বায়বীয় যে-কোন মাধ্যম দিয়ে সে যেতে পারে কিন্তু শূন্য মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তে পারে না।

যে সব শব্দ আমাদের কর্ণগোচর হয় তাদের প্রকৃতি সম্বন্ধেও অনেক কথা শুনিয়ে গেছেন নিউটন। তাঁর বক্তব্যের সার কথা হল, কম্পন ছাড়া শব্দ সৃষ্টি হতে পারে না। আবার কোন বস্তুর কম্পাঙ্ক (বস্তুটি এক সেকেণ্ডে যত বার কাঁপে) যদি ১৬-

এর কম এবং ১৬০০০-এর বেশী হয় (কারও কারও মতে ২০-এর কম এবং ২০০০০-এর বেশী) তাহলে সে শব্দ আমরা শুনতে পাব না। ১৬০০০-এর বেশী কম্পাঙ্কবিশিষ্ট শব্দকে বলা হয় শব্দোত্তর তরঙ্গ।

যেহেতু শব্দ একপ্রকার শক্তি এবং প্রমাণিত হয়েছে যে, যে শব্দের যত বেশী কম্পাঙ্ক সে শব্দের শক্তি তত বেশী। তাই শব্দোত্তর তরঙ্গের কম্পাঙ্ক বেশী হওয়ার জন্য ওর শক্তিও প্রচণ্ড। বিশেষজ্ঞরা একটা উদাহরণ দিয়ে থাকেন। তাঁরা বলেন, একটা সাইরেন ক্রমাগত একশ' বছর ধরে যদি ভোঁ ভোঁ করে বাজতে থাকে তাহলে তার শব্দ থেকে যেটুকু শক্তি সংগ্রহ করা যাবে তা দিয়ে হয়ত একবাটি জলকে কেবলমাত্র গরম করা যেতে পারে। কিন্তু কোন যন্ত্রের দ্বারা যদি শব্দোত্তর তরঙ্গের সৃষ্টি করা যায় তাহলে তার শক্তি প্রয়োগ করে মাত্র পাঁচ মিনিটেই বাটির জলকে ফোটাতে পারা যাবে। এত শক্তিধর এই শব্দোত্তর তরঙ্গ।

আজ দিকে দিকে দেখি বিজ্ঞানের জয়যাত্রা। কত অসাধ্য সাধন করছে মানুষ বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে। জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সে আজ অপরাজেয়। কিন্তু কেমন করে মানুষ সংগ্রহ করল এত হাতিয়ার!

সত্যকথা বলতে কী, মানুষের অসাধ্য সাধনের মূলে একটা বড় হাতিয়ার হচ্ছে শব্দোত্তর তরঙ্গ। টেলিভিশন, টেলিস্কোপ, মাইক্রোস্কোপ, রেডার প্রভৃতি থেকে আরম্ভ করে সমুদ্রের বুকে সঙ্কেত পাঠানো, সমুদ্রের তলদেশে সাবমেরিনের অবস্থান নির্ণয়, মাটির নিচে খনিজ পদার্থের সন্ধান, ইত্যাদি নানা কাজে আজকাল মানুষ নিয়োগ করতে আরম্ভ করেছে শব্দোত্তর তরঙ্গকে। চিকিৎসা ক্ষেত্রেও এই তরঙ্গের ব্যবহার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। বিশেষ করে ক্যান্সার প্রভৃতি দুরারোগ্য ব্যাধির নিরাময়ের ক্ষেত্রে এখন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে শব্দোত্তর তরঙ্গকে। আজকাল ইঞ্জীনিয়ারিং শিল্পেও ব্যবহার করা হচ্ছে এই তরঙ্গ। ধাতু নির্মিত বড় এবং ভারি পাতসমূহে অথবা রবারের টায়ারে কোথাও কোন খুঁত আছে কিনা নির্ণয় করা হয় শব্দোত্তর তরঙ্গকে পাঠিয়ে। ওয়েল্ডিং, ইলেকট্রোপ্লেটিং, কাপড় পরিষ্কার করা, কাপড় এবং সূতো রং করা প্রভৃতি হরেক রকমের কাজে এখন ডাক পড়েছে শব্দোত্তর তরঙ্গের। এই তরঙ্গের সাহায্যে অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি এবং হাসপাতালে ব্যবহৃত অপারেশনের সাজ সরঞ্জামকেও পরিষ্কার করা হচ্ছে। সমুদ্রের নীচে কয়লার স্তর অনুসন্ধানে শব্দোত্তর তরঙ্গ ছাড়া উপায় নেই। ভিজে জিনিস শুকানোর কাজে এই তরঙ্গকে ব্যবহার করে বেশ সুফল পাওয়া যায়। কাঁচ শিল্পে ও নানা রাসায়নিক শিল্পে এর ব্যবস্থা ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে।

আরও ব্যবহার আছে শব্দোত্তর তরঙ্গের। এই তরঙ্গ সমুদ্রের জলের ভেতরে প্রেরণ করে বুঝে নেওয়া হয় তলদেশে কোথাও পাহাড় নিমজ্জিত আছে কিনা। গভীর সমুদ্রে মাছের অবস্থান নির্ণয় করা হচ্ছে আর ব্যবহৃত হচ্ছে জলকে জীবাণু শূন্য করতে। এক কথায় এত ব্যাপক এই তরঙ্গের ব্যবহার যে বলে শেষ করা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশে এই তরঙ্গের ব্যবহার এত ব্যাপক হয়ে উঠেনি। অদূর ভবিষ্যতে এই তরঙ্গ আরও কত কাজে যে ব্যবহার করা হবে তা এখন থেকে বলা খুবই কষ্টসাধ্য।

শব্দোত্তর তরঙ্গের ব্যবহারের কথাই শুধু বলা হল, এবার এই তরঙ্গকে কেমন করে উৎপাদন করা হয় সেই প্রসঙ্গে আসা হচ্ছে। যে যন্ত্রটির সাহায্যে এই তরঙ্গের সৃষ্টি করা হয় তার নাম "ইলেকট্রিক অসিলেটর।" প্রথমে এই যন্ত্রের সাহায্যে ১৬০০০ বা তারও বেশী কম্পাঙ্ক উৎপাদন করা হয়। এক জাতীয় কেলাস আছে, যেগুলির বিপরীত তলে বৈদ্যুতিক বিভব প্রভেদ সৃষ্টি করলে ওদের আকারের কিছু কিছু পরিবর্তন হয়। কোয়ার্টজ এই জাতীয় একটি কেলাস। বিদ্যুৎ প্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে এই কেলাসের আকার পরিবর্তিত হয়। আবার বিদ্যুৎ প্রবাহের মধ্যে যদি কম্পন সৃষ্টি করা হয়, তাহলে কেলাসের মধ্যেও সৃষ্টি হবে কম্পন। আরও মজার কথা, ইলেকট্রিক অসিলেটরে বিদ্যুৎ প্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট কম্পাঙ্ক কেলাসের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হলে কেলাসের কম্পাঙ্কও সমান হবে। এই কেলাসকে ইংরেজীতে বলা হয় ট্রানসডিউসার (Transducer)। এক কথায় বলা যেতে পারে, ইলেকট্রিক অসিলেটরে শব্দোত্তর তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং সেই তরঙ্গকে ট্রানসডিউসারের সাহায্যে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়। তারপর যখন সেই ট্রানসডিউসারকে কোন মাধ্যমের কাছে রাখা হয় তখন তার কম্পনের ফলে মাধ্যমের মধ্যে সেকেণ্ডে ১৬০০০ ও বেশী কম্পনের একটা তরঙ্গ প্রবাহের সৃষ্টি হয়।

✪ সাইক্লোট্রোন ✪

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশক।

পৃথিবীর মানুষ সবেমাত্র বুঝতে আরম্ভ করেছে পরমাণুর প্রকৃত স্বরূপ। দীর্ঘকাল ধরে মানুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, পরমাণু হচ্ছে পদার্থের মৌলিক কণিকা। তাকে ভাঙ্গা যায় না, আবার গড়াও যায় না। এক কথায় মনে করা হতো, পদার্থের অন্তিম ও অবিভাজ্য কণা এই পরমাণু।

ইংরাজী ১৮৯৬ সাল। বিজ্ঞানের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। ঐ দিন বিখ্যাত ফরাসী বিজ্ঞানী হেনরী বেকারেল দেখতে পেলেন, ইউরেনিয়াম ঘটিত লবণ থেকে এক ধরণের অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয় এবং ঐ রশ্মি ফটোগ্রাফিক প্লেটকে আক্রমণ করে। এই রশ্মির এমন বৈশিষ্ট্য যে, উত্তপ্ত অথবা শীতল অবস্থায়, বায়ুশূন্য পরিবেশে অথবা অধিক বায়ুর চাপে, আলোকে অথবা অন্ধকারে, সর্বাবস্থায় একই হারে নির্গত হয়। আবিষ্কারকের নাম অনুসারে এই রশ্মির নামকরণ করা হয় বেকারেল রশ্মি।

একদিন ইউরেনিয়ামকে তার লবণ থেকে পৃথক করা হল। ১৮৯৮ এবং ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে কুরি দম্পতি আবিষ্কার করলেন আরও দুটি তেজস্ক্রিয় মৌল—পোলোনিয়াম এবং রেডিয়াম। এই দুটি মৌল আবার ইউরেনিয়াম অপেক্ষা অধিক তেজস্ক্রিয়।

বিজ্ঞানীদের এবার ভাববার পালা। কেন এই সব পদার্থ থেকে অবিরাম এবং স্বতস্ফূর্তভাবে অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয়? এগিয়ে এলেন বিজ্ঞানী রাদারফোর্ড। তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ থেকে নির্গত রশ্মিকে চৌম্বক বা তড়িৎ ক্ষেত্রের ভেতর দিয়ে অতিক্রম করিয়ে দেখলেন, রশ্মির একাংশ চৌম্বক ক্ষেত্রের একদিকে সামান্য বেঁকে যাচ্ছে। পরীক্ষা করে দেখলেন, এই রশ্মিগুলি ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত। অপর অংশ ঋণাত্মক তড়িৎযুক্ত রশ্মি বেঁকে গেল বিপরীত দিকে। অবশিষ্ট নিস্তড়িৎ রশ্মি কোনদিকে না বেঁকে সোজা এগিয়ে গেল। রাদারফোর্ড রশ্মিগুলির নাম দিলেন আলফা রশ্মি, বিটা রশ্মি এবং গামা রশ্মি।

পরীক্ষার সাহায্যে ধরা পড়ল, ধনাত্মক তড়িৎযুক্ত আলফা রশ্মি কতকগুলি পদার্থ কণার সমবায়ে গঠিত। এক একটি আলফা কণার ভর প্রোটনের ভরের চার গুণ কিন্তু তড়িৎ মাত্রা প্রোটনের দ্বিগুণ। হিলিয়াম পরমাণু থেকে ইলেকট্রন অপসারিত করলে যে হিলিয়াম আয়ন উৎপন্ন হয় আলফা কণা তা থেকে একেবারে অভিন্ন। আর এই কণার গতিবেগ আলোকের গতিবেগের দশ ভাগের এক ভাগ।

বিটা রশ্মিকে পরীক্ষা করে দেখা গেল, তড়িৎ ঋণাত্মক এই রশ্মি ইলেকট্রনের সমষ্টি মাত্র এবং এই কণিকা ও ইলেকট্রন অভিন্ন। বিটা কণিকার গতিবেগ আলফা কণিকার চেয়ে বেশী। তড়িৎ নিরপেক্ষ গামা কণিকা পরমাণুর অভ্যন্তরস্থ নিউট্রন কণিকা।

এতদিনে পরিবর্তিত হল বিজ্ঞানীদের পরমাণু সম্বন্ধে আগেকার ধারণা। দলে দলে বিজ্ঞানী এগিয়ে এলেন পরমাণুর গঠন ব্যাখ্যা করতে। তাঁদের পরীক্ষা এবং সিদ্ধান্ত থেকে জানা গেল প্রত্যেকটি পরমাণুর কেন্দ্রে আছে কেন্দ্রক। কেন্দ্রকের মধ্যে প্রোটন, নিউট্রন এবং আরও কতকগুলি কণিকা পিণ্ডবদ্ধ অবস্থায় আছে এবং কেন্দ্রকের চারপাশে আবর্তনরত ইলেকট্রন মহল।

ইংরাজী ১৯১৯ সাল। ঐদিন এক নতুন তথ্য উদঘাটন করলেন পরমাণু বিজ্ঞানের জনক রাদারফোর্ড। প্রমাণ করলেন, ইউরেনিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ থেকে নির্গত আলফা কণা দিয়ে কোন স্থায়ী মৌলের কেন্দ্রককে আঘাত করলে কেন্দ্রকে বিক্রিয়া ঘটান যায়।

ঘটনাটি অতি সামান্য মনে হতে পারে। কিন্তু এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এসেছে পরমাণু বিজ্ঞানে বিরাট বিপ্লব। অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা সেই দিনই বুঝতে পারলেন পরমাণুর অপরিমেয় শক্তির কথা। পরমাণুকে নিয়োগ করা হল ধ্বংসাত্মক ও সৃজনাত্মক উভয় ধরণের কাজে। তাই রাদারফোর্ডের এই আবিষ্কারকে একটি বৈপ্লবিক আবিষ্কার বলা যেতে পারে এবং এই আবিষ্কারটি হচ্ছে সাইক্লোট্রোন যন্ত্র উদ্ভবের মূল কারণ।

আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থগুলি সবই অস্থায়ী। তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করতে করতে একদিন তারা সাধারণ সীসার মত স্থায়ী মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। তার উপর তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থগুলো প্রকৃতিতে যে পরিমাণ পাওয়া যায় তার পরিমাণও

নিতান্ত কম। এই সব কারণে বিজ্ঞানীরা রাদারফোর্ডের পরীক্ষাটিকে ভিত্তি করে কৃত্রিম ভাবে তেজস্ক্রিয় পদার্থ প্রস্তুত করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন।

বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে পরমাণু বিজ্ঞানীদের ধারণা হয়, আলফা কণার পরিবর্তে প্রোটনকে দিয়ে পরমাণু কেন্দ্রককে আঘাত করলেও বহু নতুন তথ্য জানা যেতে পারে। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে কেবলমাত্র প্রোটন? যে সমস্ত স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয় পদার্থ পাওয়া যায় তাদের ভেতর থেকে তিন রকমের কণাই নির্গত হয়। কেবলমাত্র প্রোটন নির্গত হয় এমন মৌলিক পদার্থ তো জানা নেই। সিদ্ধান্ত করতে বাধ্য হলেন, কৃত্রিম কোন একটা উপায়ে প্রোটনকে ত্বরিত করা যেতে পারে। তখনই কল্পনা করা হল ত্বরণযন্ত্র বা অ্যাকসিলারেটারের।

বেশীদিন অপেক্ষা করতে হল না। বিজ্ঞানীদের কল্পনাকে বাস্তবে রূপায়িত করলেন বিজ্ঞানী আর্নেস্ট লরেন্স। ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে কালিফোর্ণিয়ার বার্কলে গবেষণাগার থেকে লরেন্স ঘোষণা করলেন, তিনি এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন যা দিয়ে প্রোটনকে ত্বরিত করা যায়। সেই যন্ত্রটির নাম সাইক্লোট্রোন। তুমুল সাড়া পড়ে গেল চারিদিকে।

আর্নেস্ট লরেন্সের আগে 'ককক্রফট' ও 'ওয়ালটন' নামে দু'জন বিজ্ঞানী "কাসকেড জেনারেটার" নামে এক ধরণের যন্ত্র তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সে যন্ত্রের অসুবিধা ছিল অনেক। তাছাড়া প্রোটনকে দিয়ে পরমাণুর কেন্দ্রকে বিক্রিয়া ঘটানো তো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়। স্বাভাবিক তেজস্ক্রিয়তা থেকে যে আলফা কণা নির্গত হয় তার শক্তি অতি সামান্যই। কিন্তু কেন্দ্রকে বিক্রিয়া ঘটাতে হলে শক্তিটা দরকার হয় কয়েক কোটি ভোল্টের মত। আরও একটা সমস্যা, এত উচ্চ বিভব ধারণ করার মত অপরিবাহী মাধ্যমই বা কোথায়? শেষ পর্যন্ত এই সমস্যাগুলি বড় বড় ইঞ্জিনিয়ারিং সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই সব সমস্যাগুলির সমাধান করে আর্নেস্ট লরেন্সই আবিষ্কার করেন সাইক্লোট্রোন যন্ত্র।

আজকাল এই যন্ত্রের উন্নতি হয়েছে অনেকখানি। এখন কেবলমাত্র প্রোটন কণিকাকে ত্বরান্বিত করা হয় না, অপরাপর কণিকাকেও ত্বরান্বিত করা হয়। কেবল সাইক্লোট্রোন যন্ত্র নয়, এই ধরণের আরও বহু যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত সমূহ যন্ত্র লরেন্সের তৈরি সাইক্লোট্রোন যন্ত্রের মত নয়। যন্ত্রটির উন্নতি সাধন হতে হতে এক অতিকায় এবং অতীব ভারী যন্ত্রের রূপ নিয়েছে। ভারী শিল্প ছাড়া এই যন্ত্র আর তৈরি করা সম্ভব নয়।

ভারতের পরমাণু গবেষণাগারগুলিতেও এই জাতীয় যন্ত্র আছে।

✪ কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ ✪

তেজস্ক্রিয় পদার্থ বলতে সেই সব পদার্থকে বোঝায়, যেগুলি থেকে সব অবস্থায় অবিরত ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে এক ধরণের অদৃশ্য রশ্মি নির্গত হয়। এদের

প্রকৃতিতে পাওয়া যায় অতি সামান্যই এবং এরা অত্যন্ত ভারী মৌল। তেজস্ক্রিয় পদার্থ আবিষ্কার প্রসঙ্গে পূর্বে বলা হয়েছে ইউরেনিয়াম, পোলোনিয়াম এবং রেডিয়ামের কথা। এদের পাওয়া যায় পিচ ব্লেণ্ড নামে এক প্রকার খনিজ থেকে। দেখা গেছে ইউরেনিয়াম থেকে রেডিয়াম প্রায় দশ লক্ষ গুণ বেশী তেজস্ক্রিয়।

পূর্বে আরও বলা হয়েছে রেডিয়ামের আবিষ্কর্তা কুরি দম্পতি অর্থাৎ পিয়েরে কুরি এবং মাদাম কুরি। তেজস্ক্রিয় পদার্থ সম্বন্ধে বহু তথ্যও প্রদান করেছিলেন তাঁরা। তবে তাঁদের ধারণা ছিল, এই সব মৌলিক পদার্থকে কিছুতেই কৃত্রিম-ভাবে প্রস্তুত করা যায় না। অতি অল্প পরিমাণে প্রকৃতিতে অবস্থান করে মাত্র। কেবল কুরি দম্পতি নন, সেদিনের সমস্ত পরমাণুবিজ্ঞানীই অনুরূপ মত পোষণ করতেন। কিন্তু এই ধারণাকে সম্পূর্ণভাবে ওলট পালট করে দিলেন কুরিদেরই কন্যা এবং জামাতা আইরিন কুরি ও ফ্রেডারিক জুলিও।

এঁরা দুজনেই এক সঙ্গে গবেষণা করতেন তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থকে নিয়ে। তাঁরা বুঝতে পারেন, যে সব মৌলিক পদার্থ থেকে তেজস্ক্রিয় রশ্মি নির্গত হয়, তারা রশ্মি বিতরণ করতে করতে একদিন অতি সাধারণ একটা ধাতুতে পরিণত হয়। যেমন, রেডিয়াম পরিণামে সীসাতে পরিণত হয়। তখন তার ভেতর থেকে রশ্মি নির্গমন হয় না। এমনকি এটি যে এককালে রেডিয়াম ছিল সেটুকুও সাধারণভাবে বোঝার কোন উপায় থাকে না। একটুখানি তফাৎ অবশ্য থাকে। সেটির স্বাভাবিক সীসা অপেক্ষা পারমাণবিক ওজন একটু বেশী।

তেজস্ক্রিয় পদার্থের এই বৈশিষ্ট্যটুকু দেখে আইরিন এবং জুলিও, ভাবতে শুরু করেন, তেজস্ক্রিয় মৌল যদি স্থায়ী মৌলে পরিণত হতে পারে তাহলে স্থায়ী মৌলগুলিকে কেনই বা তেজস্ক্রিয় মৌলে রূপান্তরিত করা যাবে না?

আরম্ভ হল কঠোর সাধনা। গবেষণা পাগল ছিলেন এঁরাও। রাতদিন মুখ থুবড়ে পড়ে থাকেন গবেষণাগারে আর রাজ্যের যত বাজে জিনিসকে নিয়ে পরীক্ষা করেন। এত প্রচণ্ড পরিশ্রম ব্যর্থ হল না তাঁদের। একদিন আপন চিন্তাধারাকে রূপ দিলেন বাস্তবে। জয় জয়কার পড়ে গেল আইরিন ও জুলিওর। তাঁদের মহৎ অবদানের জন্য তাঁরা ভূষিত হলেন নোবেল পুরস্কারে। জগৎ বিস্মিত হল প্রতিভাময়ী আইরিনের কৃতিত্ব দেখে।

কুরিদের আবিষ্কৃত রেডিয়ামকে দেখে মানুষ শিউরে উঠেছিল। তাদের সামনে প্রকট হয়েছিল পরমাণু শক্তির ভয়াবহ ও বীভৎস রূপটি। এবার তাঁদেরই কন্যা জামাতার আবিষ্কারের পর দেখতে পেল এর কল্যাণকর রূপটা। আইরিন এবং ফ্রেডারিক জুলিও প্রমাণ করেন, কোন স্থায়ী মৌলের পরমাণুর কেন্দ্রকে আলফা কণা দিয়ে আঘাত করলে সেটি অন্য মৌলিক পদার্থের পরমাণুতে পরিণত হয়।

তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থের স্বল্পতা হেতু এখন স্থায়ী মৌলগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় মৌল তৈরী করা হচ্ছে। সাধারণতঃ পারমাণবিক চুল্লীতেই এই ক্রিয়া ঘটান হয়ে থাকে। অথবা সাইক্লোট্রোন যন্ত্রের দ্বারা কোন মৌলিক পদার্থের মধ্যে আলফা কণিকার স্রোত প্রবাহিত করিয়ে উৎপন্ন করা

ব্যবহৃত হয়। মডারেটরের কাজ হচ্ছে বিভাজন প্রক্রিয়ায় নির্গত নিউট্রনের গতি মন্দীভূত করা। এই নিউট্রনরাই কেন্দ্রক বিভাজন ক্রিয়া সংঘটিত করে। কিন্তু নিউট্রনের পরিমাণও সীমিত করতে হয়। এই উদ্দেশ্যে রিঅ্যাক্টরে ব্যবহার করা হয় নিউট্রন নিয়ন্ত্রক কোন বস্তু। এই কাজে ক্যাডমিয়াম বা বৃপা বেশ কার্যকরী। বিভাজন ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন প্রভৃত তাপশক্তিকে সংহত করার জন্য জল, তরল ধাতু প্রভৃতি প্রবাহিত করা হয়।

✪ ট্যাঙ্ক ✪

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যেসব ধ্বংসকারী জিনিসগুলি আবিষ্কৃত হয়েছিল তাদের মধ্যে ট্যাঙ্ক একটি। ট্যাঙ্ক যুদ্ধযান বিশেষ। শত্রু সৈন্যের ব্যূহ ভেদ করে এগিয়ে যাওয়া ট্যাঙ্কের প্রধান কাজ। প্রাচীনকালে যুদ্ধের সময় ট্যাঙ্ক ব্যবহার না করা হলেও রথ প্রভৃতি ব্যবহার করা হত। বিভিন্ন দেশে রথের চেহারা ছিল বিভিন্ন। ভারতীয় পুরাণ ও মহাকাব্যগুলিতে রথের যে বর্ণনা আছে তা থেকে মনে হয়, রথ এবং রথের আরোহীদের হঠাৎ ঘায়েল করা যেত না। তাছাড়া সে যুগে শত্রুর আঘাত যাতে গায়ে না লাগে তার জন্য বর্ম ব্যবহার করা হত।

সেসব দিন কবে শেষ হয়ে গেছে। আবিষ্কৃত হয়েছে কত মারণাস্ত্র, কত কলা কৌশল। যুদ্ধের ব্যবস্থাও পরিবর্তিত হয়েছে। তবে সব যুগের উপর টেক্কা দিয়েছে বিংশ শতাব্দী। এই শতাব্দীর প্রারম্ভেই সংঘটিত হয়েছিল প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ এবং এই বিশ্বযুদ্ধেই প্রকৃত প্রয়োগ হয়েছিল ট্যাঙ্কের।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে শত্রুপক্ষের গুলি বর্ষণকে উপেক্ষা করে সহজে এগিয়ে যাওয়া ও শত্রু সৈন্যের উপর পাল্টা আক্রমণ চালানোর জন্য বৃটিশ সৈন্য-বাহিনীর একজন প্রধান ই. ডি. সুইনটনের পরামর্শে সৈন্যরা হোল্ট ক্যাটরপিলর ট্রাকটরকে স্থলযুদ্ধে ব্যবহার করেছিল। শক্ত আবরণযুক্ত ট্রাক্টরটি শত্রুপক্ষের গুলির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হল না। অধিকন্তু এবড়ো খেবড়ো রাস্তায় অবলীলাক্রমে গড়িয়ে চলে গেল। ট্রাক্টরের মধ্যে যে সব সৈন্যরা ছিল তারা ভেতর থেকে প্রবল গুলি বর্ষণ করে শত্রুপক্ষীয় সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দিল। সেই থেকে বন্দুক ও কামানের গোলা নিরোধক কঠিন ধাতব আবরণযুক্ত এক ধরনের যুদ্ধযান নির্মাণ করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন বিশেষজ্ঞরা। সুইনটনের হোল্ট ক্যাটরপিলর ট্রাক্টরেরই উন্নত রূপ হল আজকের ট্যাঙ্ক।

টি. জি. টুল্‌ক নামে একজন বৃটিশ সৈন্য-বাহিনীর অধিনায়কই ট্যাঙ্কের প্রকৃত পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর নির্দেশে যে স্থলযানটি নির্মিত হয়েছিল, সেটিকে প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল, ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই ফেব্রুয়ারী জার্মানদের সঙ্গে যুদ্ধে। সেই বছর সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী সোমের যুদ্ধে জার্মানদের বিরুদ্ধে উনপঞ্চাশটি ট্যাঙ্ক ব্যবহার করেছিল। যুদ্ধে এত অধিক সংখ্যক ও কার্যকরী স্থলযান এই প্রথম ব্যবহৃত হয়। সেই যুদ্ধে জার্মানীরা বড় অসুবিধায়

পড়েছিল। অপরাপর যুদ্ধেও ট্যাঙ্কের কৃপায় বৃটিশ বাহিনী বিপুলভাবে জয়লাভ করে। সত্যকথা বলতে কি, প্রথম বিশ্বযুদ্ধে স্থলভাগের উপর জার্মানদের পরাজয়ের মূল কারণ ছিল ঐ ট্যাঙ্ক।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যে ট্যাঙ্কগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল তাদের গতিবেগ বেশী ছিল না। সে সময় খুব দ্রুতগামী ট্যাঙ্কের গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় মাত্র বার মাইল। মানুষ যেভাবে পথ হাঁটে তার প্রায় তিনগুণের মত ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ট্যাঙ্কের আরও উন্নতি সাধনের প্রচেষ্টা চালানো হয়। বিশেষত ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্মানী, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন নানা ধরনের ট্যাঙ্ক ব্যবহার শুরু করে। সে সময় ট্যাঙ্কের গতিবেগ ছিল ২০ মাইল থেকে পঞ্চাশ মাইল।

যুদ্ধক্ষেত্রে ট্যাঙ্ক ব্যবহারের একটা বড় সুবিধা এই যে, বন জঙ্গল পাথুরে এলাকা, সব জায়গা দিয়ে ট্যাঙ্ককে চালনা করা যায়। বর্তমানে অবশ্য ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে সাধারণ গুলিগোলা ট্যাঙ্ক বা ট্যাঙ্ক আরোহীদের কোন ক্ষতি করতে পারে না। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের নিরাপত্তা বিধান এবং শত্রু সৈন্যদের উপর পাল্টা আক্রমণ চালানোর জন্যই ট্যাঙ্কের ব্যবস্থা।

✪ সাবমেরিন ও টর্পেডো ✪

সাবমেরিন এমন একটি জলযান যা ইচ্ছামত জলের উপরে অথবা গভীর সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে অক্লেশে যাতায়াত করতে পারে। এটিও একটি যুদ্ধযান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমুদ্রে শত্রুপক্ষীয় জাহাজগুলিকে ধ্বংস করার কাজে সাবমেরিন ও টর্পেডোকে ব্যবহার করা হয়েছিল। সাবমেরিনকে বাংলায় বলা হয় ডুবোজাহাজ।

সাবমেরিনের আকৃতি অনেকটা সাধারণ জলযানের মত। মাঝখানটা মোটা এবং দুদিকে ক্রমশঃ সরু। এর সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, সাধারণ জলযানের মত ওর বাইরের খোল মাত্র একটা থাকে না। খোলের একটা বহিরাবরণ থাকে এবং দুই আবরণের মধ্যবর্তী স্থান থাকে ফাঁকা। বাইরের আবরণ অপেক্ষা ভেতরের আবরণ আরও শক্ত এবং আরও মজবুত। ফাঁকা অংশটুকু জল বা বাতাস দিয়ে পূর্ণ করে রাখা হয়।

জলের ভেতরে ওঠানামা করতে হয় বলে সাবমেরিনে কতকগুলো জলের ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা হয়। জলে ডোবার প্রয়োজন হলে স্বয়ংক্রিয় মেসিনের দ্বারা ট্যাঙ্ক-গুলিকে জলে ভর্তি করে নেওয়া হয়। ফলে আপনা হতেই জলে ডুবে যায় সাব-মেরিন। জলের তলা থেকে উপরে উঠতে হলে ট্যাঙ্কগুলোকে খালি করে দেওয়া হয়। এ ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয় স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র।

সাবমেরিন চালানোর জন্য দু-রকম ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়ে থাকে। জলের উপর দিয়ে যখন অগ্রসর হয় তখন ব্যবহার করা হয় ডিজেল ইঞ্জিন। জলের তলা দিয়ে যাওয়ার সময় ডিজেল ইঞ্জিন কাজ করতে পারে না। তার একমাত্র

হয় কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থকে। তবে সাইক্লোট্রোন যন্ত্রে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ অতি অল্প এবং খরচও পড়ে খুব বেশী। তাই পারমাণবিক চুল্লীতেই এগুলি তৈরী করা হয় বেশী পরিমাণে।

কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরীর একটা উদাহরণ দিলেই ভাল বোঝা যাবে। ধরা যাক অ্যালুমিনিয়ামের কথা। এটি একটি স্থায়ী মৌল এবং পারমাণবিক গুরুত্ব ২৭। পারমাণবিক গুরুত্ব ২৭ হওয়ার কারণ, অ্যালুমিনিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রকে থাকে ১৩টি প্রোটন ও ১৪টি নিউট্রন। আমরা জানি. নিউট্রন নিস্তড়িৎ কণা। এরা পরমাণুর ওজন বৃদ্ধি এবং কিছু ভৌতধর্ম ছাড়া রাসায়নিক ধর্মের কোন পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। কিন্তু প্রোটন কণা বৃদ্ধি হলে পরমাণুর ধর্মের আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়। এখন যদি অ্যালুমিনিয়ামকে ক্রমাগত আলফা কণা দিয়ে আঘাত করা যায় তাহলে উৎপন্ন হবে ৩০ পারমাণবিক ওজনের একটি মৌল, যার পরমাণুর কেন্দ্রকে অবস্থান করবে ১৫টি প্রোটন এবং ১৫টি নিউট্রন।

কেন্দ্রকে ১৫টি প্রোটন থাকে এমন একটি মৌলিক পদার্থ আমাদের জানা আছে। সেটির নাম ফসফরাস। যদিও স্বাভাবিক ফসফরাসের কেন্দ্রকে ১৫টি প্রোটন এবং ১৬টি নিউট্রন থাকার জন্য ওর পারমাণবিক গুরুত্ব ৩১। ৩০ পারমাণবিক গুরুত্ববিশিষ্ট পদার্থটিতে নিউট্রনের সংখ্যা একটি কম হলেও সেটি ফসফরাস ছাড়া অন্য কিছুই নয়।

কৃত্রিম উপায়ে প্রাপ্ত ফসফরাস ক্ষণস্থায়ী। মাত্র ১৫ মিনিটেই উবে যায়। এবং উবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিকিরণ করে তেজরশ্মি। তারপর একসময়ে পরিবর্তিত হয় অপর এক সিলিকনে।

আজকের দিনে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের চাহিদা ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। কার্বন, ফসফরাস, সোডিয়াম, আয়োডিন, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি বহু মৌলকে রূপান্তরিত করা হচ্ছে তেজস্ক্রিয় মৌল হিসাবে। এই সব মৌল শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হচ্ছে বেশী। মস্তিষ্কের টিউমারে, ক্যান্সারে, রক্তের চাপ বৃদ্ধিতে এখন বড় হাতিয়ার হচ্ছে তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থগুলি। এককালে যে সব রোগ ছিল একেবারে দুরারোগ্য এখন কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থের আবিষ্কারের ফলে অনেকটা আয়ত্তে এসেছে।

উদ্ভিদ বিদ্যায় তেজস্ক্রিয় কার্বনের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ধাতু ও রাসায়নিক শিল্পে, খনিজ তেল অনুসন্ধান কাজে এখন এদের ভূমিকা যথেষ্ট। বিজ্ঞানীরা আশা করেন, অদূর ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হবে আরও কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং মানুষের কল্যাণে তা আরও নিয়োজিত হবে।

সুখের কথা, ভারতেও প্রস্তুত হচ্ছে কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় মৌল। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছে ট্রম্বের ভাবা পরমাণু গবেষণাগার। দু'শ এরও বেশী কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ তৈরী হয় সেখানে।

✪ আলকাতরা ✪

খনি থেকে উত্তোলিত কয়লায় নানাবিধ অশুদ্ধি থাকে। জ্বালানীর কাজে ঐ কয়লাকে ব্যবহার করতে হলে তাকে পুড়িয়ে ফেলতে হয়! কিন্তু পোড়ানোর সময় উৎপন্ন হয় প্রচুর গ্যাস। প্রথমে জন ক্লেট্যান এবং রবার্ট বয়েল নামে দুজন বিজ্ঞানী ঐ গ্যাসটির পরিচয় জানতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন।

ইংরাজী ১৬৬০ সাল। দু'জন বিজ্ঞানীই কয়লা পোড়ানোর ফলে গ্যাসকে একটি নলের ভেতর দিয়ে চালিত করে ঠাণ্ডা করলেন। অবাক হলেন নলের ভেতরে এক রকম বিশ্রী এবং কুচকুচে কালো তরল পদার্থকে জমতে দেখে। তরলটি বেশ দুর্গন্ধযুক্তও। তবুও তাঁরা এর প্রকৃতি সম্বন্ধে নানা প্রকার গবেষণা আরম্ভ করলেন, কিন্তু বিশেষ কিছু আবিষ্কার করতে পারলেন না।

দেখতে দেখতে ক্লেট্যান এবং বয়েলের তৈরী সেই কালো তরলটার কথা বিজ্ঞানী মহলে ছড়িয়ে পড়ল। দলে দলে বিজ্ঞানী হরেক রকমের যন্ত্রপাতি নিয়ে বসে গেলেন গবেষণা করতে। শেষে ডবলিউ. এইচ. পারকিন নামে এক বিজ্ঞানী তরলটির বিস্তৃত পরিচয় প্রদান করতে সক্ষম হলেন এবং ঐ বস্তুটির নানাবিধ গুণের কথা উল্লেখ করলেন।

ঐ তরলটির নাম আলকাতরা। সাধারণতঃ অগ্নিসহা মৃত্তিকার দ্বারা নির্মিত কতকগুলো আবদ্ধ বক যন্ত্রে বিটুমিনাস কয়লার গুঁড়াকে প্রডিউসার গ্যাসের সাহায্যে ১০০০°C তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়। বায়ুহীন পরিবেশে উত্তপ্ত করে কয়লাকে উদ্বায়ী ও অনুদ্বায়ী এই দুই অংশে পৃথক করে নেওয়া হয় বলে এই পাতনের নাম অন্তর্ধূম পাতন। পাতনের ফলে উৎপন্ন উদ্বায়ী গ্যাসীয় পদার্থ-গুলি বাঁকানো লোহার নলের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়। তারপর গ্যাস-গুলিকে আংশিক জলপূর্ণ একটি পাত্রে প্রবেশ করানো হয়। সেখানে ঠাণ্ডা পেয়ে পেয়ে গ্যাস থেকে আলকাতরা বিচ্ছিন্ন হয়ে একটা ট্যাঙ্কে জমা হয়।

প্রথম প্রথম কিন্তু উপরোক্ত পদ্ধতিটি আবিষ্কৃত হয়নি। এবং সবার ধারণা ছিল এটি একটি অত্যন্ত বাজে জিনিস। কিন্তু বিজ্ঞানীরা কোন কিছুকে তুচ্ছ জ্ঞান করেন না। যত তুচ্ছ হোক না কেন, এঁরা সযত্নে তুলে রাখেন এবং তুচ্ছের ভেতরে মূল্যবান পদার্থ সন্ধানে প্রবৃত্ত হন।

হলও তাই। পার্কিনের গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা লেগে গেলেন আলকাতরার পাতন করতে। অবাক হলেন তাঁরা, যখন দেখলেন ঐ বাজে জিনিস আলকাতরার মত মূল্যবান পদার্থ খুব কমই আছে। অচিরে বুঝতে পারলেন বিজ্ঞানীরা, আলকাতরায় যে সমস্ত পদার্থ আছে তাদের স্ফুটনাঙ্ক বিভিন্ন। অর্থাৎ তরলে মিশ্রিত পদার্থগুলো একই তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয় না। কোনটি ১৫০° সেণ্টিগ্রেডে, কোনটি ২৫০° সেণ্টিগ্রেডে, কোনটি বা আরও উচ্চ তাপমাত্রায় ফুটতে আরম্ভ করে। তখনই ধরা পড়ে, আলকাতরা বিভিন্ন স্ফুটনাঙ্কের কতকগুলি

তরল পদার্থের মিশ্রণ—একটি বিশেষ ধরণের তরল নয়।

বিজ্ঞানীরা এমন ক্ষেত্রে আংশিক পাতন প্রক্রিয়া অবলম্বন করে থাকেন। আলকাতরার বেলায়ও তাই ব্যতিক্রম হল না। ১৭০° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত উষ্ণতায় পাতিত করতে তাঁরা লাভ করলেন লঘু তেল, ১৭০° সে. থেকে ২৩০° সে. উষ্ণতায় মধ্যম তেল বা কার্বলিক তেল, ২৩০° সে. থেকে ২৭০° সে. উষ্ণতায় ভারী তেল বা ক্রিয়োজোট তেল, ২৭০° সে. থেকে ৩৬০° সে. উষ্ণতায় সবুজ তেল বা অ্যানথ্রাসিন তেল, এবং অবশেষ হিসেবে পড়ে থাকলো কেবলমাত্র পিচ।

বিভিন্ন উষ্ণতায় পাতিত তরলগুলিকে বিশ্লেষণ করলেন এবার। দেখা গেল, লঘু তেলের উপাদান বেঞ্জিন, টলুইন এবং জাইলিন, মধ্যম তেলের উপাদান কার্বলিক অ্যাসিড ও ন্যাপথালিন, ভারী তেলের উপাদান ক্রেসল্‌স এবং সবুজ তেলের উপাদান অ্যানথ্রাসিন, ফেনানথ্রিন, প্রভৃতি।

এত সহজে এই সব মূল্যবান জিনিস পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞানীরা সেদিন ধারণা করতে পারেন নি। তবে উপরোক্ত উপাদানগুলো তাঁদের অজানা ছিল না। বিশেষ করে রাসায়নিক শিল্পে এদের প্রচুর চাহিদা ছিল। এতদিনে চাহিদা আরও বেড়েছে। ফলে বেঞ্জিন, টলুইন প্রভৃতিকে ব্যবহার করা হল মোটর গাড়ীর জ্বালানীরূপে, ড্রাই ওয়াশে, ওষুধ ও বিস্ফোরক প্রস্তুতিতে। কার্বলিক অ্যাসিড এবং ন্যাপথালিন ব্যবহৃত হলো ওষুধ ও বিস্ফোরক প্রস্তুতিতে এবং প্লাস্টিক শিল্পে। অপরাপরগুলি ব্যবহার করা হ'ল রঞ্জক হিসাবে, কাঠ সংরক্ষণের কাজে, পিচ্ছিলকারক তেল প্রস্তুতি বহু কাজে। অবশেষ হিসাবে যে পিচটি পাওয়া গেল তাকে তেলের সঙ্গে মিশিয়ে রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহার করা হ'ল। তাছাড়া পোকামাকড়ের হাত থেকে কাঠকে রক্ষা করার জন্য প্রলেপ দেওয়া, লোহার উপর প্রলেপ দিয়ে মরিচা নিবারণ করা প্রভৃতি কাজ তো আছেই।

বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন প্রায় তিনশ রকমের জিনিস মেশানো থাকে আলকাতরার মধ্যে। ওকে এত বিশ্রী দেখাবার কারণ, কার্বন পরমাণুগুলো বিক্ষিপ্ত অবস্থায় মিশে থাকে। আলকাতরাকে নিয়ে আজও বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিরাম নেই।

বর্তমান পৃথিবীর প্রায় সব দেশ আলকাতরাকে কাজে লাগিয়ে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। আমেরিকা, কানাডা, বৃটেন এ বিষয়ে শীর্ষস্থান দখল করে আছে। ভারতে কয়লার পরিমাণ যদিও নেহাৎ কম নয় তবুও কয়লা থেকে প্রয়োজনানুযায়ী আলকাতরা উৎপাদন করা হচ্ছে না। বৃটেন যেখানে দুশ পঞ্চাশ লক্ষ টন আলকাতরা উৎপন্ন করে সেখানে ভারত উৎপন্ন করে পঞ্চাশ লক্ষ টনের মত। ভারতের তৈরি প্রায় সব আলকাতরাই ব্যয় হয় রাস্তা নির্মানের কাজে। আলকাতরা থেকে মূল্যবান জিনিসগুলি তেমন আহরণ করা হচ্ছে না।

✪ লেসার রশ্মি ✪

আধুনিক বিজ্ঞানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান হ'ল লেসার রশ্মির আবিষ্কার। এটি আবিষ্কৃত হয়েছে বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে। আবিষ্কর্তার নাম অধ্যাপক চার্লস. এইচ. টাউনেস। এই মহত্তর আবিষ্কারটির জন্য ১৯৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাঁকে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয়েছে।

লেসার রশ্মি আবিষ্কারের পর প্রথম প্রয়োগ হয়েছিল ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে। আমেরিকার লিস্কন গবেষণাগার থেকে এই রশ্মি উৎপাদন করিয়ে পৃথিবী থেকে দু'লক্ষ চব্বিশ হাজার মাইল দূরে চন্দ্রপৃষ্ঠে আপতিত করা হয়েছিল। প্রতিফলিত রশ্মিকে দূরবীনের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিজ্ঞানীরা। সময় লেগেছিল মাত্র আড়াই সেকেণ্ড। এতদূর পথ অতিক্রম করে ফিরে আসার ক্ষমতা কোন বৈদ্যুতিক বাল্বের নেই। তাছাড়া সেদিন এই পরীক্ষাটির মাধ্যমে নিখুঁতভাবে মাপা হয়েছিল পৃথিবী থেকে চন্দ্রের প্রকৃত দূরত্ব।

লেসারের পুরো নাম হচ্ছে Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. এতবড় শব্দগুচ্ছের সব সময় উচ্চারণ করা অসুবিধাজনক। তাই শব্দগুলির আদ্যক্ষর দিয়ে গঠন করা হয়েছে একটি বিশেষ শব্দ LASER। প্রকৃতপক্ষে লেসার একটি সংক্ষিপ্ত নাম ছাড়া কিছুই নয়।

বিজ্ঞানীরা বলেন, লেসার রশ্মি সাধারণ আলোক রশ্মির ধর্মকে মেনে চলে। "আলোর কণিকা মতবাদ" নামে যে বিশেষ মতবাদটি আছে সেই মতবাদকেও মেনে চলে লেসারের তত্ত্ব। তাছাড়া 'প্ল্যাঙ্ক' আবিষ্কৃত কোয়ান্টাম থিওরীরও বিরুদ্ধাচরণ করে না।

আবিস্কারের কয়েক বছরের মধ্যেই নানারকমের লেসার আবিষ্কৃত হয়েছে। তবে সর্বপ্রথম যেভাবে লেসার প্রস্তুত করা হয়েছিল সেই পদ্ধতিটিই সংক্ষেপে বলা হল। বিজ্ঞানী টি. এইচ. মেইম্যানই প্রথম লেসার তৈরীর কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন এবং প্রদর্শন করেছিলেন ১৯৬০ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে। তাঁর প্রস্তুত লেসারটির নাম রুবি লেসার।

আমরা জানি, রুবি অ্যালুমিনিয়ামের একটি আকরিক। রত্নপাথর হিসাবেও রুবির ব্যবহার আছে। রুবি লেসার তৈরীর জন্য রুবির সঙ্গে অল্প সল্প ক্রোমিয়াম মিশ্রিত করে একটা দণ্ড প্রস্তুত করা হয়েছিল। নাম রুবি দণ্ড। দণ্ডটির ব্যাস খুবই কম করা হয়েছিল (৫ মিলিমিটারের মত), কিন্তু লম্বায় ছিল বেশ কয়েক সেন্টিমিটার। দণ্ডটিকে রাখা হয়েছিল একটা বড় কাচনলের মধ্যে এবং কাচনলের ভেতর থেকে বায়ুকে বের করে এনে বায়ুর পরিবর্তে জেনন নামে একটা নিষ্ক্রিয় গ্যাস পুরে দেওয়া হয়েছিল। তারপর দণ্ডসহ কাচনলের চারিদিকে পরানো হয়েছিল একটা জ্যাকেট। লেসার রশ্মি উৎপন্ন হলে প্রচুর তাপ উৎপন্ন

কারণ, জলের তলায় বাতাস নেই এবং বাতাসের অভাবে ডিজেল ইঞ্জিন ক্রিয়া করতে পারে না। সেই কারণে জলের তলায় সাবমেরিনকে চালাতে হলে ইলেক্ট্রিক মোটরের প্রয়োজন হয়।

জলের তলায় অবস্থানকালে সমুদ্রের উপরের দৃশ্য অবলোকন করার জন্য ব্যবহার করা হয় পেরিস্কোপ নামে একটি বস্তু। আর বাতাস সংগ্রহের জন্য দরকার হয় সুরফেল নামে একটি ফাঁপা নল বিশিষ্ট যন্ত্র। ইঞ্জিন চলাকালে যে শব্দ উৎপন্ন হয় তাকেও প্রতিরোধ করার ব্যবস্থা থাকে। কেননা শব্দ হলে দূর থেকে শত্রুপক্ষ সাবধান হয়ে যাবে।

সাবমেরিন মাঝে মাঝে বিপদেও পড়ে। তাই তার চালকদের নিরাপত্তার জন্য একটা বিশেষ বায়ুপূর্ণ প্রকোষ্ঠ সাবমেরিনের সঙ্গে যুক্ত থাকে।

সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ আবিষ্কৃত হয়েছে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে। প্রথম ডুবো-জাহাজটির নাম ছিল "ফুলটন"। রবার্ট ফুলটন নামে একজন জাহাজ প্রস্তুতকারক উক্ত যানটি তৈরি করেছিলেন বলে আবিষ্কর্তার নামানুসারে এই নাম। এই জাহাজটিকে ঠিক ঠিক সাবমেরিন বলা যায় না। তবে ফুলটন সমুদ্রের তলদেশে ডুব দিয়ে অবস্থান করতে পারত। পরে সাইমন লেক সমুদ্রের তলায় চালনা করার ব্যবস্থা করে সাবমেরিনের উন্নত রূপদান করেন।

প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধে উভয়পক্ষই ব্যবহার করেছিল ইঞ্জিনযুক্ত ডুবো-জাহাজ বা সাবমেরিন। তবে দ্বিতীয় বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় সাবমেরিনকে ধ্বংস করার উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষতঃ রেডার আবিষ্কৃত হওয়ায় অতি সহজ-ভাবে সমুদ্রের তলদেশে লুকিয়ে থাকা সাবমেরিনের খোঁজ পাওয়া যেতো। ধ্বংসের হাত থেকে সাবমেরিনকে রক্ষা করার জন্যই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ওকে আরও উন্নত করা হয়েছে। বর্তমানে আবার আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সাবমেরিন চালনার কাজে পরমাণুশক্তিকে নিয়োগ করেছেন। এই প্রচেষ্টা প্রথম ফলপ্রসূ হয়েছিল ১৯৫৫ খ্রীষ্টাব্দে। তারপরে আরও উন্নতি সাধন করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানীরা। আজকাল আমেরিকা কর্তৃক নির্মিত ডুবোজাহাজগুলো মাসের পর মাস সমুদ্রের তলায় ডুবে থাকতে পারে। আমেরিকার দেখাদেখি বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র, জাপান প্রভৃতি দেশ-গুলিও পরমাণু শক্তি চালিত সাবমেরিন নির্মাণ করার জন্য তৎপর হয়েছে।

এবার টর্পেডোর কথায় আসা যাক। টর্পেডো হচ্ছে এক রকমের ডুবো বোমা। এই বোমার এত প্রচণ্ড শক্তি যে, একটা সুবৃহৎ জাহাজকে সঙ্গে সঙ্গে ধ্বংস করে জলের তলায় ডুবিয়ে দিতে পারে! টর্পেডো আবার স্বয়ংচালিত। জাহাজ ধ্বংস করার কাজে সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজই ওকে ব্যবহার করে থাকে।

টর্পেডোতে থাকে শত্রু জাহাজ অনুসন্ধানের নিমিত্ত স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্র-পাতি আর থাকে একটি বিস্ফোরক কক্ষ। ওকে চালনা করা হয় ইলেকট্রিক মোটরের সাহায্যে। কখনও কখনও ইঞ্জিনও ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যখনই টর্পেডোকে ডুবোজাহাজ থেকে নিক্ষেপ করা হয় তখনই লিভারের সাহায্যে যন্ত্র-পাতিসমূহ কার্যকরী হয়ে উঠে। দূরবর্তী জাহাজের শব্দ অনুসন্ধানের জন্য আপনা হতে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতিসমূহ সক্রিয় হয়। শ্রবণের উপযোগী যন্ত্রও বসান

থাকে টর্পেডোতে। জাহাজের শব্দ শুনেই শব্দকে অনুসরণ করে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায় টর্পেডো। তারপর জাহাজের কাছাকাছি এলে চুম্বক শক্তির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে প্রচণ্ডভাবে জাহাজের গায়ে ধাক্কা দেয়। ধাক্কা লাগার সঙ্গে সঙ্গে বিস্ফোরণ ঘটে এবং জাহাজের তলদেশ ফেটে চৌচির হয়ে যায়। তাছাড়া জাহাজের গায়ে আগুনও ধরে যায় এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজটির সলিল সমাধি ঘটে। টর্পেডোর ওজনও বড় কম নয়। এক একটা ওজনে দশ থেকে বিশ টন পর্যন্ত হয়ে থাকে।

টর্পেডোর আবিষ্কর্তা অস্ট্রিয়ার নৌ-সেনা বিভাগের অধ্যক্ষ 'স্যার লুপিস'। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জাহাজ ধ্বংস করার জন্যেই নির্মিত হয়েছিল। তবে সে সময় ওকে ব্যবহার করা হত না। কিন্তু তৈরি করার পদ্ধতিটি জেনে নিয়েছিল অনেক দেশ। টর্পেডো প্রকৃতপক্ষে ব্যবহৃত হয়েছিল ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে। জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে ঐ বছরে যে যুদ্ধ হয়েছিল তাতে জাপানীদের টর্পেডো ছিল এক রকম স্বয়ং চালিত বোমা। ওজনও তত বেশী ছিল না। এবং যন্ত্রপাতিও তেমন কিছু ব্যবহার করা হত না। সে সময় টর্পেডোকে দূর থেকে শত্রু জাহাজের দিকে নিক্ষেপ করা হত।

টর্পেডোকে ভয়াবহ করে গড়ে তোলার মূলে আছে জার্মানীদের প্রচেষ্টা। দুটি বিশ্বযুদ্ধে টর্পেডোকে কাজে লাগিয়ে সমুদ্রের বুকে একরকম বিভীষিকার সৃষ্টি করে-ছিল জার্মান সাবমেরিনগুলো। তবে জার্মানদের সেই টর্পেডো আর নেই। বর্তমানে ওর ভয়াবহতা অনেক গুণে বেড়ে গেছে। উন্নত গবেষণার ফলে পূর্বের টর্পেডোর সবরকমের ত্রুটি দূর করা হয়েছে। যার জন্য আজকের টর্পেডো আরও দ্রুতগতি-সম্পন্ন এবং নিশানাও এদের অব্যর্থ।

✪ থার্মোমিটার ✪

আমরা জানি তাপের শক্তি বড় ভয়ানক। তাপ প্রয়োগে যে পরিবর্তন হয় না এমন বস্তু বোধ করি পৃথিবীতে কিছুই নেই। তবে পরিবর্তন ঘটাতে গেলে কোথাও তাপ প্রয়োগ করতে হয় বেশী, আবার কোথাও কম। তাপ কঠিন বস্তুকে তরলে রূপান্তরিত করে এবং তরলকে রূপান্তরিত করে গ্যাসে। কোন বস্তুতে তাপ প্রয়োগ করতে থাকলে তাপ বস্তুতে সঞ্চালিত হয়। তারপর বস্তুর পরিবর্তন ঘটায়। প্রথম যে পরিবর্তন সাধিত হয়, সেটি উষ্ণতা বৃদ্ধি। সেই কারণে তাপ ও উষ্ণতা এক কথা নয়। তাপ হচ্ছে কার্য এবং উষ্ণতা হচ্ছে কারণ অথবা উষ্ণতাকে তাপের ফলও বলা যেতে পারে।

এক কেটলি ঠাণ্ডা জলকে যদি জ্বলন্ত উনানের উপর চাপিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কেটলির ঠাণ্ডা জল ধীরে ধীরে গরম হয়ে উঠবে। পরিশেষে কেটলির জল ফুটতে আরম্ভ করবে। এখানে উনান থেকে তাপ ধাতব কেটলির মধ্য দিয়ে

হয় বলে অতি শীতল কোন তরল পদার্থকে প্রবাহিত করানোর জন্যই জ্যাকেটের ব্যবস্থা ছিল।

এবার বিদ্যুতের সাহায্যে আয়নিত করা হয়েছিল জেনন গ্যাসকে। তার ফলে সবুজ রঙের এক ঝলক আলো রুবি দণ্ডে আপতিত হয়। এই অবস্থায় রুবির মধ্যস্থিত ক্রোমিয়ামের পরমাণুগুলো উত্তেজিত হয়ে উচ্চস্তরের শক্তির সৃষ্টি করছিল। ক্রোমিয়ামের ইলেকট্রনগুলো শক্তির উচ্চস্তর থেকে হঠাৎ নিম্নস্তরে ফিরে আসতে পারল না। ধাপে ধাপে নামতে হল তাদের। সর্বশেষ ধাপে যখন শক্তির নিম্নতর স্তরে ফিরে এল তখনই নির্গত হল লেসার রশ্মি।

আজকাল রুবির বদলে অন্য কঠিন পদার্থকেও ব্যবহার করা হচ্ছে। কোন কোন তরল ও গ্যাসীয় পদার্থও এই কাজের অনুপযোগী নয়।

লেসার রশ্মির ভবিষ্যৎ খুবই উজ্জ্বল। ইতোমধ্যে আমেরিকা এবং পাশ্চাত্যের অন্যান্য দেশগুলি এই রশ্মিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করে চলেছে। বিশেষতঃ জীবন বিজ্ঞানে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানে তাঁরা এই রশ্মির ব্যবহার করে যথেষ্ট সুফল পাচ্ছেন। তাছাড়া পাশ্চাত্যের দেশসমূহ রেডার যন্ত্র এবং টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থায়ও ধীরে ধীরে ব্যবহার করছে লেসার রশ্মিকে।

এই রশ্মির একটা খারাপ দিক আছে। এখান থেকে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার পরিমাণ কয়েক হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। এই তাপমাত্রায় পার্থিব কোন জিনিস কঠিন কিংবা তরল অবস্থায় থাকতে পারে না। মুহূর্তের মধ্যে গ্যাসে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। এমন ভরাবহ যার তাপশক্তি তাকে শক্তির অহঙ্কারী মানুষ ধ্বংসাত্মক কাজেও ব্যবহার করতে পারে। এবং করার চেষ্টাও হচ্ছে।

তবে এর কল্যাণকর দিকটিও বড় কম নয়। এত প্রচণ্ড তাপ উৎপন্ন করতে পারে বলে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে লেসার রশ্মিকে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এখনই তো ব্যবহার করা হচ্ছে হীরক প্রভৃতি শক্ত পদার্থকে ছিদ্র করার কাজে কিংবা সূক্ষ্ম তারকে জোড়া লাগানোর কাজে। চিকিৎসকরা চক্ষুচিকিৎসার কাজেও ব্যবহার করতে আরম্ভ করেছেন লেসার রশ্মিকে, ক্যান্সার নিরাময়ের জন্য লেসার রশ্মিকে ব্যবহার করা চলবে। পরীক্ষা করে তাঁরা দেখছেন, এই রশ্মি সুস্থ কোষের উপর কোন খারাপ প্রতিক্রিয়া করে না অথচ ক্যান্সারদুষ্ট কোষ সমূহকে নষ্ট করতে পারে।

বিজ্ঞানীরা আরও আশা পোষণ করেন। তাঁদের ধারণা, লেসার বেতার ও টেলিভিশনের ক্ষেত্রে এক নবযুগের সূচনা করবে। বিশেষজ্ঞদের মতে উপযুক্ত লেন্সের সাহায্যে লেসার রশ্মিকে প্রয়োগ করলে যে প্রচণ্ড তাপ পাওয়া যাবে, তাকে যথোপযুক্তভাবে ব্যবহার করে বিস্তর কলকারখানা চালানো যাবে। ফলে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধান ঘটবে। কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করে থাকেন, একটি মাত্র লেসার রশ্মির সাহায্যে হাজার হাজার টেলিভিশন এবং লক্ষ লক্ষ টেলিফোন চালানো যেতে পারে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আশা, মহাকাশের দূরবর্তী গ্রহ-নক্ষত্রাদির সঙ্গে বার্তা বিনিময়ের ব্যাপারে ভবিষ্যতে লেসারই হবে একমাত্র হাতিয়ার।

এ বিষয়ে ভারতবর্ষ কিন্তু পিছিয়ে নেই। বিভিন্ন গবেষণাগারে এই রশ্মিকে নিয়ে বহুদিন থেকে গবেষণা চলেছে। ব্যাপকভাবে না হলেও ভারত কোন কোন ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছে লেসার রশ্মিকে।

✪ রেডার ✪

তখন বিশ্বমহাসমর চলেছে পুরোদমে। শত্রুপক্ষীয় বোমারু বিমান এগিয়ে আসত ঝাঁকে ঝাঁকে আর সামরিক ঘাঁটি এবং সমৃদ্ধ জনপদগুলির উপর বেপরোয়াভাবে গুলি ও বোমাবর্ষণ করে নির্বিবাদে সরে পড়ত। ব্যাপারটা এমন অতর্কিতে ঘটে যেত যে কোনরকম সাবধান হওয়ার সুযোগ পাওয়া যেত না। বিমান বিধ্বংসী কামান, ক্ষেপনাস্ত্র প্রভৃতিও আবিষ্কৃত হয়েছিল। কিন্তু শত্রুপক্ষও কম সাবধানতা অবলম্বন করত না। মারণাস্ত্রগুলোকে এড়িয়ে কৌশলে কাজ হাসিল করত। মিত্রপক্ষ আকাশে বিমান ওড়াত, আকাশ যুদ্ধও হত। তবে ক্ষয়ক্ষতি হত সবারই।

চিন্তিত হয়ে পড়লেন দেশের নেতৃস্থানীয়রা। বড় বড় বিজ্ঞানীদের নিয়োগ করলেন কোন একটা উপায় খুঁজে বার করবার জন্য।

অনেক ভাবলেন বিজ্ঞানীরা। হানাদারদের আক্রমনকে যেমন করে হোক রুখতে হবে। কিন্তু কোথায় পাবেন তেমন শক্তিশালী হাতিয়ার? হঠাৎ মনে পড়ল তাঁদের বেতার তরঙ্গের কথা। তাঁরা জানতেন, বেতার তরঙ্গ আলো কিংবা শব্দের মত প্রতিফলিত হয়। আরও জানতেন, পর্বত, বনভূমি আকাশের মেঘ এমনকি বিমান গাত্রেও প্রতিফলিত হতে পারে। যন্ত্রের দ্বারা বেতার তরঙ্গ উৎপন্ন করে যদি শত্রুপক্ষীয় বিমানের গায়ে প্রতিফলিত করে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে তাহলে অবশ্যই বিমানের দূরত্ব নির্ণয় করা যাবে।

ততদিনে বেতার প্রেরকযন্ত্র ও বেতার গ্রাহকযন্ত্রের আবিষ্কার হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের বিশেষ বেগ পেতে হল না। কেবল একটা যন্ত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ল যার দ্বারা বেতার তরঙ্গ সব সময় উৎপন্ন করে আকাশে তারের সাহায্যে সঞ্চারিত করা যাবে এবং প্রতিফলিত বেতার তরঙ্গকে সেইখানেই ধরা যাবে।

সে চেষ্টাও সফল হল বিজ্ঞানীদের। অচিরে আবিষ্কার করলেন রেডার নামে একটি যন্ত্র। তবে আরও একটা সমস্যা ছিল। সে সমস্যাটা হচ্ছে দূরত্ব নির্ণয় করা। কোন শব্দকে প্রতিফলিত করিয়ে দূরত্ব নির্ণয় করা সহজ। কারণ শব্দের বেগ সেকেণ্ডে ১১২০ ফুট মাত্র। সেক্ষেত্রে বেতার তরঙ্গের গতিবেগ সেকেণ্ডে একলক্ষ ছিয়াশি হাজার মাইল। অল্প সময়ে এত বেশী পথ অতিক্রম করে যে, সময়টা নির্ণয় করা খুবই কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়।

অনেক ভেবে চিন্তে বিজ্ঞানীরা এ সমস্যাটিরও সমাধান করলেন। আবিষ্কার করলেন এক ধরনের বিদ্যুৎ চালিত যন্ত্র—যার সাহায্যে আপনা হতেই সময়টা

ধরা পড়ে গেল।

সময়ের দ্বারা দূরত্বটা কেমন করে মাপা হয় তার নমুনা দেওয়া হল। ধরা যাক যন্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন বেতার তরঙ্গ একটা বিমানের গাত্রে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসতে ১/১০০ সেকেণ্ড লাগল। বেতার তরঙ্গ ১/১০০ সেকেণ্ডে পরিভ্রমণ করল ১৮৬০ মাইল (১৮৬০০০ ÷ ১০০)। যেহেতু বেতার তরঙ্গকে একবার যেতে হয়েছে এবং পুনরায় ফিরে আসতেও হয়েছে। সুতরাং যাওয়া আসার দুটো পথের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান। তাই ১/১০০ সেকেণ্ডে তাকে দ্বিগুণ পথ অতিক্রম করতে হয়েছে। অতএব বিমানের দূরত্ব হবে ৯৩০ মাইল (১৮৬০ ÷ ২)।

আর একটা ছোট্ট অসুবিধাও ছিল। যে বিমানটা এগিয়ে আসবে তার একটা নির্দিষ্ট গতি থাকবে। তাকে ধ্বংস করতে হলে তার গতিবেগ না জানলে চলবে না। সে অসুবিধাটাও দূর করলেন বিজ্ঞানীরা। স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে দূরত্বের সঙ্গে গতিবেগও নির্ণয় করলেন। আর কোন অসুবিধা হল না। ক্ষেপনাস্ত্র পাঠিয়ে ধ্বংস করা হতে লাগল শত্রুপক্ষীয় বিমানগুলিকে।

স্পষ্টই বোঝা গেল 'রেডার' যন্ত্রটি মহাযুদ্ধের একটা অবদান। সেদিন ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছিল রেডারকে। পরিণামে সেই রেডার দেখা দিয়েছে মানুষের হিতৈষীরূপে। বিজ্ঞানের রাজ্যটাই অদ্ভুত এবং আশ্চর্য।

"রেডার" এই নামটিও একটা গোপন ইঙ্গিত বহন করছে। ওর পুরো নাম "Radio Detection and Ranging"। যুদ্ধের সময় বেতার তরঙ্গের সাহায্যে সামরিক বিভাগ আকাশে বিমান এবং শত্রুপক্ষীয় গোপন ঘাঁটিগুলির অনুসন্ধান চালাতো বলে এই ধরনের নামকরণ হয়েছিল। Radio Detection and Ranging এর সংক্ষেপিত নাম "Radar"।

রেডার নামে অভিহিত যন্ত্রটি কোন একটিমাত্র বিশেষ যন্ত্র নয়। এটি কতকগুলি যন্ত্রের একটি বিন্যাস। যন্ত্রগুলির মধ্যে একটা বেতার প্রেরকযন্ত্র, একটা বেতার গ্রাহকযন্ত্র, একটা আকাশ তার বা এ্যারিয়েল বা অসিলোস্কোপই প্রধান। বেতার প্রেরকযন্ত্র থেকে বেতার তরঙ্গ উৎপন্ন করা হয় এবং সেই তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় ধরা পড়ে এখানকার বেতার গ্রাহক যন্ত্রে। এই কারণে কিছুক্ষণ পর পর আকাশ তারের সাহায্যে বেতার ধ্বনি উৎক্ষিপ্ত করা হয় এবং সম্ভাব্য সময়ের মধ্যে প্রতিধ্বনি শোনার চেষ্টা করা হয়। এই সময়টা বেতার প্রেরকযন্ত্র থেকে বেতার তরঙ্গ পাঠান হয় না। কিছুক্ষণ বিরাম দেওয়া হয় বলে একই আকাশ তারকে শব্দ প্রেরণ ও শব্দ গ্রহণ উভয় কাজেই ব্যবহার করা হয়। তার জন্য থাকে ইলেকট্রিক সুইচের ব্যবস্থা।

আকাশ তারটির গঠনটা একটু বিশেষ ধরনের। অবতল একটা ফ্রেমে আকাশ তারটি জড়ান থাকে যাতে সুইচ টিপলেই এদিক ওদিক ঘুরতে পারে। বেতার তরঙ্গ পাঠানোর সময় অবতল ফ্রেমটা একটা বিশেষ দিকে ঘুরতে পারে। প্রতিধ্বনি শোনার সময় আপনা হতেই অন্যদিকে ঘুরে আসে।

বেতার প্রেরকযন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে আর একটি যন্ত্র। নাম তার অসিলোস্কোপ। আসলে অসিলোস্কোপ যন্ত্রটিকে স্বয়ংক্রিয় ইলেকট্রনিক যন্ত্রই বলা যেতে

পারে। এই যন্ত্রটির প্রথম কাজ হচ্ছে সময় ও দূরত্ব পরিমাপ করা। যখন বেতার ধ্বনি পাঠান হয় তখন যন্ত্রটির গায়ে একটা কাচের পর্দার উপর দীর্ঘ আলোক রেখা পড়ে। আবার যখন প্রতিধ্বনি ফিরে আসে তখন পর্দাটার উপর পূর্ব আলোক রেখা থেকে দূরে আর একটা খাটো আলোক রেখা দেখা যায়। এই আলোক রেখার ব্যবধান নির্দেশ করে সময়ের পরিমাপ। সময় জানতে পারলেই পূর্বোক্ত উপায়ে দূরত্ব নির্ণয় করা যায়। বস্তুটি যদি গতিশীল হয় তাহলেও ধরা পড়ে এই যন্ত্রে এবং তার গতিবেগও আপনা হতে নির্দেশ করে। রেডারে ব্যবহৃত বেতার তরঙ্গের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ ৩ সেণ্টিমিটার থেকে ৩০ সেণ্টিমিটার।

আগেই বলা হয়েছে রেডারের উদ্ভাবন হয়েছে ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য। এতদিন সত্যিই মানুষ দেখেছিল ওর ধ্বংসাত্মক রূপ। আজ কিন্তু এই দোষে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না রেডারকে। যে কোন রাষ্ট্রের পক্ষে এখন রেডার অপরিহার্য। দেশ রক্ষার কাজে রেডার না হলে একদণ্ডও চলবে না।

পৃথিবীর প্রতিটি দেশ আজও মৈত্রীভাবাপন্ন হয়ে উঠেনি। মুখে আমরা যতটা বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা প্রচার করি না কেন এক দেশ অন্য দেশের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে তৎপর। সমুদ্রের মাঝখানে কোথাও লুকিয়ে রাখছে সাবমেরিন, কোথাও বা পরমাণু শক্তি চালিত বিরাট নৌবহর ইত্যাদি। কখনও কখনও এক দেশের বিমান আকাশ সীমা লঙ্ঘন করে অপর দেশে ঢুকে পড়ে আভ্যন্তরীণ খবরাখবর সংগ্রহের জন্য। এ সব তথ্য সংগ্রহ করতে, তথা দেশ রক্ষার কাজে রেডার না হলে চলে না।

নিজের দেশের জাহাজ ও বিমান শ্রেণীকে ঠিক পথে পরিচালিত করতেও রেডারের প্রয়োজন হয়। মাঝ সমুদ্রে অনেক সময় কুয়াশায় দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে জাহাজ। তখন অন্য কোন জাহাজের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়াও অসম্ভব নয়। এই অবস্থায় জাহাজকে নিয়ন্ত্রিত করতে হয় রেডার যন্ত্রের সাহায্যে।

অন্যান্য অসামরিক কাজেও রেডারকে ব্যবহার করা হয়। আবহতত্ত্ববিদদের রেডার ছাড়া একদণ্ডও চলে না। দূর সমুদ্রে কোথাও ঝড় কিংবা ঘূর্ণিবাত্যা কেন্দ্রীভূত হয়েছে, সে কথা রেডার আমাদের জানায় পূর্বাহ্নে। ঝড়ের উৎপত্তি-স্থল এবং গতিবেগ উভয়ই নির্ণয় করা হয় রেডার যন্ত্রে—যেমন করে শত্রুপক্ষের বিমানের অবস্থান এবং গতিবেগ নির্ণয় করা হয়ে থাকে। এই ব্যবস্থার ফলে আমাদের কত যে উপকার হয়েছে সে কথা কে না জানে? সমুদ্র তীরবর্তী জনসাধারণ, সমুদ্রের মাঝিমল্লা এবং বিমান বন্দর আবহাওয়ার সংকেত পেয়ে আগে থেকে সাবধান হয়ে যায়। যার জন্য প্রতি বছর হাজার হাজার জীবনহানি বন্ধ হয়েছে এবং বহু জাতীয় সম্পদ রক্ষা পাচ্ছে।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরাও ব্যবহার করছেন রেডারকে। তাঁরা নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহাদির দূরত্ব নির্ণয় করছেন রেডারের দ্বারা। আকাশে দৈনন্দিন উল্কাপাতের পরিমাণও জানাচ্ছে রেডার। এক কথায় মহাকাশের খবর সংগ্রহের কাজে রেডারের আছে প্রধান ভূমিকা।

বর্তমানে মানুষ আবার মহাকাশ পরিক্রমার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেছে। আকাশে প্রায়ই উৎক্ষিপ্ত করা হচ্ছে কৃত্রিম উপগ্রহকে। সেই সব উপগ্রহ ঠিক পথে চালিত হচ্ছে কিনা, পৃথিবীর মাটিতে বসে মানুষ এই রেডার থেকেই সংগ্রহ করছে। কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যেও স্থাপন করা হয় রেডারকে। যার জন্য কেবল পৃথিবী নয়, বহির্বিশ্বের নানাবিধ খবর আমরা ঘরে বসেই সংগ্রহ করতে পারছি।

স্বীকার করতে হবে যে, বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে রেডার একটি উল্লেখযোগ্য অবদান। রেডার আবিষ্কৃত না হলে মহাকাশবিজ্ঞান এতখানি সমৃদ্ধ হতে পারত না। মহাকাশ পরিক্রমায়ও দেখা যেত নানা বাধা-বিপত্তি। ভবিষ্যতে রেডারের দ্বারা আরও বহু কাজ সম্পন্ন হবে বলে আশা করেন বিজ্ঞানীরা।

✪ দূরবীন ও বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র ✪

দূরবীনের আবিষ্কার হয়েছে অনেক আগে। সেই কোন স্মরণাতীত কালে। তবে সে দূরবীন কেমন ছিল জানা যায় না। আধুনিককালে লিপারশী নামে হল্যাণ্ডের এক চশমা প্রস্তুতকারকই দূরবীনের প্রকৃত আবিষ্কারক। তিনি ধাতু নির্মিত একটা সরল চোঙের তলায় লেন্স বসিয়ে ঠিক দূরবীন না হলেও দূরবীনের মত একটি যন্ত্র নির্মাণ করেছিলেন। সেটা ছিল ইংরাজী ১৬০৮ সাল।

দু-বছর পরে অর্থাৎ ইংরাজী ১৬১০ সালে ইটালীর বিখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী গ্যালিলিও সেই চশমা প্রস্তুতকারক লিপারশীর যন্ত্রের অনুরূপ আর এক ধরণের দূরবীন তৈরি করেন। এটিও ছিল ধাতু নির্মিত একটি সরল চোঙ। তবে একটি লেন্সের বদলে দুটি লেন্স ব্যবহার করেছিলেন গ্যালিলিও। চোঙের তলায় যুক্ত করেছিলেন একটি বড় লেন্স এবং উপরে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র আর একটি লেন্স।

সেদিন নিজের তৈরি দূরবীন নিজের চোখে লাগিয়ে রাত্রির আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন গ্যালিলিও। অবাক হয়েছিলেন নিজেই। অকল্পনীয় মহাবিশ্বের এক ক্ষুদ্র অংশের ছবি সেই প্রথম মানুষের চোখে ধরা পড়েছিল। গ্যালিলিও কেবলমাত্র নিজে দেখে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি, ডেকে এনেছিলেন বন্ধুবান্ধবদের। আকাশকে দেখে তাঁরা এমন আশ্চর্য বোধ করেছিলেন যে, মনে হয়েছিল বুঝিবা গ্যালিলিও ম্যাজিক দেখাচ্ছিলেন ততক্ষণ।

গ্যালিলিওকে অনেক কষ্টে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে, তিনি ম্যাজিক দেখাচ্ছিলেন না। বন্ধুরা যা দেখেছিলেন, সেইটিই আকাশের প্রকৃত খবর। তবুও গ্যালিলিওর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করেননি কেউ।

গ্যালিলিওর পর অতিবাহিত হয় কত শত শত বছর। বিজ্ঞানের পরিধিও বেড়ে চলে অতি দ্রুতগতিতে। ফলে গ্যালিলিওর দূরবীন বিভিন্ন বিজ্ঞানী এবং শিল্পীদের হাতে নবরূপ পরিগ্রহ করে। এবং তাঁর অনুকরণে তৈরি হয় আরও হরেক রকমের দূরবীন। আজকের দিনে যে দূরবীন ব্যবহার করা হয়, সে

দূরবীনের সঙ্গে গ্যালিলিওর দূরবীনের আকৃতিগতভাবে কোন মিল নেই। তবুও দূরবীনের প্রকৃত আবিষ্কারকরূপে গ্যালিলিওর নাম বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে!

বর্তমানকালে দূরবীনকে ব্যবহার করা হয় আকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য। এই দূরবীন দু-ধরণের তৈরি করা হয়। এক ধরণের দূরবীনের নাম "প্রতিসরিত আলোর দূরবীন", দ্বিতীয় ধরণের নাম "প্রতিফলিত আলোর দূরবীন"। উভয় প্রকার দূরবীনে লেন্স লাগাতে হয়। তবে প্রতিসরিত আলোর দূরবীনে ব্যবহার করা হয় উত্তল লেন্স এবং প্রতিফলিত আলোর দূরবীনে ব্যবহার করা হয় অবতল লেন্স।

লেন্স মাত্রেই কাচের তৈরি এবং উভয় লেন্সই গোলাকার। উত্তল লেন্সের মাঝখানটা মোটা কিন্তু কিনারার দিকে ক্রমশঃ পাতলা হয়ে গেছে। অবতল লেন্সের বেলায় সম্পূর্ণ উল্টো। অর্থাৎ কিনারার দিকটা বেশ মোটা ভেতরের দিকে ক্রমশঃ পাতলা। আমরা যে আতস কাঁচ ব্যবহার করি সেটি একটি উত্তল লেন্স। অবতল লেন্সকে কখনও কখনও চশমায় ব্যবহার করা হয়। অবতল লেন্স বেশ কয়েক ধরণের হয়ে থাকে। কারও এক পিঠ অবতল আর এক পিঠ সমতল, কারও বা দু'পিঠ অবতল, আর কারও কারও এক পিঠ উত্তল অপর পিঠ অবতল। প্রতিফলিত আলোর দূরবীনে যে অবতল লেন্সটি ব্যবহার করা হয় তার এক পাশ থাকে সমতল এবং অপর পাশ অবতল মাত্র।

প্রতিসরিত আলোর দূরবীনে একটা বড় লেন্স এবং একটা ছোট লেন্স ব্যবহার করা হয়। দূরবীনের যে মুখে বড় লেন্স লাগান থাকে সেটিকে নির্দিষ্ট রাখতে হয় লক্ষ্য বস্তুর দিকে। তাই এই লেন্সটিকে বলে অবজেক্ট গ্লাস। আর দূরবীনের যে মুখে চোখ রেখে দেখতে হয়, সেখানে বসান থাকে ছোট লেন্সটি। এই লেন্সটিকে বলা হয় আই পিস। দূরবীনটি তৈরি হয় ধাতু নির্মিত একটা চোঙ দিয়ে। তবে প্রতিসরিত আলোর দূরবীন তৈরি করতে যথেষ্ট নিপুণতার প্রয়োজন। লেন্স দুটিকে এমনভাবে স্থাপন করতে হয় যেন উভয়ের ফোকাস একই বিন্দুতে মিলিত হয় এবং অক্ষদ্বয় একই সমতলে থাকে। এই জাতীয় দূরবীনে দূরের জিনিসকে অনেকটা কাছে দেখায় এবং ঐ কারণে কিছুটা বড়ও দেখায়। প্রতিসরিত আলোর দূরবীন চোখে লাগিয়ে আকাশের দিকে তাকালে গ্রহ উপগ্রহরা স্বাভাবিক দৃষ্টিতে যা দেখা যায় তার চেয়ে অনেক বড় দেখায়। কিন্তু নক্ষত্ররা অত্যধিক দূরে অবস্থান করার জন্য আদৌ বড় দেখায় না। তবে কিছুটা ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পেয়েছে বলে মনে হয়। এই দূরবীনকে প্রতিসরিত আলোর দূরবীন বলা হয় এই কারণে যে, এতে ব্যবহৃত লেন্সে আলোর প্রতিসরণ ঘটে।

এই জাতীয় দূরবীনের অবজেক্ট গ্লাস বড় করে তৈরি করার অনেক অসুবিধা আছে। সেইজন্য আজ পর্যন্ত যত প্রতিসরিত আলোর দূরবীন তৈরি হয়েছে তাদের অবজেক্ট গ্লাসের ব্যাস তিন ইঞ্চি থেকে চল্লিশ ইঞ্চি পর্যন্ত। তৈরি করার একটা বড় অসুবিধে হচ্ছে, এত বড় কাচখণ্ডকে ঢালাই করা। ঢালাই-র সময় যদি সামান্য একটু বুদবুদও থেকে যায় তাহলে সে লেন্সকে ব্যবহার করা

যাবে না। বড় কাচ খণ্ড ঢালাই করতে গেলেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও বুদবুদ থেকে যায়।

প্রতিসরিত আলোর দূরবীনের মধ্যে চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়েরকস মানমন্দিরের দূরবীনটি পৃথিবীর মধ্যে সর্ববৃহৎ দূরবীন। ঐ দূরবীনটির অবজেক্ট গ্লাসের ব্যাস ৪০ ইঞ্চি। অবজেক্ট গ্লাসের ব্যাস বেশী হলেই দূরবীন শক্তিশালী হয়। তার কারণ হচ্ছে, দূরে কোন নক্ষত্রের আলো আমাদের চোখের মণিতে যতখানি পড়ে দূরবীনের অবজেক্ট গ্লাসে পড়ে তার চেয়ে শত গুণ বেশী। তাই দূরবীণের সাহায্যে আকাশ পর্যবেক্ষণ করলে নক্ষত্রদের বেশী উজ্জ্বল দেখায় এবং গ্রহদের দেখায় বড়।

প্রতিফলিত আলোর দূরবীনের গঠন প্রণালী প্রায় একই ধরণের। এখানেও বড় ধাতব নলের দরকার হয় তবে অবজেক্ট গ্লাসটি উত্তল না হয়ে অবতল হয়ে থাকে। উত্তল অপেক্ষা অবতল লেন্স তৈরি করার সুবিধা থাকায় এই দূরবীনের অবজেক্ট গ্লাসের ব্যাস বেশ বেশী। তবে এখানে অবতল লেন্সকে অবতল দর্পণে পরিণত করে ব্যবহার করা হয়।

অবতল দর্পণ তৈরির নিয়ম হচ্ছে, প্রথমে মাপ অনুযায়ী একটা বৃত্তাকার ও পুরু কাচখণ্ডকে ঢালাই করে নিতে হয়। তারপর কাচ খণ্ডটির একটা পিঠ ঘষে ঘষে অবতল করে নেওয়া হয়। ঘষার সময়ে সাবধানতা অবশ্যই অবলম্বন করতে হয় যেন নিয়ম অনুযায়ী পুরু হয় অর্থাৎ পাশের দিক অপেক্ষা কেন্দ্রের দিকে পাতলা হয়। কোথাও পাতলা কিংবা কোথাও পুরু, এ ধরণের হলে চলবে না। তাছাড়া অপরাপর ত্রুটি তো আছেই।

অবতল কাচখণ্ড তৈরি করার পর অবতল পিঠের উপর রূপা অথবা অ্যালুমিনিয়ামের পাতলা আস্তরণ দিয়ে দেওয়া হয়। তা হলেই তৈরি হয়ে যায় অবতল দর্পণ। আজ পর্যন্ত যত প্রতিফলিত আলোর দূরবীন তৈরি হয়েছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় দূরবীনটি হল মাউন্ট প্যালোমারে রাখা ২০০ ইঞ্চি ব্যাসের দূরবীনটি। ঐ দূরবীনটির সাহায্যে দু'শ কোটি আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত নক্ষত্রকে পর্যবেক্ষণ করা যায়। শোনা যায়, এটি তৈরি করতে বহু কুশলী শিল্পীর বিশ বছর সময় লেগেছিল।

আমেরিকার লিক মানমন্দিরে স্থাপিত দূরবীনটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম দূরবীন। ঐ দূরবীনটির অবজেক্ট গ্লাসের ব্যাস ১২০ ইঞ্চি। সম্প্রতি সোভিয়েত রাশিয়াও তৈরি করেছে ২০০ ইঞ্চি ব্যাসের অবজেক্ট গ্লাস যুক্ত আরও একটি বৃহত্তম প্রতিফলিত আলোর দূরবীন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন মানমন্দিরেও আছে দূরবীন। তবে তাদের কোনটিই এত বড় নয়।

আজকাল বিভিন্ন দেশে প্রতিফলিত আলোর দূরবীনকে অবলম্বন করে প্রস্তুত করা হচ্ছে বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্র। নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, মহাকাশ পর্যবেক্ষণের জন্য দূরবীনের সঙ্গে বেতার তরঙ্গকেও ব্যবহার করা হচ্ছে! রেডারের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, বহির্বিশ্ব থেকে আগত বেতার তরঙ্গ রেডার যন্ত্রের আকাশতারে ধরা পড়ে। কিন্তু সে তরঙ্গ বড়ই দুর্বল। বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রে যে

আকাশতার ব্যবহার করা হয় সেটি তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন। জ্যোতিষ্ক থেকে আগত আলোকরশ্মি দূরবীনের অবতল দর্পণে এসে পড়লে সমস্ত রশ্মি একত্রভাবে প্রতিফলিত হয়ে দর্পণের ফোকাস বিন্দুতে জড় হয়। একটি বিন্দুতে সব রশ্মি সমবেত হওয়ার ফলে দুর্বল রশ্মিও শক্তিশালী হয়ে পড়ে। অপর দিকে জ্যোতিষ্ক থেকে আগত বেতার তরঙ্গ প্রতিফলনের জন্য বেতার দূরবীক্ষণ যন্ত্রে একটা অবতল আকাশতার এবং একটি বেতার গ্রাহকযন্ত্র ব্যবহার করা হয়।

✪ জীবের সহজাত গুণ অনুকরণে যন্ত্র ✪

মানুষের চারপাশে রয়েছে অসংখ্য জীব ও উদ্ভিদ। তাদের কত হরেক রকমের বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। আগে জীবজগতের কথা ধরা যেতে পারে। আমরা দেখি সব জীবের চলাফেরা, আহার সংগ্রহ, খাদ্য গ্রহণ এবং অন্যান্য কার্যপ্রণালী এক নয়। পাখীরা আকাশে উড়ে, সরীসৃপরা জলে স্থলে উভয় জায়গায় ঘুরে বেড়াতে পারে। অন্ধকারাচ্ছন্ন সমুদ্রের তলদেশে অতিকায় সামুদ্রিক জীবরা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করে। নিশাচর প্রাণীরা বিশেষ স্নায়ুযন্ত্রের সাহায্যে অন্ধকারেও শিকার অনুসন্ধান করে ঘ্রাণশক্তির দ্বারা, কোন কোন প্রাণী বহু দূরের জিনিসের উপস্থিতি উপলব্ধি করতে পারে, মানুষের মস্তিষ্ক অসাধ্যকে সাধন করে, এমন কত কী!

উদ্ভিদ জগতের বৈশিষ্ট্যের কথাও ধরা যেতে পারে। সূর্যমুখী ফুল সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটু ছোঁয়া পেলে লজ্জাবতী পাতার সঙ্কোচন ঘটে। সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলে হরেক রকমের ফুল ফোটে এবং সুগন্ধ ছড়ায়। উদ্ভিদের শেকড়ে আপনা হতেই খাদ্যরস প্রবেশ করে ইত্যাদি।

মানুষ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করেছে জীব ও উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্যগুলি। নিজ হাতে যন্ত্র নির্মাণ করে অনুসরণ করতে চেয়েছে তাদের। কোথাও হয়েছে ব্যর্থ, আবার কোথাও হয়েছে সফলকাম।

জীবের বৈশিষ্ট্যের অনুকরণে মানুষ যে সব যন্ত্র নির্মাণ করেছে তা সত্যই বড় আশ্চর্যজনক। প্রথমে নিশাচর প্রাণী বাদুড়ের কথা ধরা যাক। বাদুড়ের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওরা ওড়বার সময় মুখ থেকে উচ্চকম্পনযুক্ত এক ধরনের শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করে। সেই শব্দতরঙ্গ সম্মুখের দিকে প্রেরিত হয়। তারপর কোন বস্তুতে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে। বাদুড় সেই প্রতিফলিত শব্দ-তরঙ্গ কান পেতে গ্রহণ করে এবং এই কারণে দূরের কোন বস্তুর অস্তিত্ব টের পায়।

মানুষের নির্মিত রেডার যন্ত্র কতকটা ঐ রকমই। বাদুড় মুখ দিয়ে উচ্চ কম্পনযুক্ত শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে আর মানুষ অদৃশ্য কোন বস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের জন্য উচ্চ কম্পনযুক্ত বেতার তরঙ্গ প্রেরণ করে। সেই বেতার তরঙ্গ বস্তুর গায়ে প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে এবং বেতার গ্রাহকযন্ত্রে ধরা পড়ে।

এবার সামুদ্রিক জলচর প্রাণীদের কথা ধরা যেতে পারে। এমন কতকগুলো সামুদ্রিক জীব আছে যারা গভীর সমুদ্রে বাস করে। এত গভীরে সূর্য কিরণ প্রবেশ করতে পারে না—একেবারে ঘুটঘুটে অন্ধকার। অথচ তারা যথেচ্ছভাবে তলদেশে বিচরণ করতে পারে। দেখা গেছে ওদের অনেকেই চলাফেরা করার সময় এবং শিকার ধরার সময় এক ধরনের শব্দ করে এবং অপেক্ষা করে প্রতিধ্বনি শোনার জন্য। শুশুক জাতীয় প্রাণীরা এই শ্রেণীর। তাদের দৈহিক গঠন এমন যে, এত গভীরে থেকেও অক্লেশে এবং দ্রুত চলাফেরা করতে পারে। তাদের এই সব কার্য প্রণালীকে অনুকরণ করছে মানুষ। তৈরি করছে "সোনার" (Sonar) নামক যন্ত্রটি। এই যন্ত্রটির সাহায্যে মানুষ নদী ও সমুদ্রের গভীরতা মেপে নিচ্ছে। সমুদ্রের তলদেশে নিমজ্জিত কোন পাহাড় পর্বতের অবস্থান দূর থেকে নির্ণয় করে নিচ্ছে। আবার যুদ্ধকালে শত্রুপক্ষের কোন সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজ কোথাও লুকিয়ে আছে কিনা টের পাচ্ছে। তার উপর দৈহিক গঠন অনুকরণ করে তৈরি করছে অতি দ্রুতগামী সাবমেরিন। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ধরা পড়েছে, তিমি, শুশুক, হাঙ্গর প্রভৃতি বৃহদাকার সামুদ্রিক প্রাণীগুলির বিশেষ দৈহিক গঠনের জন্য অতি দ্রুত জল কেটে এগিয়ে যায় এবং শিকার ধরে। সাবমেরিনের গঠন প্রণালী অনেকটা ঐ সব জীবদের মত। তারা যেমন দেহের আয়তনের তুলনায় অতি অল্পশক্তি প্রয়োগ করে দ্রুত গতিতে এগিয়ে যায়, তেমনই সাবমেরিনের খোলের সঙ্গে জলের প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে দ্রুতগতিসম্পন্ন করেছে।

সাপদেরও একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে। বিশেষজ্ঞরা বলে থাকেন, আঘাতকারীকে সাপ সহজে নিষ্কৃতি দেয় না। আঘাতকারী দূরে সরে গেলেও সাপ সঠিক পথ নির্ণয় করে আঘাতকারীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং ঘ্রাণশক্তির জোরে চিনে ফেলে। তাদের একটা বিশেষ ইন্দ্রিয়ও আছে। ঐ ইন্দ্রিয়টির সাহায্যে তারা মাথা না তুলেও শিকারের অবস্থান নির্ণয় করে। কোন কোন সাপ ঐ বিশেষ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বাতাসের সামান্যতম তাপমাত্রার পরিবর্তনও ধরে নিতে পারে। মানুষ তাকেও অনুকরণ করেছে। নির্মাণ করেছে ক্ষেপনাস্ত্র। যুদ্ধকালেই সাধারণতঃ ক্ষেপনাস্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ক্ষেপনাস্ত্রের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এরা কেবল শত্রুপক্ষীয় বিমানের গতিপথ অনুসরণ করে বিমানটিকে ধ্বংস করে ফেলে।

এবার ইতর জীবদের কথা ছেড়ে দিয়ে মানবদেহের কোন কোন অঙ্গের কার্যপ্রণালীর কথা ধরা যেতে পারে। ঈশ্বর অকৃপণ হস্তে অনেক কিছু দান করেছেন মানুষকে। মানুষের পঞ্চ ইন্দ্রিয় যাবতীয় জাগতিক বস্তুকে চিনে নিতে পারে। তাদের মস্তিষ্ক এত বেশী উন্নত যে, সে আজ বিধাতার বিধানকেও ওলট-পালট করতে সক্ষম হয়েছে। অন্যান্য জীবজন্তুদেরও মস্তিষ্ক আছে, তবে মানুষের মত এত উন্নত নয়।

মানুষ দীর্ঘকাল ধরে নিজেদের দৃষ্টিশক্তি, ঘ্রাণশক্তি, শ্রবণশক্তি, স্পর্শশক্তি প্রভৃতিকে বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করে আসছে। সফলও হয়েছে অনেকখানি। আবিষ্কার করেছে মানব শরীরের নানা তথ্য এবং সেই তথ্যগুলি প্রয়োগ করে নির্মাণ করেছে কত অদ্ভুত ও বিস্ময়কর যন্ত্র। যন্ত্রগুলির কার্যপ্রণালী অনেকটা

মানুষের ইন্দ্রিয়গুলির মতই। যেমন—এক ধরনের যন্ত্র আছে, যার মানুষের মত চোখ নেই অথচ পারিপার্শ্বিক সব কিছুকে দেখে নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করতে পারে। কান নেই, তবুও যা শোনার কথা সবই ঠিক ঠিক শুনে নিয়ে লিখে ফেলতে পারে। ত্বক নেই, তথাপি পরিবেশের সব কিছু অনুভূতি জাগাতে পারে। এক কথায় বলা যেতে পারে মানুষ থাকে অনুপস্থিত কিন্তু তার চোখ, কান, নাসা, জিহ্বা ও ত্বক যে কাজগুলি করে সে সব কাজগুলি যন্ত্রই করে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে মানুষ ভুল করে কিন্তু মনুষ্য নির্মিত যন্ত্র কদাপি ভুল করে না।

আমরা প্রায়ই খবরের কাগজের পাতায় দেখতে পাই, মনুষ্য নির্মিত চালক-বিহীন মহাকাশযান চন্দ্রপৃষ্ঠে এবং বিভিন্ন গ্রহে অবতরণ করেছে। যেখানে অবতরণ করেছে সেখানকার পরিবেশ, মহাকাশযানে রক্ষিত যন্ত্রে আপনা হতেই ধরা পড়ে যাচ্ছে। আর আমরা পৃথিবীতে বসে যন্ত্রের মাধ্যমে সব কিছু প্রত্যক্ষ করছি এবং শুনতে পাচ্ছি। এমন কি গ্রহ-উপগ্রহের তাপমাত্রার পার্থক্য, বায়ুর চাপ, সেখানকার মাটি এবং তার উপাদান, আবহমণ্ডলে কোন্ কোন্ গ্যাসের প্রাচুর্য প্রভৃতি বহু মূল্যবান তথ্য সেখানে না গিয়েও যন্ত্রের দ্বারাই সঠিক নির্ণয় করে নিচ্ছে—আশ্চর্যজনক নয় কি?

এবার মানুষের মস্তিষ্কের কথা ধরা যেতে পারে। মস্তিষ্কের অনেকগুলি কাজ। তাদের মধ্যে প্রধান দুটি কাজ হল, কোন ঘটনাকে প্রত্যক্ষ করার পর মনে ধরে রাখা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে যথাযথভাবে চালিত করা। হাত পা প্রভৃতি চালনা করার মূলেও আছে মস্তিষ্ক। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পথ চলতে চলতে সামনে একটা সাপকে দেখা গেল। মস্তিষ্ক তখন পা'কে চালনা করল পেছনের দিকে কিংবা আসন্ন বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য কোন বুদ্ধি বাৎলে দিল। মানুষ ঘুমিয়ে পড়লেও মস্তিষ্ক ঠিক ঠিক কাজ করে চলে। ঘুমন্ত মানুষের গায়ে মশা বসলে মস্তিষ্কের পরিচালনায় তার হাতখানা মশাকে তাড়িয়ে দেয় কিন্তু ঘুমে আচ্ছন্ন মানুষ কিছুই টের পায় না।

মস্তিষ্কের কার্যপ্রণালী অতীব জটিল। সবকিছু বিশ্লেষণ করতে আজও মানুষ সমর্থ হয়নি। তবে যতটুকু পেরেছে তাও কম কোথায়? আবিষ্কার করেছে কম্পিউটার নামে একটি বিস্ময়কর যন্ত্র। মস্তিষ্কের মতই এই যন্ত্রটির কার্যপ্রণালী কিন্তু এত দ্রুত কাজ করে যে, ভাবলে অবাক হতে হয়।

কম্পিউটার গণনার কাজেই ব্যবহার করা হয়। বড় বড় যোগের অঙ্ক, যা একজন মানুষের কয়েক ঘণ্টা সময় লাগে কম্পিউটারের সেখানে সময় লাগে মাত্র কয়েক সেকেণ্ড। বড় বড় হিসাবনবীশদেরও বিরক্ত আসে কিংবা ভুলও হয় কিন্তু কম্পিউটারের ভুল হয় না। বড় বড় অফিসে এবং ব্যাঙ্কে, যেখানে প্রচুর গণনা করতে হয় সেখানে রাখা হয়েছে কম্পিউটার মেশিন।

আর একটি উল্লেখযোগ্য যন্ত্র হল, এক ধরনের টাইপ মেসিন। যন্ত্রটি মানুষের মুখের কথা শোনামাত্রই অবিকল টাইপ করে দিতে পারে। বক্তার বক্তৃতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কোন মানুষই টাইপ করে যেতে পারে না—কিন্তু যন্ত্রটি এমন অসাধ্যকেও সাধন করতে পারে। দ্বিতীয় আর এক ধরনের যন্ত্র আছে যেটি

জলের ভেতরে সঞ্চালিত হল। তাপের ফলে এই যে পরিবর্তন—মানুষকে দীর্ঘকাল ধরে ভাবিয়ে এসেছে। তাপ সম্বন্ধে মানুষ যখন কোন তথ্যই আবিষ্কার করেনি তখনও বুঝতে পারত উষ্ণতার পরিবর্তন ও তাপের অপরিমেয় শক্তির কথা। তাই তো কৌতূহলী মন নিয়ে আরম্ভ করেছিল তাপ সম্বন্ধে গবেষণা।

তাপ প্রয়োগে যে উষ্ণতা বাড়ে, সেই তথ্যটি বেশ কিছু জনকে আকৃষ্ট করে। তাঁদের অনেকেই চেষ্টা করেন উষ্ণতাকে সঠিকভাবে পরিমাপ করতে। কিন্তু কাজটা তো সোজা নয়!

প্রথমে যখন তাপমান যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি তখন কোন বস্তু উষ্ণ কী শীতল হাতের স্পর্শে অনুভব করা হতো। কিন্তু তাতে অসুবিধা অনেক। প্রথমতঃ তাপমাত্রা বেশী হলে হাত অগ্নিদগ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। দ্বিতীয়তঃ স্পর্শানুভূতির দ্বারা তাপের সঠিক পরিমাপ সম্ভব নয়। তা ছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয় ভুলও করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, আমরা যদি দুটি হাতের একটিকে গরম জলে এবং অপরটিকে ঠাণ্ডা জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখার পর দুটি হাতকেই ঈষদুষ্ণ জলে ডোবাই তাহলে যে হাতটি গরম জলে ডোবান ছিল সেটিতে গরম বোধ হবে আর যেটি ঠাণ্ডা জলে ডোবান ছিল সেটি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মনে হয়। অতএব স্পর্শের দ্বারা কোন বস্তুর সঠিক ভাবে তাপ নিরূপণ করা যায় না। তাই উষ্ণতা নির্ণয় করার জন্য হয়েছিল যন্ত্রের পরিকল্পনা। কারণ মানুষ ভুল করতে পারে, কিন্তু বিকল না হলে যন্ত্র ভুল করে না।

তাপমাত্রা নির্ণয়ের প্রথম প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন সেই ইটালী দেশের সুবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও। তিনি একটা যন্ত্রও নির্মাণ করেছিলেন, তবে সে যন্ত্রটি যে কেমন ছিল সে কথা বলা আজ বড় শক্ত।

গ্যালিলিওর পর অপর কোন বিজ্ঞানী উষ্ণতা মাপক কোন যন্ত্র তৈরি করেছিলেন কিনা সঠিক কিছু জানা যায় না। শেষে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সেই ইটালী দেশেরই এক বিজ্ঞানী তৈরি করেছিলেন বিশেষ ধরণের এক তাপমান যন্ত্র। বিজ্ঞানীর নাম ফ্লোরেন্স। তিনি কাচ নির্মিত একটি সরু নলের মধ্যে অ্যালকোহল রেখে থার্মোমিটার রূপে ব্যবহার করতেন। তবে তাতে দাগ কাটা ছিল না। প্রকৃত থার্মোমিটার বলতে যা বোঝায়, সেটি প্রথম আবিষ্কার করার গৌরব অর্জন করেছেন "গ্যাব্রিয়েল ফারেনহাইট"। তাঁর থার্মোমিটারটিও ছিল কাচ নির্মিত। তবে ফ্লোরেন্সের মত অ্যালকোহল ব্যবহার না করে তিনি পারদকে ব্যবহার করেছিলেন এবং থার্মোমিটারে দাগও কেটেছিলেন।

ফারেনহাইটের ধারণা ছিল মনুষ্য দেহের স্বাভাবিক তাপমাত্রা ৯৬° ডিগ্রী এবং জল ৩২° ডিগ্রীতে জমে বরফে পরিণত হয়। জল ফুটে বাষ্পে পরিণত হওয়ার অবস্থাকে ধরেছিলেন ২১২° ডিগ্রী। তাপমাত্রার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ মান তিনি নির্ধারণ করেছিলেন থার্মোমিটারকে বরফের কুচির মধ্যে রেখে এবং ফুটন্ত জলের বাষ্পের মধ্যে ধরে রেখে। এই দুই তাপমাত্রাকে নির্দিষ্ট রেখে আজও থার্মোমিটারের দাগ কাটা হয়ে থাকে। ফারেনহাইটের থার্মোমিটারের ঘর সংখ্যা ১৮০।

ফারেন হাইটের পর রোমার নামে এক বিজ্ঞানী দুই নির্দিষ্ট তাপমাত্রা অর্থাৎ হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ককে যথাক্রমে 0° এবং ৮0° ধরে আর এক ধরণের মান প্রচলন করেন। সেই মানটি আবিষ্কর্তার নামানুসারে "রোমারের মান" নামে পরিচিত।

তাপমাত্রার সেণ্টিগ্রেড মানের প্রচলন করেন সুইডেনের এক বিজ্ঞানী। নাম তাঁর "সেলসিয়াস"। তিনি হিমাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক 0° এবং ১00° ধরে অন্য একটি মানের প্রবর্তন করেন। সেই মানটিই বহুল প্রচলিত "সেণ্টিগ্রেড" মান। কখনও কখনও আবিষ্কর্তার নামানুসারে এই মানকে বলা হয় "সেলসিয়াস"।

উষ্ণতা পরিমাপে সেণ্টিগ্রেড মানটিই বেশী ব্যবহার করা হয়। আমরা শরীরের তাপমাত্রা নির্ণয়ের জন্য যে থার্মোমিটার ব্যবহার করি সেটি ফারেন-হাইটের মান অনুসারে দাগ কাটা। বর্তমানে আবার সেই থার্মোমিটারের দাগ কাটা হচ্ছে সেণ্টিগ্রেডের মান অনুযায়ী।

থার্মোমিটারের জন্য প্রয়োজন হয় সর্বত্র সমান এবং সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট একটা কাচের নল। প্রথমে কাচ নলের এক পাশ গলিয়ে নিয়ে ও অপর পাশে ফুঁ দিয়ে একটা কুণ্ড প্রস্তুত করে নেওয়া হয়। পরে কুণ্ডটিকে পারদ পূর্ণ করার পর খোলা মুখটাকে গলিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়। তারপর থার্মোমিটারের উপরে দাগ কাটার পালা। পূর্বের মত প্রথমে বরফ কুচির মধ্যে কুণ্ডটিকে স্থাপন করে ও পরে ফুটন্ত জলের বাষ্পে থার্মোমিটারকে ধরে রেখে দুটি স্থিরাঙ্ক নির্ধারণ করা হয়। সেণ্টিগ্রেড থার্মোমিটারের ক্ষেত্রে এই স্থিরাঙ্ক 0° এবং ১00°। তারপর দুই স্থিরাঙ্কের মধ্যবর্তী স্থানকে একশ সমান ভাগে ভাগ করে দাগ কাটা হয়।

থার্মোমিটারের তরল হিসাবে পারদ এবং অ্যালকোহল উভয়কেই গ্রহণ করা হয়ে থাকে। তবে পারদ ব্যবহারের সুবিধা বেশী। পারদ চকচকে, কাচের দেওয়াল ভিজায় না এবং তাপমাত্রার পরিবর্তনে পারদের আয়তনের পরিবর্তন খুব নিয়মানুগ হয়। তাছাড়া প্রসারিত হওয়ার জন্য পারদ বস্তু থেকে অতি সামান্য তাপ গ্রহণ করে। আরও সুবিধে আছে। পারদ ৩৫0° সেণ্টি-গ্রেড উষ্ণতায় বাষ্পীভূত হয় -৩৯° সেণ্টিগ্রেডে জমে যায় বলে -৩৯° থেকে ৩৫0° ভেতর যে কোন তাপমাত্রাকে মাপা সম্ভব হয়ে থাকে।

নিম্ন তাপমাত্রা নির্ণয়ের কাজে অ্যালকোহলের একটু সুবিধা আছে। অ্যালকোহলের হিমাঙ্ক -১৩0° সেণ্টিগ্রেড এবং স্ফুটনাঙ্ক মাত্র $৭৮\cdot৫^\circ$ সেণ্টি-গ্রেড। তাই অ্যালকোহল থার্মোমিটারের দ্বারা $৭৮\cdot৫^\circ$ সেণ্টিগ্রেডের উপরের তাপমাত্রা নির্ণয় করা না গেলেও নিচের দিকে -১৩0° সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা মাপা যায়। কিন্তু অ্যালকোহল জলের মত স্বচ্ছ বলে ওকে ঠিক ঠিক কাচ নলের মধ্যে দেখা যায় না। সেইজন্য অ্যালকোহলকে একটু রঙ করে নিতে হয়।

বিভিন্ন কাজের জন্য বিভিন্ন থার্মোমিটার ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যেমন আবহাওয়ার উষ্ণতা জানার জন্য চরম ও অধম থার্মোমিটার, শরীরের তাপ নির্ণয়ের জন্য ডাক্তারী থার্মোমিটার, ইত্যাদি। ডাক্তারী থার্মোমিটারের একটু বৈশিষ্ট্য আছে। ওর ভেতরের রন্ধ্র পথটা কুণ্ডের উপরে একটু বাঁকান থাকে।

মানুষের বক্তৃতাকে সঙ্গে সঙ্গে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করতে পারে। ধরা যাক, বিদেশের কোন রাষ্ট্রনায়ক এসেছেন আমাদের দেশে। আমরা বিভিন্ন ভাষাভাষি বহুজনে মিলিত হয়েছি। হয়ত তিনি বক্তৃতা দিলেন তাঁদেরই ভাষায়। কিন্তু অসুবিধা আমাদের হবে না, যদি একটি যন্ত্র থাকে। যন্ত্রটিতে বক্তৃতা আপনা হতেই টাইপ হয়ে যায় এবং অন্য ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে যায় এবং প্রচার করে। এমন আশ্চর্যজনক এই যন্ত্রটি। বড় বড় ব্যাঙ্কে আজকাল আর এক ধরনের যন্ত্র ব্যবহার করতে দেখা যায়। এই যন্ত্রটির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, কোন মানুষের হস্তাক্ষরের সত্যতা যাচাই করতে পারে। যত নিখুঁতভাবেই হাতের অক্ষরকে নকল করা হোক না কেন এই যন্ত্রের কাছে রেহাই নেই।

আমাদের অন্যান্য কিছু কিছু যন্ত্রপাতি সম্বন্ধে মানুষ সম্যক জ্ঞান লাভ করেছে বলে কৃত্রিম ভাবে হৃদয়যন্ত্র ও ফুসফুসকে শরীরে স্থাপন করে রোগীকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে ফিরিয়ে আনছে। শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে তাই এসেছে এক প্রবল আলোড়ন। মানুষ আশা করছে, সে ভবিষ্যতে সব কাজই করবে যন্ত্রের মাধ্যমে। এমনও হয়ত একদিন আসতে পারে, যেদিন জরা ও বার্ধক্যকে দূর করে দীর্ঘ যৌবন ভোগ করতে পারবে। কৃত্রিমভাবে একটা মানুষকেও তৈরি করে ফেলতে পারে। বিজ্ঞানের দ্বারা সবই সম্ভব। প্রকৃতি আজ পরাজিত হয়েছে মানুষের কাছে। বিজ্ঞানের কাছে আজ মানুষের, এই সভ্যতার পরিণাম কোথায়।

✪ মহাকাশযান ✪

সুদূরের পিয়াসী মানুষ। ঐ অসীম নীলাকাশ বারে বারে তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে। কিন্তু কোথায় তার ঠিকানা ? দিগন্ত বিস্তৃত আকাশটাকে কেন্দ্র করে মানুষ যুগে যুগে চালিয়েছে তার কল্পনার পথ। প্রাচীন মহাকাব্যকার থেকে আরম্ভ করে উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত কত কবি কত লেখক কাল্পনিক মহাকাশ অভিযানের কথা ব্যক্ত করে গেছেন। তাতে সাহিত্যের পুষ্টি হয়েছে বটে কিন্তু মহাকাশ পরিক্রমার পথ এতটুকু পরিষ্কার হয়নি। এতকাল ধরে মানুষ মনের সাধ মনেই গোপন করে রেখেছিল। শেষে ১৯৫৮ সালে মহাকাশযান তথা কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে স্থাপন করে মানুষ দীর্ঘদিনের আশাকে বাস্তবে রূপ দিল।

মহাকাশযানের কথা আলোচনা করতে হলে মহাকাশের কথাও একটু বলতে হয়। পৃথিবীর উপরিভাগে যতদূর পর্যন্ত বায়ুস্তর ঘিরে রেখেছে, ততদূর পর্যন্ত আমরা মহাকাশ বলব না। আপাততঃ একশ মাইল বা তারও উপর থেকে মহাকাশ সুরু। পৃথিবীর সর্ব নিম্ন বায়ুস্তরে পরিভ্রমণ করা আদৌ কষ্টকর নয়। কিন্তু উপরের দিকে বায়ু ক্রমশঃ পাতলা। সেখানে অক্সিজেন নেই। তারও

উপরে বিরল বায়ুকণা সব সময় আয়নিত হচ্ছে, প্রবেশ করছে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মি, আর আছে অগণিত উল্কাপাত। এত বাধা অতিক্রম করে মহাকাশে পাড়ি দেওয়া যায় না। কোন জীবের পক্ষেও সাধ্য নয়। তাই মহাকাশে ভ্রমণ করতে হলে চাই এমন একটি বাহন, যা উপরের সব কিছু বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করতে পারবে। কিন্তু কে উপযুক্ত বাহন?

বাধার কথা মানুষ অনেক আগে থেকেই বুঝতে পেরেছিল। আরও বুঝেছিল, পৃথিবীর টান বা আকর্ষণ বলকে ছিন্ন করা কষ্টকর। যেদিন মানুষ রকেটের কার্যপ্রণালী সম্যক উপলব্ধি করতে পারল, সেইদিন তার মাথায় ভর করল আর এক চিন্তা—রকেটের মাথায় কোন কিছু বসিয়ে উপরে উৎক্ষিপ্ত করা যায় কিনা? মহাকাশযান নির্মাণের কল্পনার সেই থেকে উদ্ভব।

বিজ্ঞানীদের মতে মহাকাশযান নির্মাণের পেছনে "জিওলকভস্কি" নামে এক রুশ বিজ্ঞানীর অবদান সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে আছে। আজন্ম বধির, লাজুক ও নম্রস্বভাব এই বিজ্ঞানী ছিলেন এক দরিদ্র স্কুল শিক্ষক। মহাকাশে যাত্রা করা যে একমাত্র রকেটের সাহায্যে সম্ভব সে কথা মনে হয় তিনিই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। তাই রকেট যাতে খুব দ্রুতগামী হয় তার চেষ্টা করেছিলেন জিওলকভস্কি। রকেটের উন্নতিসাধনের জন্য তিনিই প্রথম বিস্ফোরক পদার্থের পরিবর্তে দাহ্য ও দাহক হিসাবে দুটি তরল পদার্থকে ব্যবহার করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা মত বর্তমানে রকেটগুলিতে দুটি পৃথক কক্ষে রক্ষিত তরল পদার্থকে পাম্পের দ্বারা সংমিশ্রণ করে অগ্নি সংযোগ করা হয়।

এরপর এক ফরাসী বিজ্ঞানীর নাম করা যেতে পারে। নাম "রবেয়ার এনোপেল তেরি"। রকেটযোগে চাঁদে এবং গ্রহান্তরে যাওয়ার এক চমৎকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন তিনি। রকেটের গতিপথ ও গতিবেগ নিয়ন্ত্রণের সমস্যা, তাপাধিক্য ও ওজনহীনতার জন্য মহাকাশচারীর শরীরের সম্ভাব্য সমস্যা প্রভৃতি সমাধানের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য, তাঁর প্রদত্ত তথ্য সেদিন কেউ বুঝতে পারেন নি। যদি তাঁর তথ্যকে সেদিন অবহেলা করা না হত তাহলে মহাকাশ যাত্রা এত বিলম্বিত হত না।

মহাকাশ যাত্রার আদিপর্ব রকেটের উন্নতিসাধনের ইতিহাস। বিজ্ঞানীদের স্থির বিশ্বাস ছিল, রকেটকে অত্যন্ত দ্রুতগামী করতে না পারলে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তিকে ছিন্ন করা যাবে না এবং মহাকাশযাত্রা দুরাশা মাত্র। সেই কারণে যত প্রতিভা সবই নিয়োজিত হয়েছিল রকেটের পেছনে।

দীর্ঘ গবেষণার পর রকেটকে নব জীবন দান করেন মার্কিন বিজ্ঞানী 'গডার্ড'। পদার্থ বিদ্যার অধ্যাপক ছিলেন তিনি। ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি যে রকেটটি উৎক্ষেপন করেছিলেন তার গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ৭৫০ মাইল। এই গতিবেগ অবশ্য পৃথিবীর আকর্ষণ বলকে ছিন্ন করতে পারে না। তবুও সাড়ে সাত হাজার ফুট উপরে তিনি রকেটটি তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন।

গডার্ডের পর রকেট চর্চায় যিনি খ্যাতি অর্জন করেন তিনি বিখ্যাত জার্মান পদার্থ বিজ্ঞানী "হেরমান ওবের্থ"। তিনি একখানি পুস্তকে মহাকাশ অভিযানের

তার জন্য মানুষের দেহ থেকে থার্মোমিটার বের করে আনলে বাইরের তাপমাত্রা কম থাকা সত্ত্বেও পারদ বাঁকানো পথ দিয়ে সহজে নেমে আসতে পারে না। অথচ প্রসারিত হতেও তার কোন অসুবিধা হয় না।

আজকাল অতিশয় উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রা মাপার জন্য বহু থার্মোমিটার আবিষ্কৃত হয়েছে। তাদের মধ্যে প্রথমে গ্যাস থার্মোমিটারের নাম করা যেতে পারে। ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী প্রিন্সেপ এই থার্মোমিটার আবিষ্কার করেন। এটি উচ্চ তাপমান যন্ত্র—নাম "পাইরোমিটার"। পরবর্তিকালে ডেভি, রেনোঁ, ক্যালেণ্ডার প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা এই থার্মোমিটারের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে গেছেন।

সর্বনিম্ন তাপমাত্রার ক্ষেত্রে একটা সীমারেখা আছে। অর্থাৎ -২৭৩° সেণ্টি-গ্রেডের তলায় আমরা তাপমাত্রার কল্পনা করতে পারি না। ঐ তাপমাত্রাকে বলা হয় চরম শূন্য। এত নিম্ন তাপমাত্রায় অ্যালকোহল থার্মোমিটার অচল। তাই সর্ব নিম্ন তাপমাত্রার ক্ষেত্রে অর্ধপরিবাহী বা সেমিকনডাক্‌টিং পদার্থ, যেমন পরিশুদ্ধ অঙ্গার নির্মিত বিদ্যুৎ রোধক ব্যবহার করা হয়।

উচ্চ তাপমাত্রা সম্পর্কে কোন পরিসীমা নেই। গবেষণাগারে বিস্তৃত পরিবেশে অতি অল্পক্ষণের জন্য হলেও তিন হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে। পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের দ্বারা পৃথিবী পৃষ্ঠে কয়েক মিলিয়ন ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড তাপ সৃষ্টি হয়। সূর্য দেহের আভ্যন্তরীন তাপমাত্রা ২০ মিলিয়ন ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড। মহাশূন্যে এমন সব নক্ষত্র আছে যাদের দেহের তাপমাত্রা সূর্য অপেক্ষাও অনেক বেশী। এত উচ্চ তাপমাত্রা মানুষের পক্ষে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। তবে এক হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রা অতি সহজেই নির্ণয় করা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে প্লাটিনাম থার্মোমিটার। অতি উচ্চ ও নিম্ন তাপমাত্রার সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্য থার্মোকাপল এবং থার্মোপাইল ব্যবহার করা হয়। থার্মোকাপল নির্মাণের জন্য তামা ও কন্‌স্ট্যানটিন নামক মিশ্র ধাতুর তার, মলিব্‌ডেনাম ও টাংস্টেন তার প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। থার্মোকাপল -২০০° সেণ্টিগ্রেড থেকে হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত তাপমাত্রাকে পরিমাপ করতে পারে।

✪ অসিলোগ্রাফ ✪

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বিজ্ঞানী গোল্ডস্টাইন একটা পরীক্ষা করেছিলেন। পরীক্ষাটি ছিল নিম্নরূপ—

একটি গ্যাসপূর্ণ বদ্ধ কাচনলের এক প্রান্তে ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার বা ক্যাথড এবং অন্য প্রান্তে ধনাত্মক তড়িৎদ্বার বা অ্যানড সংযুক্ত করে ধীরে ধীরে কাচনলের অভ্যন্তরস্থ গ্যাসের চাপকে কমিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করেছিলেন। গ্যাসের চাপ

কমতে কমতে যখন ০'০০০১ মিলিমিটারে পৌঁছেছিল তখন এক আশ্চর্য ধরণের রশ্মি নির্গত হয়েছিল। এই আলোকরশ্মি ক্যাথড বা ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার থেকে নির্গত হয়েছিল বলে গোল্ডস্টাইন উক্ত রশ্মির নাম দিয়েছিলেন ক্যাথড রে বা ক্যাথড রশ্মি।

সেদিন গোল্ডস্টাইন পরীক্ষাটির ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। পরে নানাবিধ পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়, তড়িৎগ্রস্ত ইলেকট্রন কণিকারা সোজা পথে প্রবলবেগে ক্যাথড থেকে অ্যানডের দিকে প্রবাহিত হয়ে এই ধরনের রশ্মি সৃষ্টি করে। তাই ক্যাথড রে ইলেকট্রন স্রোত ছাড়া আর কিছুই নয়। এরা গ্যাসকে আয়নিত করতে পারে এবং কঠিন পদার্থের ভেতর দিয়েও প্রবাহিত হতে পারে।

ক্যাথড রের এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে যে অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্রটির উদ্ভব হয়েছে সেটির নাম অসিলোগ্রাফ।

পূর্বে রেডারের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে অসিলোগ্রাফের কথা বলা হয়েছে। কেবল রেডার নয়, টেলিভিশন এবং আধুনিক চিকিৎসার যন্ত্রপাতি নির্মাণেও প্রয়োজন হয়ে থাকে অসিলোগ্রাফের। এই যন্ত্রকে অসিলোস্কোপও বলা হয়ে থাকে। এটি একটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র এবং ইলেকট্রন বিজ্ঞানের একটি মহত্তর অবদান।

অসিলোগ্রাফ প্রকৃতপক্ষে বায়ুশূন্য একটি ক্যাথড রে টিউব। এক পাশে থাকে ক্যাথড বা ঋণাত্মক তড়িৎদ্বার, অপরপাশে বসান থাকে একটি পর্দা। টিউবের ভেতরে পর পর বসান থাকে একটি ইলেকট্রন রশ্মি কণ্ট্রোল ইলেকট্রোড, দুটি অ্যানড বা ধনাত্মক তড়িৎদ্বার এবং বিক্ষেপণ প্লেট। বিদ্যুৎ প্রবাহের দ্বারা ক্যাথডকে উত্তপ্ত করলে ইলেকট্রন নির্গত হয় এবং অ্যানডের দিকে প্রবাহিত হয়। তারপর সেই ইলেকট্রনগুচ্ছ অ্যানডকে অতিক্রম করে বিক্ষেপণ প্লেটের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে শেষ প্রান্তে ফ্লুওরিসেণ্ট পর্দার উপর প্রতিফলিত হয়।

বিক্ষেপণ প্লেট দুটিতে একটি নির্দিষ্ট কম্পন সংখ্যার বিভব প্রভেদ প্রয়োগ করা হয়। এই বিভব প্রভেদ একটা নিম্নতম মান থেকে নির্দিষ্ট হারে বর্ধিত হতে থাকে এবং এক সময় সর্বোচ্চ মান প্রাপ্ত হয়। তারপর বিভব প্রভেদ কমতে কমতে একেবারে নিম্নতম মানে ফিরে আসে। এই ব্যাপারটা ঘটে খুবই তাড়াতাড়ি।

বিভব প্রভেদ বাড়া এবং কমার সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রন রশ্মির তরঙ্গের আকারে পর্দার উপর এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়। ফলে দেখা যায় ফ্লুওরিসেণ্ট পর্দার উপর একটি উজ্জ্বল আলোক রেখা ফুটে উঠেছে। প্রয়োজন হলে ফটোগ্রাফিক প্লেট যুক্ত করে ছবি তোলারও ব্যবস্থা থাকে।

টিউবের মধ্যে যে দুটি বিক্ষেপণ প্লেট ব্যবহার করা হয় তাদের কাজ ভিন্ন ভিন্ন। প্রথম বিক্ষেপণ প্লেট পর পর দুটি ক্ষণস্থায়ী বিভব প্রভেদ সৃষ্টি করলে ইলেকট্রন রশ্মি পর্দার উপর দুটি স্থানে বিক্ষিপ্ত হয় এবং তাদের দূরত্ব থেকে দুটি সঙ্কেতের মধ্যে সময়ের ব্যবধান জানা যায়। দ্বিতীয় বিক্ষেপণ প্লেটটির দ্বারা বিভবের কম্পন সংখ্যা উচ্চ করা হয়ে থাকে। এর দ্বারা যে সঙ্কেত লাভ করা যায় তাতে অতি সামান্যতম সময়ের ব্যবধানও নির্ণয় করা হয়ে থাকে।

রেডারে ব্যবহৃত অসিলোগ্রাফ যন্ত্রে প্রেরক যন্ত্র থেকে প্রেরিত বেতার তরঙ্গ প্রতিফলকে বাধা পেয়ে ফিরে আসতে যে স্বল্প সময় ব্যয় হয় তাও ধরা পড়ে যায়। সময়ের সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম ব্যবধান নির্ণয় করার জন্য এমন নির্ভরযোগ্য যন্ত্র আর নেই।

চিকিৎসা জগতে অসিলোগ্রাফ যন্ত্রকে কাজে লাগিয়ে বহু জটিল বিষয়ের মীমাংসা করা হয়। অসিলোগ্রাফ সম্বলিত একটি যন্ত্রের নাম "ইলেকট্রো এনসেফালোগ্রাফ"। সাধারণতঃ মৃগীরোগ, মস্তিষ্কে ভাইরাস ঘটিত রোগ এবং কোন অপরাধীর মস্তিষ্কের অবস্থা নির্ণয়ের জন্য এই যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যন্ত্রটি আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে। আবিষ্কর্তা প্রসিদ্ধ জার্মান শারীরতত্ত্ববিদ 'স্যার হানস বার্জার'। যন্ত্রটির প্রধান অংশই হচ্ছে একটি অসিলোগ্রাফ। যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত থাকে কতকগুলি স্বল্প তড়িৎ পরিবাহী ছোট ছোট তড়িৎদ্বার। রোগীর মাথার চামড়ার সঙ্গে তড়িৎদ্বারগুলি আটকে দেওয়া হয়। স্বল্প তড়িৎ পরিবহণের ফলে রোগী বা অপরাধী কোনরূপ যন্ত্রণা অনুভব করে না।

এখানে ব্যবহৃত অসিলোগ্রাফ যন্ত্রে একটি লেখনীর সংযোগ থাকে। বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালনা করলে মস্তিষ্কের কোষ সমূহের বিদ্যুৎ লেখনীর দ্বারা একটি পর্দার উপর রেখাচিত্র অঙ্কন করে। সেই রেখাচিত্র থেকে বোঝা যায় মস্তিষ্কের অবস্থা। বলা বাহুল্য সুস্থ মস্তিষ্কের রেখাচিত্র এবং অস্থির মস্তিষ্কের রেখাচিত্র সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের হয়ে থাকে।

স্বয়ংক্রিয় রেখাচিত্র অঙ্কনের আর একটি যন্ত্রের নাম ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ। অসিলোগ্রাফ যন্ত্রের মতই এর কার্যপ্রণালী। বিশেষ করে হৃদরোগাক্রান্ত ব্যক্তির হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সঠিকভাবে নিরূপণ করার জন্য যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রটি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে ওলন্দাজ শারীরতত্ত্ববিদ ডবলিউ আইন থোভেন কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে। এই যন্ত্রের সঙ্গেও যুক্ত থাকে কয়েকটি তড়িৎদ্বার। তড়িৎদ্বারগুলি রোগীর হাতে অথবা শরীরের অন্য কোথাও চামড়ার সঙ্গে আটকে দেওয়া হয়। ফলে হৃৎপিণ্ডের অবস্থা একটা রেখার মাধ্যমে ফুটে উঠে। বড় বড় হাসপাতালে করোনারি থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসার জন্য ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ ব্যবহার করতে দেখা যায়। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন সঠিকভাবে নির্ণয় হওয়ার জন্য চিকিৎসকদের রোগীকে চিকিৎসা করতে সুবিধা হয়।

✪ আলোকের স্বরূপ ✪

আমাদের চোখ দুটি যেন স্পর্শমণি। যা কিছু আমাদের চোখে পড়ে সবই সজীব হয়ে উঠে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, গাঢ় অন্ধকারে চোখ দুটি খুলে রাখলেও আমরা কিছু দেখতে পাই না। দেখার জন্য প্রয়োজন হয় আলো। এই আলো এমন একটি জিনিস, যাকে আমরা চোখে দেখতে পাই না অথচ যেই বস্তুর উপর

আলো পড়ে সেই বস্তুটিকে দেখি। যেমন ধরা যেতে পারে, ঘরের মধ্যে একটা মোমবাতি জ্বলছে। মোমবাতি থেকে এমন কিছু নিঃসরণ হচ্ছে যা আশেপাশের চেয়ার, টেবিল, আলমারি, বই, সব কিছুকে দৃষ্টিগোচর করে তুলছে।

এই আলোটা কী? কেমন করেই বা প্রজ্বলন্ত কোন বস্তু থেকে ছুটে এসে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়ের একটি ইন্দ্রিয় চক্ষুতে অনুভূতি জাগায়?

চিন্তাটা বিজ্ঞানীদের অনেক দিনের। তবে এ সম্বন্ধে প্রথম যিনি আলোকপাত করেছিলেন, তিনি বিজ্ঞানী কূলধন্য মহামতি নিউটন। নিউটন বলেছিলেন, কোন আলোকিত বস্তু থেকে সব সময় ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসছে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উজ্জ্বল কণিকা। তারা এত ক্ষুদ্র যে তাদের ওজনও নেই। কণিকাগুলি চারদিকে সরল-রেখায় ছুটে গিয়ে চারপাশের বস্তুর উপর পড়ে এবং আমাদের চোখে আঘাত করে। তাই আমরা বস্তুকে আলোকিত দেখি। নিউটনের এই মতবাদকে বলা হল কণিকাবাদ বা কণিকাতত্ত্ব।

কণিকাতত্ত্বের সাহায্যে আলোর কিছু কিছু ধর্মকে ব্যাখ্যা করা গেলেও সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায়নি। বিজ্ঞানীরা আবার ভাবতে শুরু করেন। ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত ওলন্দাজ বিজ্ঞানী হাইগেন নতুন আর একটি তত্ত্বের অবতারণা করেন। সেই তত্ত্বটির নাম তরঙ্গবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী আলো তরঙ্গ বিশেষ। কোন আলোকিত মাধ্যম থেকে আলোক রশ্মি তরঙ্গের আকারে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। সেই তরঙ্গ আমাদের চোখে আঘাত করলেই অনুভূতি জাগে।

আলোক তরঙ্গের বাহকরূপে হাইগেন ইথারের কল্পনা করেছিলেন। তাঁর ধারণা অনুযায়ী সমগ্র বিশ্বজগৎ এক ধরনের অদৃশ্য এবং ওজনহীন পদার্থের সমষ্টি-বিশেষ। এই পদার্থের সাহায্যে প্রতিফলন, প্রতিসরণ প্রভৃতির সুষ্ঠু ব্যাখ্যা করা সম্ভব হল। কিন্তু কণিকা তত্ত্বের মত এই তত্ত্বেও থেকে গেল ত্রুটি। বিজ্ঞানীরা আবার বসলেন ত্রুটি সংশোধন করতে। এবার এগিয়ে এলেন ইয়ং, ফ্রেনল প্রভৃতি খ্যাতনামা বিজ্ঞানীরা। নতুন তত্ত্বের অবতারণা করে কিছু কিছু ত্রুটি সংশোধন করা গেলেও তাঁরা সেই কাল্পনিক বস্তু ঈথারকে বাদ দিলেন না। সিন্ধবাদ বণিকের ঘাড়ে ভূতের মত ঈথার বিজ্ঞানীদের ঘাড়ে ভর করেই থাকল।

১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ফ্যারাডে চৌম্বক ও তড়িৎক্ষেত্রের উপর আলোকের প্রভাব সম্বন্ধে গবেষণা করতে গিয়ে হঠাৎ আবিষ্কার করে বসলেন, অসমসত্ত্ব এবং স্বচ্ছ কোন বস্তুকে চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে স্থাপন করলে বস্তুটি আলোকে সক্রিয় হয়ে উঠে। ফ্যারাডের এই পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন আলোক, তড়িৎ এবং চুম্বক পরস্পর সম্বন্ধ যুক্ত।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ম্যাক্সওয়েল আবার আবিষ্কার করলেন তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই সম্পূর্ণ গাণিতিক পদ্ধতিতে প্রমাণ করলেন, আলোক প্রকৃতিতে একপ্রকার তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ ছাড়া আর কিছুই নয়। এত-দিনে বাদ পড়ল আলোকের ঈথার তরঙ্গের কথা।

প্রায় চল্লিশ বছর ধরে ম্যাক্সওয়েলের মতবাদকে সত্য বলে মেনে আসছিলেন বিজ্ঞানীরা। ততদিনে বিজ্ঞানের পরিধি হয়েছে আরও বিস্তৃত! কত বিজ্ঞানীর

কত মতবাদ জমা হয়েছে বিজ্ঞানের ভাণ্ডারে। সেই সব মতবাদের ভিত্তিতে পূর্বের মতবাদগুলিকে যাচাই করার প্রবণতা দেখা দিল বিজ্ঞানীদের মধ্যে। ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গ তত্ত্বও বাদ পড়ল না। কিন্তু যাচাই করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের সংশয় ক্রমশঃ ঘনীভূত হল। ঠিক মত মেনে নিতে পারলেন না ম্যাক্সওয়েলের মতবাদকে।

সেই সময় প্ল্যাঙ্ক নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী প্রবর্তন করলেন নতুন এক মতবাদ। আবিষ্কর্তার নামানুসারে সেই মতবাদটির নাম "প্ল্যাঙ্কের কোয়ণ্টাম থিওরী"। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে বিশ্ববিশ্রুত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন আলোকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করলেন কোয়াণ্টাম তত্ত্বকে। প্রমাণ করলেন, আলোক শক্তির নিরবচ্ছিন্ন ধারা নয়। আলোর কণিকাগুলি উৎস থেকে শক্তির আকারে গুচ্ছে গুচ্ছে নির্গত হয়।

আবার সেই কণিকাবাদ। দেখা গেল আইনস্টাইনের মতবাদ নিউটনের কণিকাবাদেরই পরিবর্তিত রূপ। ঈথারের কল্পনাকে নাকচ করলেন তিনি। তাঁর তত্ত্ব অনুসারে আলোক কণিকাগুলি শক্তির আকারে নির্গত হয়। সেই কণিকার নাম ফোটন। বিজ্ঞানীরা এবার স্থির করলেন, আলোকরশ্মি কণা এবং তরঙ্গ দুই আকারে বিরাজ করছে।

আইনস্টাইনের উপরোক্ত মতবাদটি আলোকের কোয়াণ্টাম তত্ত্ব নামে প্রসিদ্ধ। এই তত্ত্ব প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা অনেক ক্ষেত্রে সুফল লাভ করলেন। তবে দু-চার জায়গায় অকৃতকার্যও হলেন।

ইতিমধ্যে বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন ইলেকট্রনকে। কিছু কিছু বিজ্ঞানী ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে আলোকের ধর্ম প্রযোজ্য কিনা পরীক্ষা করতে এগিয়ে এলেন। আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন, ইলেকট্রনেরও আছে তরঙ্গ ধর্ম। উদ্ঘাটিত হল আর এক সত্য! দেখা গেল তরঙ্গের যেমন ফোটন রূপ আছে তেমনই কণারও আছে তরঙ্গ রূপ।

বিজ্ঞানীরা এবার দু' উপায়ে ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। যেখানে আলোকের সঙ্গে আলোকের পারস্পরিক ক্রিয়ার ব্যাখ্যা করতে হল সেখানে প্রয়োগ করলেন তরঙ্গবাদ। আর যেখানে পদার্থ এবং বিকিরণের পারস্পরিক ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে হল সেখানে প্রয়োগ করলেন কোয়াণ্টাম তত্ত্ব। পরে অবশ্য বিজ্ঞানী ডি. ব্রগলী পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করলেন, ফোটন এক মুহূর্তের জন্য একটি নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের তরঙ্গ এবং পর মুহূর্তে এটি কণিকা।

রমণ এফেক্ট :—

আগে বলা হয়েছে কোন বস্তুতে আলোকরশ্মি পড়লে কোন কোন রশ্মি শোষিত হয় আর কোন কোনটি বিকিরিত হয়ে যায়। কোন জিনিষকে লাল দেখায়, তার কারণ সেটি একমাত্র লাল ছাড়া আর সব রঙের রশ্মিগুলিকে শোষণ করে নেয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আলোকের শোষণ এবং বিকিরণ সম্বন্ধে

বহু বিজ্ঞানী বহু রকমের পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞানী লর্ড র‍্যালের পরীক্ষাটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। তিনি কোন বস্তুর অণুতে আলো কিভাবে বিকিরিত হয় সেই নিয়েই গবেষণা করেছিলেন অনেকদিন ধরে। একদিন তিনি বুঝতে পারলেন, নির্দিষ্ট কম্পন সংখ্যার আলোক তরঙ্গের সঙ্গে যদি অণুর সংঘাত ঘটে তাহলে আলোর দীপ্তির হ্রাস ঘটবে। কিন্তু কম্পন সংখ্যা আপতিত আলোর সমান থাকবে। তিনি আরও জানালেন, আলোক বিকিরণের সময় কম্পন সংখ্যার যদি হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহলে যে আলো বিক্ষিপ্ত হবে তার দীপ্তি বড়ই ক্ষীণ।

র‍্যালের আগেও দু' একজন বিজ্ঞানী ঠিক এইভাবেই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তাঁদের কেউই পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করতে পারেন নি। এক ভারতীয় বিজ্ঞানী অধ্যাপক সি. ভি রমণ আলোকের এই ধর্মের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ বোধ করেন। সেই উদ্দেশ্যে তৈরি করেন এক বিশেষ ধরনের বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্র। বস্তুর অণুতে আলোকের কম্পন সংখ্যার হ্রাস বৃদ্ধির ফলে যে আলোকের বিকিরণ ঘটে তার দীপ্তি অতীব ক্ষীণ হলেও একদিন ধরা পড়ল রমণের বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্রে। ফলে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাভ করেন নোবেল পুরস্কার। পরীক্ষালব্ধ উক্ত ঘটনাই আলোক বিজ্ঞানে রমণ এফেক্ট বা রমণ ক্রিয়া নামে প্রসিদ্ধ।

রমণ এফেক্টের ফল হয়েছে সুদূর প্রসারী। তরঙ্গ তত্ত্ব, তাপ-গতিবিদ্যা প্রভৃতি বিভাগে রমণ ক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। এবং বর্তমানে এই ক্রিয়ার সীমা ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে।

———

✪ মহাজাগতিক রশ্মি ✪

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজ্ঞানীরা এক রহস্যময় ও অন্তর্ভেদী রশ্মির সন্ধান লাভ করেন। সেই রশ্মির প্রকৃতি নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে বহু গবেষণা সত্ত্বেও অনেক তথ্য এখনও অনাবিষ্কৃত। তথাপি যে তথ্যগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে সেগুলিও চমকপ্রদ নয়।

অনেকের মতে সৌর জগতের বাহির থেকে এক ধরনের রশ্মির আগমন ঘটে এবং মহাকাশের সর্বত্র অনুভূত হয় এই রশ্মির প্রভাব। এর উৎসস্থল অতি দূরবর্তী নক্ষত্র সমূহের অভ্যন্তর ভাগ। বিশ্বের সব জায়গায়, জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে সর্বত্র অনুভূত আশ্চর্যজনক এবং অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এই রশ্মির এককালে নামকরণ হয়েছিল "মহাজাগতিক রশ্মি" বা "কসমিক রে"। এখনও অবশ্য ঐ একই নাম বহাল আছে।

মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক রের আবিষ্কার খুব বেশী দিনের নয়। ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে 'উইলসন', 'এলস্টার' প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র নিয়ে

পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার সময় আকস্মিকভাবে এই রশ্মির সন্ধান লাভ করেছিলেন।

একদিন বিজ্ঞানী উইলসন দেখলেন, আহিত তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র আপনা হতেই আধান ছড়াতে শুরু করে। তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্রটিকে অন্তরিত করে দেখলেন, সেই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটলো। তিনি এবং তাঁর সহযোগিগণ ভাবলেন, পৃথিবীজাত কোন বিকিরণ অথবা পৃথিবীর মধ্যে মিশে থাকা কোন তেজস্ক্রিয় মৌলের জন্যই এই ঘটনা ঘটেছে।

তাঁদের প্রদত্ত ব্যাখ্যায় মন ভরল না বিজ্ঞানীদের। প্রবৃত্ত হলেন মহাজাগতিক রশ্মির উৎপত্তিস্থল অনুসন্ধানে। দীর্ঘ পরীক্ষার পর তাঁরা বুঝতে পারলেন, এই রশ্মি বিকিরণের ফলে বায়ু আয়নিত হয়ে যায়।

পৃথিবীর স্থলভাগ ছাড়া অন্য কোথাও এই রশ্মি অনুভূত হয় কিনা জানার জন্যেও অনেক সচেষ্ট হলেন। তাঁদের মধ্যে 'রেনার' নামে এক বিজ্ঞানী সমুদ্রের তলদেশে কতকগুলো পরীক্ষা চালালেন। বুঝতে পারলেন, এই অদ্ভুত রশ্মি জলের তলায়ও অনুভূত হয় এবং আয়ননের ক্ষমতা রাখে। "হেস" নামে আর একজন বিজ্ঞানী বেলুনে গ্যাস ভর্তি করে পৃথিবী থেকে কয়েক-হাজার ফুট উপরে তুলে পরীক্ষা করে দেখতেন। তাঁর পরীক্ষার ফলাফল দেখে রীতিমত অবাক হয়ে গেলেন বিজ্ঞানীরা। অজানা এই রশ্মির উপরের দিকে ক্ষমতা অনেক বেশী। সেখানে বাতাসকে অতি দ্রুত আয়নিত করছে এবং দিনে-রাতে সব সময়ই অনুভূত হচ্ছে।

হেসের এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হল, মহাজাগতিক রশ্মির উৎসস্থল পৃথিবীপৃষ্ঠের কোন তেজস্ক্রিয় মৌলের জন্য নয়। আবার সূর্যও তার একমাত্র উৎসস্থল নয়। কারণ, সূর্যই যদি উৎসস্থল হত তাহলে রাতে কিছুতেই এই রশ্মি অনুভূত হত না। এতদিনে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন, এই রশ্মির উৎসস্থল পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের বাহিরে আছে।

এবার এই রশ্মিকে বিশ্লেষণ করে দেখার পালা। প্রথমে বিজ্ঞানীরা মনে করেছিলেন, এই রশ্মি অতি ক্ষুদ্র তরঙ্গ বিশেষ। এরা হয় গামা কণিকা, নয়ত ফোটন কণিকা। বিজ্ঞানী মিলিকান ঘোষণা করলেন, এই বিকিরত রশ্মি প্রোটন কণিকা ছাড়া আর কিছু নয়। সৌর জগতের বাহিরে হাজার হাজার আলোকবর্ষ দূরে যে সমস্ত নক্ষত্র অবস্থান করছে তাদের অভ্যন্তরে হাইড্রোজেনের সংযোজনের সময় যে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস গঠিত হয় তখনই উদ্ভূত হয় এই রশ্মি। অবশ্য আমাদের সূর্য থেকেও নির্গত হচ্ছে। যদিও মিলিকানের আবিষ্কারের পূর্বে ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে "বেটে" এবং কোল্‌হ্যারস্টার নামে দুজন বিজ্ঞানী 'গাইগার ম্যূলার" নামে একটি যন্ত্রের সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন মহাজাগতিক রশ্মি কতকগুলো কণিকার সমষ্টি এবং কণাগুলি বিদ্যুতাশ্রিত।

এইভাবে ধীরে ধীরে উদঘাটিত হয় আরও অনেক রহস্য। বিজ্ঞানীদের নিরলস পরিশ্রমের ফলে জানা গেল, এই রশ্মির উপাদান প্রধানতঃ প্রোটন কণিকা হলেও এতে আছে কিছু কিছু আলফা কণা, নিউট্রন, মেসন প্রভৃতি। মহাজাগতিক রশ্মির মধ্যে ভারি নিউক্লিয়াসও পাওয়া গেল। তাদের উপাদান লৌহ, অক্সিজেন,

কার্বন প্রভৃতি। তাছাড়া এই রশ্মির মধ্যে ইলেকট্রন কণিকাও থাকতে পারে।

অন্যান্য পরীক্ষাগুলি থেকে আরও জানা গেল, নক্ষত্রের আলোতে যে শক্তি বর্তমান, মহাজাগতিক রশ্মির কণিকার শক্তি তার চেয়ে কোটি কোটি গুণে বেশী। যে কোন বস্তুপিণ্ড ঐ কণিকার সংঘর্ষে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। ফলে এক ধরনের নতুন কণিকার সৃষ্টি হয়। সেই কণিকার নাম মেসন। এই কণিকাকে সচরাচর পৃথিবীতে পাওয়া যায় না।

আরও মজার কথা, মহাজাগতিক রশ্মিস্থিত বিভিন্ন কণিকাগুলি যখন পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভেদ করে পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমে আসে তখন বায়ুমণ্ডলস্থিত বিভিন্ন বস্তুকণার সঙ্গে সংঘাত হয়। তারই ফলে আরও এক ধরনের রশ্মির উদ্ভব হয়। সেই রশ্মির উপাদান মেসন, পজিট্রন ও ফোটন।

বায়ুমণ্ডলকে অতিক্রম করে আসার সময় মহাজাগতিক রশ্মি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সেখান থেকে উৎপন্ন কণিকাগুলি এক সময় তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। কেবল মেসন কণাগুলো পৃথিবীর ভূস্তর ভেদ করে নীচে চলে যায়। কিন্তু তারাও বেশীক্ষণ স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারে না। এক সময় সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে যায়।

মহাজাগতিক রশ্মি সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানী ডঃ হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার অবদান বিশেষভাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

মূল মহাজাগতিক রশ্মির উৎস সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মধ্যে এখনও আছে যথেষ্ট বিতর্কের অবকাশ। "সোয়ান" প্রভৃতি বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রে যে সৌর কলঙ্কের উদ্ভব হয়, তারই ফলে পরিবর্তিত হয় তাদের চৌম্বক ক্ষেত্র। চৌম্বক ক্ষেত্রের পরিবর্তনই হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মি বা কসমিক্ রের উৎস।

✪ শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ✪

বাতাসে জলীয় বাষ্পের উপস্থিতি এবং বায়ুর তাপমাত্রা আমাদের দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য ও অস্বাচ্ছন্দ্য বোধের একমাত্র কারণ। গরমদেশে গ্রীষ্মকালে ভয়ানক গুমোটের কথা কে না জানে? অথচ একটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে গুমোটের সময় বসে থাকলে কতই না আরাম বোধ হয়! শীতের সময়ও তাই। বাহিরে যখন হাড়-কাঁপানো শীত, প্রচুর শীতের পোষাক গায়ে জড়িয়েও দাঁত কপাটি লেগে যায় তখন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কক্ষে সাধারণ একটা জামা গায়ে দিয়েও বসে থাকতে অসুবিধা হয় না। তাই আজকাল বড় বড় অফিস, কোন কোন কলকারখানা এবং প্রেক্ষাগৃহগুলিতে শীতাতপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বায়ুর তাপমাত্রা যদি সব সময় একই থাকত এবং বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ যদি হ্রাস-বৃদ্ধি না হত তাহলে আমাদের কোন সময় অস্বস্তি বোধ হত

না। আমাদের অস্বস্তি বোধের একটা বড় কারণ বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি।

সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চল সমূহে এবং গরম দেশে জলের বাষ্পীভবন দ্রুত হয় বলে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশ বেশী থাকে। ঐ জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাতাসে যখন বেশী থাকে না তখন আমাদের শরীরের ঘাম সহজে বাষ্পীভূত হয়ে যায়। কারণ, বাতাস জলীয় বাষ্পে সম্পৃক্ত না থাকার জন্য বাতাসের জলীয় বাষ্প ধারণ ক্ষমতা যথেষ্টই থাকে। বাষ্পীভবনে শৈত্যের উৎপত্তি হয় বলে দেহের ঘাম তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যাওয়ায় বেশী অস্বস্তি বোধ হয় না।

অতএব বোঝা যায়. বায়ুতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়া এবং কমার সঙ্গে আমাদের দৈহিক অস্বস্তি বোধ বাড়ে কিংবা কমে। বাতাসের উষ্ণতা যদি বেশীও হয়, জলীয় বাষ্পের পরিমাণ কম থাকলে অস্বস্তি বোধ তেমন হবে না। জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বায়ুতে ধীরে ধীরে বাড়তে থাকলে এমন একটা পরিস্থিতি আসবে, যখন বায়ু আর এক তিলও জলীয় বাষ্পকে ধরে রাখতে পারবে না। তখন আমরা বলব, বাতাস জলীয় বাষ্প দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে। বিশেষ উপায়ে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ নির্ণয় করার ব্যবস্থা আছে।

কোন এক সময়ে একটা নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় বায়ুর কোন নির্দিষ্ট আয়তনে অবস্থিত জলীয় বাষ্পের ভরের সঙ্গে সেই আয়তনকে সেই উষ্ণতায় সম্পৃক্ত করতে যে ভরের জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন হয়, সেই দুই ভরের অনুপাতকে বলে আপেক্ষিক আর্দ্রতা। কোন কোন সংবাদপত্রে সেই দিনের আবহাওয়া সংবাদে লেখা থাকে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০%। কথাটির অর্থ হচ্ছে, সেই দিনের একটা নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুকে সম্পৃক্ত করতে যে পরিমাণ জলীয় বাষ্পের প্রয়োজন তার শতকরা ৮০ ভাগ জলীয় বাষ্প বায়ুতে আছে। সাধারণতঃ বায়ুর তাপমাত্রা যদি ৭৫° ফারেনহাইট বা ২৪° সেন্টিগ্রেড থাকে এবং ঐ তাপমাত্রায় আপেক্ষিক আর্দ্রতা যদি শতকরা ৫০ ভাগ হয় তাহলে আমাদের দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ থাকবে না। বায়ু ঐ তাপমাত্রার অধিক উষ্ণ হলে এবং জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বাড়লে অস্বস্তি অনুভূত হবেই।

উপরোক্ত নীতিটিকে কাজে লাগিয়ে শীতাতপনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। যে কক্ষকে শীতাতপনিয়ন্ত্রিত করতে হয়, সেই কক্ষের বাতায়নে বসাতে হয় একটি বিশেষ ধরনের যন্ত্র। যন্ত্রটির অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এর দ্বারা ইচ্ছামত শৈত্য উৎপাদন করা যায়। যন্ত্রে একটা ফিল্টার বা পরিশোধক ব্যবহার করা হয়। তার কাজ হচ্ছে. কক্ষের অভ্যন্তরের বায়ুকে পরিশুদ্ধ করা! আপেক্ষিক আর্দ্রতাকে হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি করার জন্য যন্ত্রটির সঙ্গে সংযুক্ত থাকে বিশেষ এক ধরনের পাখা। অর্থাৎ এক কথায় শীত, গ্রীষ্ম, আপেক্ষিক আর্দ্রতা, এমন কি বায়ুকেও নিয়ন্ত্রণ করা যায় এই যন্ত্রের সাহায্যে। সেই কারণে যন্ত্রটিকে বলা হয় নিয়ন্ত্রক যন্ত্র। নিয়ন্ত্রক যন্ত্র সমূহের এক একটির এমন ক্ষমতা যে, প্রতি ঘণ্টায় ত্রিশ লক্ষ ক্যালরি পর্যন্ত তাপ অপসারণ করতে পারে।

আগে যখন শীতাতপ নিয়ন্ত্রক যন্ত্র আবিষ্কৃত হয়নি, তখন বড় বড় বাড়ী অথবা অফিসের দরজা জানালায় খস্‌খস্‌ নামে একরকম শুকনো ঘাসের পর্দা তৈরী করে টাঙানো হত। খস্‌খসের পর্দায় জল ছিটিয়ে দিলে সেই জল বাষ্পীভূত হবার সময় ঘরের ভেতর থেকে তাপ গ্রহণ করত। তারপর ঘরটা তাপ হারাতে হারাতে এক সময় ঠাণ্ডা হয়ে পড়ত।

এখনও কোন কোন জায়গায় তেমন ব্যবস্থা চোখে পড়ে। তবে এই পুরাতন পদ্ধতি আর চলছে না। শহরের বড় বড় সৌধকে প্রায়ই শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কেবল মাত্র শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করা হয় না—কতকগুলি যন্ত্রপাতির সঠিক কার্যকারিতার জন্যও প্রয়োজন হয়।

———

✪ বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র ও বর্ণালী বিদ্যা ✪

বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র তৈরির জন্য প্রয়োজন হয় একটি কলিমেটর টিউব, একটি কাচের প্রিজম ও একটি ছোট্ট দূরবীণ।

কলিমেটর টিউবটি একটি ধাতু নির্মিত সরল চোঙ। ওর এক মুখে দুটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি অনচ্ছ কোন ধাতব পাতের ঢাকনি দিয়ে ঢেকে রাখা হয় এবং এই দুই ধাতব ঢাকনির মাঝখানে থাকে খুব সরু একটুখানি ফাঁক। কলিমেটর টিউবের অপর প্রান্তে বসান থাকে একটি উত্তল লেন্স। ধাতব পাতের ঢাকনার মধ্যস্থলে যে সরু ছিদ্রটা থাকে, সেটি ঐ উত্তল লেন্সের ফোকাসে থাকে।

কলিমেটর টিউবের যে মুখে লেন্স থাকে, সেই মুখটিকে একটি প্রিজম বা ত্রিশিরা কাচের সামনে রাখা হয়। প্রিজমের অপর পাশে স্থাপন করা থাকে ছোট দূরবীণ বা টেলিস্কোপটি। সমস্ত যন্ত্রগুলি কাঠের অথবা ধাতব পাটাতনের উপর কম উচ্চতায় ফাঁকে ফাঁকে সাজানো থাকে।

কলিমেটর টিউবের সরু ফাঁক দিয়ে অতি সামান্য আলোক রশ্মি প্রবেশ করে এবং অপর মুখের লেন্সের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে আসে। সামনে প্রিজম থাকার জন্য আলোক রশ্মি প্রিজমের পিঠে পড়ে বর্ণালীরূপে নির্গত হয়। তার কারণ, প্রিজমের দুই পিঠে আলোক রশ্মি প্রতিসারিত হয় এবং কলিমেটর টিউব থেকে নির্গত সাদা আলো বিশ্লিষ্ট হয়ে বর্ণালীর সৃষ্টি করে। দূরবীণের সাহায্যে সেই বর্ণালীকে দেখা হয় বলে প্রতিটি রঙের জন্য একটি সরু ফাঁকের প্রতিচ্ছবি পর পর সাজানো আছে দেখা যায়। দূরবীণের অক্ষিকাচের সামনে একখানা ফটোগ্রাফিক প্লেট রেখে ছবিও তোলা যায়। যদিও সে ছবির বিভিন্ন রঙ পাওয়া যাবে না তবুও সেই সাদা-কালো ছবিতে বর্ণালীর সাতটি রঙ গায়ে গায়ে লেগে থেকেও কোনটির বিস্তার কতখানি ভালভাবেই জানা যায়।

পরীক্ষাটি অতি সাধারণ সন্দেহ নাই। সূর্য রশ্মিকে বিশ্লিষ্ট করে সাতটি

রঙে ভাগ করা হয়। এইমাত্র। কিন্তু এই পরীক্ষা থেকে এবং সূর্য রশ্মিকে বিশ্লিষ্ট করা থেকে উদ্ভূত হয়েছে আলোক বিজ্ঞানের একটি বিশেষ শাখা—যার নাম বর্ণালী বিদ্যা। বিশেষত বিংশ শতাব্দীতে ঐ বিদ্যাকে প্রয়োগ করে মানুষ অসাধ্যকে সাধন করেছে।

বর্ণালী বিদ্যা বলতে বোঝায় বিভিন্ন তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট মিশ্রিত আলোককে বিশ্লেষণ করা। প্রতিসারিত ও শোষিত দু' ধরনের আলোককেই বিশ্লেষিত করা হয়ে থাকে। বিশ্লেষণ করার কাজে মূল যে জিনিসটির ব্যবহার করা হয় সেটির নাম প্রিজম। এই প্রিজমের কোন কোনটি ক্রাউন কাচ দিয়ে তৈরি, কোনটি বা কোয়ার্টজ নির্মিত। আবার কোথাও কোথাও সমতল অথবা অবতল গ্রেটিং যন্ত্র বা ঝাঁঝরি ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

অনেকের ধারণা, বর্ণালীবিদ্যা কেবল মাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু সে ধারণা ভুল। জ্যোতির্বিজ্ঞানে বর্ণালী বিদ্যার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখায় এর দান আদৌ অকিঞ্চিৎকর নয়। রমন ক্রিয়া আলোচনা করার সময় বলা হয়েছে, নির্দিষ্ট কম্পন সংখ্যার কোন আলোকের সঙ্গে যদি কোন অণুর সংঘাত ঘটে তাহলে আলোর দীপ্তির হ্রাস কিংবা বৃদ্ধি ঘটবে। 'রমন' আরও প্রমাণ করেছিলেন, আলোর ফোটন কণিকা অণুর সঙ্গে সংঘাত ঘটিয়ে পরমাণুর গতি শক্তি থেকে কিছু শক্তিসংগ্রহ করে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠে। যার ফলে আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কমে যায়। রমন আবিষ্কৃত বিশেষ বর্ণালী মাপক যন্ত্রের দ্বারা বর্ণালী বিশ্লেষণ করে পরমাণুর আভ্যন্তরীণ বল প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানা গেছে। এমনকি হাইড্রোজেনের বর্ণালীর সন্ধান করতে গিয়ে একদিন বিখ্যাত পরমাণু বিজ্ঞানী "নীলস বোর" পরমাণুর গঠনের প্রকৃত তথ্য আবিষ্কার করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

পরমাণু বিজ্ঞানে বর্ণালীবিদ্যার প্রয়োগ আরও আছে। বিশেষ করে পরমাণুর কেন্দ্রক সম্বন্ধে গবেষণায় এই বিদ্যার প্রয়োগ করে সমস্থানিক মৌলগুলিকে সনাক্ত করারও অনেক সুবিধা হয়েছে।

সমস্থানিক মৌলগুলির ক্ষেত্রে বর্ণালী বিদ্যা প্রয়োগ করে দেখা গেছে, ওদের বর্ণালী রেখার মধ্যে থাকে বেশ একটু তফাৎ। অতি সূক্ষ্ম বর্ণালীমাপক যন্ত্রেই সেই তফাৎটুকু ধরা পড়ে। হাইড্রোজেনের সমস্থানিক মৌল ডয়টেরিয়ামকে একদিন সনাক্ত করা হয়েছিল এইভাবে বর্ণালী বিশ্লেষণ করে। ডয়টেরিয়ামের আবিষ্কর্তা "ইউরে" নামে একজন বিজ্ঞানী।

এবার বর্ণালী বিদ্যার আবিষ্কারের ইতিহাসটুকু এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে এর প্রয়োগ সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল।

সূর্যের আলোককে বিশ্লেষিত করার প্রথম কৃতিত্ব অর্জন করেছিলেন বিজ্ঞানী নিউটন। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনিই প্রথম উল্লেখ করেন, সূর্যের আলো সাদা নয়। সাতটি রঙের মিশ্রণে ঐ সাদা সূর্যালোক। সেদিন অবশ্য বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র ব্যবহৃত হয়নি। তবে নিউটনের ঘোষণার পরে বিভিন্ন বিজ্ঞানী নানা ধরনের যন্ত্র-পাতি তৈরি করে এগিয়ে এসেছিলেন সূর্য রশ্মিকে বিশ্লেষণ করতে। সাত রঙ ছাড়াও

অন্য কোন রঙ আছে কিনা এ নিয়েও বহু বিজ্ঞানী গবেষণা শুরু করেন। প্রায় দেড়শ বছর পরে ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী "হার্শেল" সূর্য রশ্মির মধ্যে সন্ধান পান অবলোহিত রশ্মির। তাঁর কিছুদিন পরে বিজ্ঞানী ফ্রনহোপার নিজের তৈরি বিশেষ এক ধরনের বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য রশ্মিকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কতকগুলো কালো কালো রেখার সন্ধান লাভ করেন। তিনি প্রমাণ করেন, সূর্যালোক থেকে যে সাত রঙের বর্ণালী পাওয়া যায় তাতে থাকে অসংখ্য কৃষ্ণবর্ণের রেখা বা দাগ। আবিষ্কর্তার নামানুসারে সেই সব রেখাকে বলা হয় "ফ্রনহোপার রেখা।" ব্যাখ্যাস্বরূপ ফ্রনহোপার নিজেই উল্লেখ করেছিলেন, সূর্য থেকে আগত আলোক যখন বিশ্লেষণ মণ্ডল এবং পৃথিবীর শীতল আবহমণ্ডলকে ভেদ করে আসে তখন সেখানকার গ্যাসগুলো নিজ নিজ বর্ণালীর আলোককে শোষণ করে নেয়। সেই কারণেই দেখা যায় কালো কালো দাগ।

ফ্রনহোপার রেখা থেকে সূর্যপৃষ্ঠের তাপ এবং সূর্যের গঠন উপাদান জানা যায়। এই বিষয়ে গবেষণা করে যিনি সবচেয়ে বেশী সুনাম অর্জন করেছেন, তিনি ভারতের মহান বিজ্ঞানী ডঃ মেঘনাদ সাহা! বর্ণালী সংক্রান্ত বহু তথ্যের আবিষ্কর্তা তিনি। কেবল সূর্যের নয়, অন্যান্য নক্ষত্রদের আলোককেও ডঃ সাহা বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং ব্যাখ্যা করেছিলেন নক্ষত্রের গঠন উপাদান।

বর্ণালী বীক্ষণ দ্বারা কোন রাসায়নিক পদার্থকে বিশ্লেষণ করার পদ্ধতি প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন কারসফ ও বুনেসন নামে দুজন বিজ্ঞানী। কারসফের তথ্য থেকে জানা যায়, প্রত্যেকটি মৌলিক পদার্থের রেখাবর্ণালীর রূপ আলাদা। অর্থাৎ কোন মৌলিক পদার্থের রেখাবর্ণালীর সঙ্গে অপর মৌলিক পদার্থের রেখা বর্ণালীর একটু না একটু তফাৎ থাকবেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মানুষকে না দেখে কেবল কণ্ঠস্বর শুনেই মানুষটিকে সনাক্ত করা যায়। কারণ একজন মানুষের গলার স্বরের সঙ্গে অন্য লোকের গলার স্বরের বেশ কিছুটা বৈসাদৃশ্য আছে।

কারসফ এবং বুনেসন বর্ণালী বিশ্লেষণ করে দুটি মৌলিক পদার্থেরও সন্ধান পেয়েছিলেন। সে দুটি মৌলিক পদার্থের নাম সীজিয়াম এবং রুবিডিয়াম।

বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্রে ব্যবহৃত প্রিজম নানা রকমের হয়ে থাকে। সাধারণ বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্রে কাচ নির্মিত প্রিজম ব্যবহার করা হলেও অতি-বেগুনী রশ্মি বিশ্লেষণ করার কাজে কোয়ার্টজ নির্মিত প্রিজম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। দূরাগত নক্ষত্রের আলোককে বিশ্লেষণ করার জন্য ব্যবহৃত হয় ইন্টারফেরোমিটার নামে বিশেষ এক রকমের বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র। এতে প্রিজমের বদলে গ্রেটিং বা ঝাঁঝরি ব্যবহার করা হয়। যন্ত্রটির সাহায্যে বিভিন্ন বর্ণের আলোকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যও পরিমাপ করা সম্ভব হয়েছে। বিজ্ঞানী ফাব্রি এবং বিজ্ঞানী 'পেরো' এই বিষয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন।

মহাকাশের খবর সংগ্রহের ব্যাপারে বর্ণালী বিদ্যা এখন একরকম অপরিহার্য হয়ে উঠেছে! এই উদ্দেশ্যে আলোক তরঙ্গের ক্ষেত্রে আর একটি বিশেষ তত্ত্ব প্রয়োগ করা হয়। সেই তত্ত্বটির নাম "ডপলার তত্ত্ব"। এই তত্ত্ব অনুযায়ী কোন নক্ষত্র পৃথিবীর দিকে এগিয়ে এলে তার বর্ণালী বেগুনী আলোক দিকে একটু

সরে যায়। আবার কোন নক্ষত্র যদি দূরে সরে যায় তাহলে তার বর্ণালী লাল আলোর দিকে সরে যাবে। এই পরীক্ষা থেকে জানা যায় কোন নক্ষত্র কোন্ দিকে কত গতিবেগ নিয়ে এগিয়ে চলেছে।

তাছাড়া নক্ষত্রদের আবর্তন সম্বন্ধেও বেশ কিছু মূল্যবান তথ্য জানা যায় নক্ষত্রের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে। দেখা গেছে, কেবল গ্রহরা নয়, নক্ষত্ররাও নিজ মেরু অবলম্বনে আবর্তন করে। ঘূর্ণায়মান নক্ষত্রদের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, বর্ণালীতে আছে কতকগুলো আড়াআড়িভাবে রেখা। নক্ষত্রদের আবর্তনের ফলে রেখাগুলি বেশ চওড়া হয়। নক্ষত্র যত দ্রুত আবর্তন করে তার রেখা তত বেশী চওড়া।

এক কথায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নক্ষত্র জগৎ সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করতে হলে বর্ণালী বিদ্যা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। আজকের দিনে অকল্পনীয় মহাবিশ্বের যে রূপটি বিজ্ঞানীরা শোনাচ্ছেন তার মূলে আছে বর্ণালী বিদ্যা। ভবিষ্যতে এই বিদ্যার আরও উন্নতি হবে।

———

✪ গ্যাসের আলো ✪

এক ছিলেন তরুণ। নাম তাঁর মার্ডক্। একদিকে তিনি ছিলেন যেমন কর্মঠ ও বুদ্ধিমান, অপরদিকে লেখাপড়ার প্রতি ছিল তেমনই আগ্রহ। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর। গরীব পিতার সন্তান বলে বেশিদিন স্কুলে পড়ার সুযোগ পেলেন না। তাই সেই বয়সেই রোজগারের জন্য নিযুক্ত হতে হল গরু চরানোর কাজে।

মার্ডকের বয়স তখন বার থেকে চৌদ্দ-এর মধ্যে। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত পাহাড়তলিতে গরুর পাল নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াতেন আর সন্ধ্যে হলেই ফিরে আসতেন বাড়িতে। সঙ্গে একটি থলিতে থাকতো ছুরি, কাঁচি, পেরেক, হাতুড়ি, বাটালি এবং ছোট্ট একটি করাত। যখন গরুগুলো বিশ্রাম করতো অথবা একমনে ঘাস খেতো তখন মার্ডক তাঁর যন্ত্রপাতি বার করে কাঠ কিংবা শোলাকে কেটে কত চমৎকার চমৎকার খেলনা, টুপি প্রভৃতি তৈরি করতেন। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এসেও চুপচাপ বসে থাকতেন না। তখনও চলতো তাঁর যন্ত্রপাতির কাজ।

মার্ডকের হাতের কাজ দেখে বিস্মিত হতেন সবাই। পাড়াপড়শী আত্মীয়-স্বজনের ধারণা হলো, মার্ডক যদি কোন একটি কারিগরি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করার সুযোগ পেতো তাহলে ভবিষ্যতে একজন দক্ষ কারিগর হয়ে উঠতো। মার্ডকের পিতা শুনতেন সব কথা আর আপন অক্ষমতা স্মরণ করে কেবলই দীর্ঘশ্বাস পরি-ত্যাগ করতেন।

আরও একটু বড় হলেন মার্ডক। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর যন্ত্রপাতির নেশাও প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠলো। মনে রঙীন স্বপ্ন আর প্রবল উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

একদিন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, কারখানার মিস্ত্রীদের মত তিনিও একজন বড় মিস্ত্রী হবেন। কিন্তু কেমন করে লাভ করবেন তেমন সুযোগ!

একবার এক ভদ্রলোক মার্ডককে জানালেন, মাঝে মাঝে বড় বড় কারখানাগুলো শিক্ষানবীশ হিসাবে তরুণদের গ্রহণ করে থাকে। মার্ডক ইচ্ছা করলে বার্মিংহাম শহরে গিয়ে খোঁজ খবর নিতে পারেন।

কথাটা মার্ডকের খুবই মনে ধরলো। একদিন পিতাকে বললেন: আমি শহরে গিয়ে কোন কারখানায় কাজ শিখতে চাই বাবা। পুত্রের কথা শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লেন পিতা। বললেন: লেখাপড়া জানা নেই, পয়সা-কড়ি নেই, কেমন করে কাজ শিখবি সেখানে? মার্ডক হেসে বললেন: শুনেছি, ওরা বিনি পয়সায় কাজ শেখায় এবং একটা মাসোহারাও দেয়। একবার খোঁজ করে দেখাই যাক না কেন, যদি তেমন কোন কাজ জুটে যায়।

খুশি হয়ে পিতা সম্মতি দান করলেন। আর মার্ডকও বেরিয়ে পড়লেন কাজের খোঁজে।

শহরে গিয়ে একটা বড় কারখানার মালিকের সঙ্গে দেখা করলেন মার্ডক। অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে শিক্ষানবীশ হিসাবে তাঁকে গ্রহণ করার জন্যে পীড়াপীড়ি করলেন। মার্ডকের ব্যবহার এবং বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা দেখে মালিকের খুবই ভাল লাগলো। তৎক্ষণাৎ তিনি তাঁকে গ্রহণ করলেন শিক্ষানবীশরূপে।

এত সহজে কাজটা পেয়ে যাবেন বলে মার্ডকের ধারণাই ছিল না। ভারি আনন্দিত হলেন তিনি এবং খুব মন দিয়েই কাজ শিখতে আরম্ভ করলেন।

অল্পদিনে মার্ডকের কাজের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল কারখানায়। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞ মিস্ত্রীদেরও তাঁর কাছে হার মানতে হল। যেন একেবারে জাত শিল্পী! যা একটিবার দেখেন, তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আয়ত্ত করে নেন। খুব প্রীত হলেন মালিক এবং কয়েক মাসের মধ্যেই একজন স্থায়ী কারিগর হিসাবে তাঁকে নিয়োগ করলেন কারখানায়।

মার্ডক ছিলেন একেবারে কাজ-পাগল যাকে বলে। দুর্দান্ত পরিশ্রমও তিনি করতে পারতেন। এমনকি কাজের শেষে বাসায় এলেও এক দণ্ড বিশ্রাম করতেন না। নিজের যন্ত্রপাতি দিয়ে খেয়াল-খুশি মত এটা ওটা তৈরি করতেন। এক-কথায় কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে ভালবাসতেন তিনি। কিন্তু আজকের মত বিজলীবাতির প্রচলন সে যুগে না থাকায় রাতে কাজ করার ছিল ভয়ানক অসুবিধা। লণ্ঠন জ্বালিয়ে যেটুকু আলো পাওয়া যেত, তাতে কোন সূক্ষ্ম কাজ করা যেত না। বড্ড অসুবিধা অনুভব করলেন মার্ডক। মনে মনে ঠিক করলেন, যেমন করে হোক এই অসুবিধা তাঁকে দূর করতেই হবে।

সুরু হলো মার্ডকের চিন্তা-ভাবনা। সে কী চিন্তা! কাজ করার সময় ভাবেন, বেড়াতে গেলে ভাবেন, এমনকি খেতে-শুতে গেলেও ভাবেন। ভাবতে ভাবতে একদিন মনে এলো, কয়লা পোড়ানোর সময় তাপ ও আলো দুইই পাওয়া যায়। আবার কয়লা যখন পুড়তে থাকে তখন পাওয়া যায় প্রচুর ধোঁয়া। সেই ধোঁয়াটা কী দাহ্য? একবার পরীক্ষা করে দেখলে কেমন হয়!

যেইই ভাবা সেইই কাজ। একদিন রাতে মার্ডক একটা কেট্‌লিকে কয়লা ভর্তি করে জ্বলন্ত উনানে চাপালেন। উপরের মুখটা ভালভাবে বন্ধ করে দিলেন আর কেট্‌লির নলটার সঙ্গে যুক্ত করলেন একটা রবারের নল। তারপর নলের শেষ প্রান্তটা একটি মোটা ধাতব চোঙের তলায় বায়ু নিরুদ্ধ করে যুক্ত করলেন। চোঙের অপর প্রান্তেও যুক্ত করলেন আর একটি রবারের নল। এই নলের অপর প্রান্তটা একটা শোলার ছিপি দিয়ে বন্ধ করে ছিপিতে একটা খুব সরু ছিদ্র করলেন।

কেট্‌লির কয়লা উত্তপ্ত হতেই ছিদ্র দিয়ে হুস্ হুস্ করে গ্যাস বার হতে আরম্ভ করলো। অমনি মার্ডক গ্যাসের মুখে ধরলেন একটি জ্বলন্ত কাঠি। আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলো গ্যাস। সে কী তীব্র ও চোখ ধাঁধান আলো। নিজের কাজে নিজেই অবাক হলেন মার্ডক।

মার্ডকের আবিষ্কারের কথাটা দেখতে দেখতে ছড়িয়ে পড়ল এখানে ওখানে। অনেকেই এই অসম্ভব ব্যাপারটা দেখার জন্য ছুটে এলেন। এলেন বন্ধু-বান্ধব, এলেন কারখানার মালিক, এলেন অগণিত কৌতূহলী দর্শক। এমন কি বিজ্ঞানীরাও বাদ পড়লেন না। শেষ পর্যন্ত ডেভির মত নামকরা বিজ্ঞানীও একদিন ছুটে এলেন মার্ডকের কাছে। মার্ডক ডেভিকে ভালভাবে বুঝিয়ে দিলেন ব্যাপারটা। শেষে মত প্রকাশ করলেন, কয়লার গ্যাসের সাহায্যে লণ্ডনের মত বিরাট বিরাট শহরকেও আলোকিত করা যেতে পারে।

ডেভি কিন্তু বিশ্বাস স্থাপন করতে পারলেন না মার্ডকের কথায়। অবিশ্বাসের হাসি হাসতে হাসতে স্থান পরিত্যাগ করলেন।

মার্ডক কিন্তু দমবার পাত্র ছিলেন না। বরং ডেভির অনাস্থা তাঁর উৎসাহকে বহুগুণে বাড়িয়ে দিল। আগে তাঁদের বার্মিংহাম শহরটাকে আলোকিত করার জন্য প্রচেষ্টার পর প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন। কিন্তু এত অর্থ তাঁর কোথায়? অগত্যা বন্ধু-বান্ধবদের অনুরোধ করলেন কিছু সাহায্যের জন্য। কিন্তু কেউ এগিয়ে এলো না। অধিকন্তু ঠাট্টা বিদ্রূপও করলো অনেকে।

এবারও উদ্যম হারালেন না মার্ডক। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, গ্যাস জ্বালিয়ে শহরকে আলোকিত করা যাবেই যাবে।

মার্ডক তাঁর পরিকল্পনার কথা জানালেন কারখানার মালিককে। কি ভেবে মালিক কিছু অর্থ সাহায্য করতে সম্মত হলেন। মার্ডক খুশি হয়ে আরম্ভ করলেন কাজ। কিন্তু খুব গোপনে সংগ্রহ করলেন কয়লা, গোপনে কিনে আনলেন শ' শ' গজ রবারের নল এবং তৈরি করলেন বয়লার ও গ্যাস ট্যাঙ্ক। পরিশেষে একদিন রাতে শহরের লোক দেখতে পেল, চারিদিকে আলোর বন্যা। সারা শহর আলোয় আলোময় হয়ে উঠেছে। মার্ডকের এই অসাধারণ কীর্তি দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সবাই। পরদিন সকালে তাঁর জয় জয়কার পড়ে গেল। কারখানার সামান্য এক কারিগর হয়েও শ্রেষ্ঠ আবিষ্কারকের গৌরব অর্জন করলেন। অধ্যবসায় এমনই জিনিস।

মার্ডকের আবিষ্কারের পর থেকে বৈদ্যুতিক বাতি আবিষ্কারের পূর্ব পর্যন্ত পৃথিবীর সব শহরকে আলোকিত করা হতো গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে। বর্তমানে

যদিও গ্যাস আলো ব্যবহার করা হচ্ছে না তবুও ল্যাবর‍্যাটরিতে কাজ করার সময় এখনও কয়লা থেকে গ্যাস তৈরি করে গ্যাস বার্ণার জ্বালানো হয়।

✪ পোলিও রোগের টিকা ✪

এক ছিলেন তরুণ ডাক্তার। চিকিৎসা করা যেমন ছিল তাঁর পেশা, তেমনই গবেষণা করা ছিল নেশা। বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে বিভিন্ন রোগ-জীবাণু সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য প্রতিদিন একটা নির্দিষ্ট সময় ধরে গবেষণা করতেন তিনি। বড় কিছু একটা আবিষ্কার করা হয়ত তাঁর ইচ্ছা ছিল না।

ডাক্তারের ছিল দয়ার শরীর। মানুষের সেবা করার ব্রত নিয়েই তিনি চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। অর্থের প্রতি কোন আকর্ষণ ছিল না। তাই অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে। বহু দূর দূর জায়গা থেকে সুচিকিৎসার জন্য মানুষ ছুটে আসতো তাঁর কাছে। তিনি তখন এক হাসপাতালের ডাক্তার।

একবার এলেন এক মা—তাঁর শিশুপুত্রকে কোলে করে। শিশুটির হয়েছিল পোলিও রোগ বা শিশু পক্ষাঘাত। রোগ ভোগ করতে করতে তার শরীরটা তখন হয়ে গেছে বিবর্ণ ও বিশুষ্ক। জীবনের আশা একেবারে নেই বললেও চলে।

তখনও পর্যন্ত পোলিও রোগের কোন প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়নি। তাই শিশুটিকে পরীক্ষা করে চিন্তিত হলেন ডাক্তার। সেই সঙ্গে প্রস্ফুটিত হওয়ার আগে একটি কুঁড়িকে অকালে ঝরে যেতে হবে মনে করে মনটাও ব্যথায় ভরে উঠলো। সেইদিনই প্রতিজ্ঞা করলেন ডাক্তার, ঐ পোলিও রোগটার প্রতিষেধক আবিষ্কার করে তিনি পৃথিবীর জননীদের দুঃখমোচন করবেন।

ডাক্তার তখন নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ে জীবাণু তত্ত্ববিভাগে কয়েকজন গবেষকদের সঙ্গে ইনফ্লুয়েঞ্জা রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করতেন। উপরোক্ত ঘটনাটির পর তাঁর দৃষ্টি পোলিওর দিকে আকৃষ্ট হলো। বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই বিভাগে যাঁরা পোলিও সম্বন্ধে গবেষণা করছিলেন, এই ডাক্তার তাঁদের সহযোগী হয়ে গবেষণা আরম্ভ করে দিলেন। হাসপাতাল এবং চিকিৎসা করা এবার মাথায় উঠলো। রাতদিন কেবল চলতে লাগল গবেষণা-গবেষণা আর গবেষণা।

ঐ পোলিও রোগটা সাধারণতঃ অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদেরই হয়ে থাকে। বড়দের যে একেবারে হয় না এমন নয়। সে সময় প্রতি বছর পৃথিবীর হাজার হাজার শিশুকে এই রোগ আক্রমণ করতো। কেউ প্রাণে বাঁচতো, কেউ বা দীর্ঘদিন রোগযন্ত্রণা ভোগ করার পর মারা যেত। আবার প্রাণে যারা বেঁচে থাকতো, তাদের অনেকের দেহই বিকলাঙ্গ হয়ে যেতো এবং দুর্বিবহ জীবনযাপন করতো। চিকিৎসকদের মতে, শিশুর পক্ষাঘাতগ্রস্ত অঙ্গের পেশীগুলি অপুষ্টির জন্য ধীরে

ধীরে শুকিয়ে যায় বলে ওরা বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে। এইসব কারণে সেদিনও পৃথিবীর বহু দেশের চিকিৎসাবিজ্ঞানী উক্ত রোগটির প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য যত্নবান হয়েছিলেন এবং কিছু কিছু মূল্যবান তথ্যও আবিষ্কার করেছিলেন। তরুণ ডাক্তারটির সুবিধা হলো অনেকখানি। গবেষকদের অধীনে কিছুকাল গবেষণা করার পর তিনি নিজেই স্বাধীনভাবে আরম্ভ করলেন গবেষণা।

কেটে গেল বেশ কয়েকটি বছর। ডাক্তারের কঠিন তপস্যা একদিন সার্থক হলো। বহু বছরের সাধনার ফলে লাভ করলেন পোলিও রোগের প্রতিষেধক টিকা। কিন্তু পরীক্ষার এখনও বাকি। ডাক্তার হঠাৎ ভেবে পেলেন না—কার উপরে তিনি প্রথম প্রয়োগ করবেন এই টিকাকে।

অনেক ভেবে ডাক্তার ঠিক করলেন, নিজ শরীরেই গ্রহণ করবেন পোলিওর টিকা। খারাপ যদি কিছু হয় তাহলে নিজেরই হোক!

শুভদিনে নিজের দেহে নিজেই টিকা নিলেন ডাক্তার। তারপর একদিন শরীরে প্রবেশ করালেন পোলিওর ভাইরাস। একটুও কাঁপল না তার হাত, কুঞ্চিত হলো না মুখমণ্ডল।

একদিন একদিন করে দিন কাটতে লাগল। কোন অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করলেন না তিনি। কিংবা পোলিওর লক্ষণও দেখা গেল না শরীরে। নিশ্চিন্ত হয়ে ডাক্তার এবার পরিবারের অপর সবাইকে দিলেন নিজের আবিষ্কৃত টিকা। অচিরে বুঝতে পারলেন, তাঁর দ্বারা উদ্ভাবিত টিকা গ্রহণ করলে শরীর পোলিও রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা লাভ করে।

ডাক্তার সেদিন ইচ্ছা করলে তাঁর আবিষ্কারটিকে পেটেণ্ট করে কোটি কোটি ডলার উপার্জন করতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করলেন না। আবিষ্কারের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জগৎকে জানিয়ে দিলেন। ফলে যেন হাওয়ায় ভর করে ছড়িয়ে পড়ল ডাক্তারের নাম। সেই থেকে দূরীভূত হলো পোলিওর ভয়াবহতা।

এই ডাক্তারটির নাম জোনাস শালক। তাঁরই উদ্ভাবিত টিকাকে শিশুর জন্মের কয়েক মাসের পর থেকে এক মাস অন্তর অন্তর তিনবার প্রয়োগ করতে হয়। যে-সব শিশু এই টিকা ঠিকমত গ্রহণ করে তাদের শিশুপক্ষাঘাত বা পোলিওমাইলা-ইটিস বা সংক্ষেপে পোলিও নামক রোগটি হয় না।

পরবর্তীকালে সাবিন নামে আর একজন চিকিৎসাবিজ্ঞানী পোলিওর টিকার প্রভূত উন্নতিসাধন করেছেন। তাই শালক্ ও সাবিন্ উভয়েই অমর হয়ে আছেন পৃথিবীতে।

———

✪ যক্ষ্মার প্রতিষেধক ✪

অতি প্রাচীনকাল থেকে কতকগুলি ব্যাধিকে চিকিৎসকরা "দুরারোগ্য ব্যাধি" রূপে চিহ্নিত করে এসেছিলেন। সেই ব্যাধিগুলির মধ্যে যক্ষ্মা ছিল একটি।

এমন একদিন ছিল, যক্ষার নাম শুনলে মানুষ শিউরে উঠতো। সম্পূর্ণরূপে পরিহার করে চলতো যক্ষা রোগীর সংস্পর্শ। প্রাচীন ভারতীয় চিকিৎসকরা বলতেন "শিবের অসাধ্য ব্যাধি"! অর্থাৎ তাঁদের মতে যে দেবাদিদেব মহাদেব মানুষের রোগ নিরাময় কল্পে চিকিৎসাশাস্ত্রের প্রবর্তন করেছিলেন এবং যাঁর কৃপায় যে কোন রোগ ব্যাধি দূর হয়ে যেতে পারতো সেই শিবেরই যক্ষা নিরাময় করানোর ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু আজ আর এই রোগটি দুরারোগ্য ব্যাধির তালিকায় নেই। ঘরে বসে ঔষধ সেবন করে এবং পুষ্টিকর খাবার খেয়েই যক্ষা রোগীরা সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভ করতে পারছে! তাছাড়া শরীর যাতে যক্ষা রোগ প্রতিষেধক ক্ষমতা অর্জন করতে পারে তার জন্য বি. সি. জি. টীকার-ও প্রবর্তন হয়েছে। এককথায় যে রোগে আগে একশ জনের মধ্যে একশ' জনেরই মৃত্যু হতো, সেই রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি আজ বুক ফুলিয়ে বলতে পারে "আমি মরবো না—আমি মরতে পারি না।" অতএব নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, মনুষ্যসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাসে যক্ষার প্রতিষেধক একটি অতি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। যাঁর কৃতিত্বে এই রোগটা অপর দশটা সাধারণ রোগের পর্যায়ে এসে গেছে তাঁর নাম ডঃ সেলমন এব্রাহাম ওয়াক্সম্যান। সর্বযুগের এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানবহিতৈষী বিজ্ঞানীদের অন্যতম তিনি। অথচ চিকিৎসা-বিজ্ঞানী তিনি ছিলেন না—ছিলেন এক কৃষিবিজ্ঞানী। বিধাতার কি অদ্ভুত খেয়াল! চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারটি এল তাঁরই হাত দিয়ে। আবিষ্কারটি একরকম আকস্মিক বলা যেতে পারে।

ডঃ সেলমন এব্রাহাম ওয়াক্সম্যানের ডাক্তার হওয়ারই কথা ছিল। যখন তিনি কিশোর, সেই সময় তাঁর একটি ছোট বোন ডিপ্‌থেরিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত মারা যায়। সেলমন ছোট বোনটিকে অত্যন্ত আদর করতেন। বোনের মৃত্যুতে প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, মানুষের দুরারোগ্য ব্যাধিগুলিকে দূর করতে তিনি ডাক্তার হবেন। কিন্তু অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস। একটু বড় হতেই বালক ভুলে গেলেন তাঁর প্রতিজ্ঞার কথা। আকর্ষণ বোধ করলেন কৃষিবিজ্ঞানের প্রতি। হয়ত সেদিন বালকের আন্তরিকতা এবং ঐকান্তিক প্রার্থনায় তুষ্ট হয়েছিলেন ঈশ্বর। তাই কৃষিবিজ্ঞানীরই হাতে অর্পণ করেছিলেন একটি দুরারোগ্য ব্যাধির মহৌষধ—তার ভগিনীর প্রতি ভালবাসার পুরস্কার।

সেলমনের মনটাও ছিল অত্যন্ত সাদা। কৃষকদের উন্নতির জন্যই তিনি কৃষিবিদ্যা অধ্যয়ন করে গবেষণায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বিশেষ করে মৃত্তিকার উর্বরতাবৃদ্ধি ছিল তাঁর গবেষণার বিষয়। এ বিষয়ে কৃতকার্যও হয়েছিলেন তিনি। নাইট্রোজেন ঘটিত সার যে উৎপাদন বৃদ্ধির সহায়ক, এই তথ্য আবিষ্কার করে কৃষিবিজ্ঞানে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করেন। উক্ত আবিষ্কারের পরও বিভিন্ন প্রকার মাটি সম্বন্ধে তাঁর গবেষণা অব্যাহত ছিল। একদিন মাটিকে নিয়ে গবেষণাকালে আকস্মিকভাবে লাভ করেন "ট্রেপটোমাইসেস গ্রিসিয়াস" নামক একধরণের জীবাণুর সন্ধান। সেলমন তাঁর এই আবিষ্কারটিকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করে বেশ কিছুকাল গবেষণা করেন এবং কিছু কিছু মূল্যবান তথ্যও সংগ্রহ করেন।

তারপর গত হয়ে যায় বেশ কয়েকটি বছর। পৃথিবীর আকাশে একদিন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো দ্বিতীয় বিশ্বমহাসমরের আগুন। একদিকে ধ্বংস, অপরদিকে বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার। সূচিত হলো মনুষ্য জাতির ইতিহাসে একটি নতুন অধ্যায়। এই অধ্যায়ে সবচেয়ে কল্যাণকর অবদানটি হলো পেনিসিলিন। ওর অত্যাশ্চর্য ক্ষমতার কাছে মাথা হেঁট করলো অধিকাংশ দুরারোগ্য ব্যাধি। বিজ্ঞানীদের মধ্যে পড়ে গেল এক দারুণ রকমের সাড়া। পেনিসিলিন নোটেটাম জাতীয় ছত্রাকের মত আশ্চর্য গুণসম্পন্ন অপর কোন ছত্রাক পাওয়া যায় কি না—সে বিষয়ে গবেষণার জন্য অনেকেই হলেন যত্নবান। ডঃ সেলমনও বাদ পড়লেন না। তাঁর পূর্ব আবিষ্কৃত "ষ্ট্রেপটোমাইসেস গ্রিসিয়াস" জীবাণুদের সূত্র ধরে আরম্ভ করলেন গবেষণা। পরিশেষে পচা-মৃত্তিকায় জাত এক ধরণের ছত্রাক থেকে নিষ্কাশন করলেন "ষ্ট্রেপটোমাইসিন" নামক একটি অ্যান্টি-বায়োটিক। ঐ ষ্ট্রেপটোমাইসিনই যক্ষ্মা রোগের প্রতিষেধক।

ডঃ সেলমন এব্রাহাম ওয়াক্সম্যানের আবিষ্কার প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫২ খ্রীষ্টাব্দে। তাঁর অমূল্য অবদানের জন্য তাঁকে ঐ বছরই নোবেল পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করা হয়েছে। আজ পৃথিবী থেকে যক্ষ্মা একরকম নির্বাসিত। অথচ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারাতো। ষ্ট্রেপটোমাইসিনই রুদ্ধ করেছে এত মানুষের অকাল মৃত্যু। "ওয়াক্সম্যানের" অবদানের তাই কোন তুলনা হয় না। মানুষের হৃদ্‌সিংহাসনে তিনি চিরকালই অধিষ্ঠিত থাকবেন।

✪ কোলাজ্বরের ওষুধ ✪

বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত ভারতবর্ষে এবং গ্রীষ্মমণ্ডলে অবস্থিত পৃথিবীর অন্যান্য দেশসমূহে মাঝে মাঝে এক ধরণের মারাত্মক রোগ আত্মপ্রকাশ করতো এবং ঐ রোগে আক্রান্ত হয়ে হাজার হাজার মানুষকে অকালে প্রাণ হারাতে হতো। রোগটির নাম ছিল কালাজ্বর। এই রোগের প্রাথমিক অবস্থায় দেহে অল্প অল্প জ্বর আসতো। তারপর প্লীহা এবং যকৃৎ অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠতো। মাস খানেকের মধ্যেই প্রকাশ পেতো রক্তাল্পতার লক্ষণ, মাথার চুলগুলো উঠতে আরম্ভ করতো এবং শরীরটা হয়ে যেতো একেবারে কালিবর্ণ। অবশেষে রোগী ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতো মৃত্যুর দিকে।

কালাজ্বরে কোন একক রোগী প্রায়ই আক্রান্ত হতো না। একটা বিরাট অঞ্চল জুড়ে এই রোগ আত্মপ্রকাশ করতো। ফলে অকালমৃত্যু বরণ করতে হতো শত শত শিশু, যুবা ও বৃদ্ধকে। অথচ তখন এর প্রতিকারের কোন উপায় ছিল না।

কালাজ্বরের বীভৎসরূপ দেখে চিন্তিত হয়ে উঠেছিলেন উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের বিজ্ঞানীরা। ততদিনে অবশ্য বিজ্ঞানের কৃপায় মাত্র কয়েকটি দুরারোগ্য ব্যাধিকে মানুষ আয়ত্তে আনতে পেরেছিল। কিন্তু হাজার চেষ্টা সত্ত্বেও

ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বরের বিভীষিকা দমন করতে পারছিল না। এমন কি কোন্ কোন্ কারণে উক্ত রোগ দুটি সংক্রামিত হয় তাও কেউ জানতো না। তাই বহুদিন থেকে পৃথিবীর বহুদেশের বিজ্ঞানী এবং চিকিৎসকগণ ঐ দুটি রোগের কারণ নির্ণয়ে যত্নবান হয়ে উঠেছিলেন।

ইংরাজী ১৯০০ সাল। দীর্ঘকাল গবেষণার পর লীশম্যান নামে জনৈক ইংরাজ বিজ্ঞানী কালাজ্বরে আক্রান্ত রোগীর প্লীহাকে দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে একদিন একরকম আকস্মিকভাবে সন্ধান লাভ করেন এক ধরণের পরজীবী জীবাণুর। দেখা গেল, ঐ জীবাণুরা প্লীহার মধ্যে এক জায়গায় অত্যন্ত গুপ্তভাবে অবস্থান করছে। লীশম্যান আরও কয়েকটি কালাজ্বরে মৃত রোগীর প্লীহাকে নিয়ে পরীক্ষা করলেন। পরিশেষে বুঝতে পারলেন ঐ পরজীবী জীবাণুরাই কালাজ্বরের একমাত্র কারণ। তখন তিনি সেই জীবাণুদের নামকরণ করলেন এল. ডি. বডি।

লীশম্যানের আবিষ্কারের কথা ছড়িয়ে পড়লো দিকে দিকে। তাঁর পরীক্ষাগুলিকে ভিত্তি করে বহু বিজ্ঞানী সুস্থ দেহে এল. ডি. বডিদের অনুপ্রবেশের কারণ নির্ণয়ে হলেন যত্নবান। প্রায় চারবছর পরে রজার্স নামে এক জীবাণুতত্ত্ববিদের গবেষণায় ধরা পড়লো, কালাজ্বরের মূলে আছে এক প্রকারের মাছি। ঐ মাছির দংশনে সুস্থদেহে এল. ডি. বডিরা অনুপ্রবেশ করে। কিন্তু কালাজ্বরের প্রতিষেধক আবিষ্কারে ব্যর্থ হলেন লীশম্যান এবং রজার্স। তার কারণ, উভয়ের কেউই ছিলেন না রসায়নবিদ।

কলিকাতার ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলে তখন অধ্যাপনা এবং গবেষণা করতেন এক তরুণ ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানী। তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল, ম্যালেরিয়া এবং তার প্রতিষেধক। রসায়ন বিজ্ঞানে তাঁর ছিল যথেষ্ট দক্ষতা। কিন্তু স্যার রোনাল্ড রস যখন ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু এবং উক্ত রোগের ক্রমবিকাশের স্তরগুলি আবিষ্কার করে অক্ষয়কীর্তি স্থাপন করলেন তখন ঐ ভারতীয় তরুণ বিজ্ঞানীটি অপর কোন্ রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করবেন—এই নিয়ে চিন্তান্বিত হয়ে উঠলেন। ঠিক সেই সময়ই তাঁর হাতে এল লীশম্যান ও রজার্সের গবেষণা। তরুণটি তখন অত্যন্ত উৎসাহিত হলেন এবং কালাজ্বরের প্রতিষেধক আবিষ্কারের জন্য অক্লান্তভাবে পরিশ্রম আরম্ভ করলেন!

কেটে গেল বেশ কয়েকটি বছর। তবুও ভারতের এই তরুণ বিজ্ঞানীটির গবেষণার গতি মন্দীভূত হল না। বরং দিন যতই অতিবাহিত হলো, ততই তাঁর আগ্রহ উত্তরোত্তর বেড়ে চললো। পরিশেষে ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলেন তিনি। পৃথিবীর মানুষকে উপহার দিলেন "ইউরিয়া স্টীবামাইন" নামক কালাজ্বরের প্রতিষেধক ওষুধ। চারদিকে ধন্য ধন্য পড়ে গেল। আর কালাজ্বর রাক্ষসীকেও তার দলবল নিয়ে পৃথিবী থেকে পালিয়ে যেতে হলো।

ভারতবর্ষের এই মহান বিজ্ঞানীর নাম স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী। প্রসিদ্ধ মানবহিতৈষী বিজ্ঞানী ইউ. এন. ব্রহ্মচারী নামে জগতের কাছে পরিচিত।

তদানীন্তন বৃটিশ সরকার তাঁকে "নাইট" উপাধিতে ভূষিত করে সম্মানিত করেছিলেন।

✪ নাইলন ✪

আজকাল নাইলনের জিনিসে বাজার ছেয়ে গেছে। অথচ এটি একটি কৃত্রিম তন্তু। এই তন্তুটি সাধারণতঃ অ্যাডিপিক অ্যাসিড এবং হেক্সামেথিলিন ডাই-অ্যামাইনের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ক্যারোথার্সই কৃত্রিম তন্তু নাইলনকে আবিষ্কার করেছেন।

নাইলন আবিষ্কারের ইতিহাস অতি সংক্ষিপ্ত। কৃত্রিম রেশম প্রভৃতি আবিষ্কৃত হলে বিজ্ঞানীরা দেখলেন, স্বাভাবিক তন্তু অপেক্ষা এই সব কৃত্রিম তন্তুর উপযোগিতা অনেক বেশি। তাছাড়া শিল্পেও এদের চাহিদা প্রচুর। তাই বিজ্ঞানীরা টেকসই ও মজবুত ঐ জাতীয় অপর কোন তন্তু আবিষ্কার করা যায় কি না—সে বিষয়ে গবেষণা আরম্ভ করেন। তারই পরোক্ষ ফল ক্যারোথারস্ আবিষ্কৃত কৃত্রিম তন্তু নাইলন।

টেরিলিনের মত নাইলনেরও উপাদান অজৈব পদার্থ। উচ্চ চাপ এবং উচ্চ তাপে অ্যাডিপিক অ্যাসিড ও হেক্সামেথিলিন ডাই-অ্যামাইন সংযুক্ত হয়ে অতিকায় অণু নাইলনের সৃষ্টি করে। তন্তু প্রস্তুত হওয়ার পর তাকে বিদ্যুতের সাহায্যে গলিয়ে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু ছিদ্রবিশিষ্ট পাত্রের ছিদ্র পথে বার করে ঠাণ্ডা করলে অত্যন্ত সরু সরু তন্তু পাওয়া যায়। পরে ঐ তন্তুকে মোসনে পাঠিয়ে রোলারের সাহায্যে পাক দিয়ে প্রয়োজনানুযায়ী মোটা কিংবা সরু উভয় ধরণের সূতা তৈরি করা হয়।

দড়ি এবং বস্ত্র শিল্পে নাইলনের ব্যবহার ব্যাপক। নাইলন সূতার সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য, ওরা জল ধারণ করতে পারে না কিংবা জলে পচেও যায় না। তাছাড়া নাইলনের কাপড়কে ইস্ত্রি করতে হয় না এবং সহজে ভাঁজও ধরে না। খুব শক্ত, টেকসই এবং রেশমের মত চিক্কণ। নাইলন ঘর্ষণ সহ্য করতে পারে এবং বিদ্যুৎ পরিবহনে অক্ষম বলে অন্যান্য শিল্প ক্ষেত্রেও ব্যবহার করা হয়। প্যারাসুট, ব্রাশ, মাছধরার জাল প্রভৃতি নির্মাণের জন্য আজকাল নাইলনের সূতাই ব্যবহার করা হচ্ছে। সভ্যতার অগ্রগতিতে নাইলনের দান তাই অপরিসীম।

✪ জড়ের মধ্যে জীবের গুণ ✪

লণ্ডনের বিখ্যাত রয়েল সোসাইটি হলে এক তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানী বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল জীব ও জড়ের সম্পর্ক। জীব ও জড় পদার্থের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে বিজ্ঞানী একসময় বললেন ঃ আমি পরীক্ষা করে দেখেছি, জীবের মত জড়ও উত্তেজনায় সাড়া দেয়।

সভাকক্ষে উপস্থিত ছিলেন দেশ বিদেশের বহু নামকরা বিজ্ঞানী। তৎকালীন ইংলণ্ডের লব্ধ প্রতিষ্ঠ বর্ষীয়ান বিজ্ঞানী স্যার মাইকেল ফস্টারও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। তরুণ বিজ্ঞানীটির কথা শুনে ফস্টার বিস্মিত বড় কম হলেন না। কারণ, তাঁর ধারণা ছিল একমাত্র জীবই উত্তেজনায় সাড়া দেয়। যাদের জন্ম নেই, মৃত্যু নেই, যাদের অচেতন পদার্থরূপে বিজ্ঞান গণ্য করে থাকে, তাদের মধ্যে সাড়া পাওয়া যাবে—এ যে একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।

তরুণ বিজ্ঞানীটির বক্তৃতা শেষ পর্যন্ত শোনার জন্য আকুল আগ্রহে প্রতীক্ষা করতে লাগলেন ফস্টার। কিন্তু বক্তৃতা শেষ করতে পারলেন না বিজ্ঞানী। মাঝখানেই উঠলো প্রতিবাদের তুমুল ঝড়। কেন না ফস্টারের মত অপরাপর সমস্ত বিজ্ঞানীরই ধারণা ছিল, সাড়া দিতে না পারার জন্যই বিজ্ঞান ওদের জড় পদার্থরূপে চিহ্নিত করেছে। তাই কোলাহল উঠলো চারদিকে। কেউ কেউ প্রশ্ন ছুঁড়ে মারলেন ঃ ঐ অসম্ভব ব্যাপারটা আপনি সর্ব সমক্ষে প্রমাণ করতে পারবেন ?

তরুণ বিজ্ঞানীটি মৃদু হেসে বললেন ঃ আমি জানি, পরীক্ষা ছাড়া বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। আপনারা যদি প্রত্যক্ষ করতে চান তাহলে আমি যন্ত্রের মাধ্যমে দেখাতে পারি, মূক গাছপালা থেকে আরম্ভ করে যে কোন জড় পদার্থ উত্তেজিত হলে সাড়া না দিয়ে পারে না।

ফস্টার এবার আরও বিস্ময় বোধ করলেন। চিন্তিত মুখে প্রশ্ন করলেন ঃ আজ পর্যন্ত বিজ্ঞান জীব ও জড়ের মধ্যে যে পার্থক্য নির্দেশ করে এসেছে তা কী ভুল ?

পুনর্বার হাসলেন তরুণ বিজ্ঞানীটি। বললেন ঃ আমার ধারণা, জীব ও জড় সম্বন্ধে বিজ্ঞানে প্রচলিত ধারণাটি ভ্রান্ত।

আপনি কী সত্যই সর্বসমক্ষে এই সত্যটি প্রমাণ করতে পারবেন ? অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করলেন ফস্টার।

বিজ্ঞানী দ্বিধাহীন কণ্ঠে উত্তর দিলেন ঃ পারবো।

এরপর সভার আলোচনার কাজ আর বেশিদূর অগ্রসর হতে পারল না। সর্বসমক্ষে প্রমাণ করার দিন স্থির হওয়ার পর সভা ভঙ্গ হলো।

নির্দিষ্ট দিনটিতে সমবেত হলেন বহু বিজ্ঞানী এবং বহু উৎসাহী দর্শক। তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানীটি তখন একখানা অভ্রের পাত গ্রহণ করে তাতে বিষ প্রয়োগ করলেন। তারপর পাতটির সম্মুখে ধরলেন নিজেরই উদ্ভাবিত একটি যন্ত্র। উপস্থিত দর্শক সবাই বিস্ময় সহকারে দেখলেন, বিষ প্রয়োগের ফলে অভ্রের পাতের মধ্যে সৃষ্টি হলো এক ধরণের মৃদু কম্পন। অতঃপর একখানা টিনের পাতকে নিয়ে তাতে বিদ্যুৎ স্পর্শ ঘটিয়েও ধরলেন যন্ত্রের সম্মুখে। এবারও সবাই দেখলেন, টিনের পাতটির মধ্যেও পূর্বের মত কম্পন সুরু হয়েছে।

পরীক্ষা শেষে বিজ্ঞানী বললেন ঃ কেবল মাত্র অভ্র কিংবা টিনের পাতা নয়, যে কোন জড় পদার্থে বিষ প্রয়োগ করলে অথবা বিদ্যুৎস্পর্শ ঘটালে মৃত্যুকালীন অব্যক্ত যন্ত্রণার মত একধরণের সাড়া পাওয়া যায়।

বিজ্ঞানী ক্ষণকাল নীরব থেকে পুনশ্চ বললেন ঃ জীবের সঙ্গে জড়ের আরও একটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।

ফস্টারই প্রশ্ন করলেন ঃ সে সাদৃশ্যটি আবার কী? বিজ্ঞানী বললেন ঃ জীবের মত জড় পদার্থগুলিও দীর্ঘক্ষণ কাজ করার পর অবসন্ন বোধ করে। বিশ্রামের পর জীবরা যেমন কর্মক্ষমতা ফিরে পায় তেমনই জড় পদার্থকেও কিছুক্ষণ বিশ্রাম দিলে সে পুনর্বার লাভ করে তার পূর্বক্ষমতা।

হতবাক হয়ে গেলেন সমস্ত বিজ্ঞানীরা। সবার মনে একই প্রশ্ন, এরপর জীব ও জড়ের মধ্যে পার্থক্য রইল কোথায়? বিজ্ঞান এবার জড় পদার্থ কাদের বলবে?

যে তরুণ বিজ্ঞানীটি জীব ও জড়ের মধ্যে এইভাবে পার্থক্যের প্রাচীরটি ভেঙ্গে দিয়েছিলেন—তাঁর নাম আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু। ক্রেস্কোগ্রাফ, স্ফিগমোগ্রাফ প্রভৃতি স্বয়ংলেখ যন্ত্র উদ্ভাবন করে জীব ও উদ্ভিদ সম্বন্ধে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন এবং আহরণ করেছিলেন এই দুই জগতের বহু মূল্যবান তথ্য। বিদ্যুতের আঘাতে লজ্জাবতী লতার শাখায় কুঞ্চন ঘটিয়ে তিনি প্রথম প্রমাণ করেছিলেন, প্রাণীদেহ ও উদ্ভিদদেহের মধ্যে বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। সত্য কথা বলতে কি, একমাত্র জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার থেকেই উদ্ভিদ রাজ্যের গোপনীয় তথ্যগুলি আমাদের কাছে ধরা পড়েছে।

———

✪ ফসফরাস ✪

অত্যন্ত সক্রিয় পদার্থ বলে ফসফরাসকে মৌলিক হিসাবে প্রকৃতিতে পাওয়া যায় না। তার একমাত্র কারণ, ফসফরাস অতি সহজেই বায়ুতে জারিত হয়ে যায়। তবে যৌগিক হিসাবে প্রাণী ও উদ্ভিদ দেহে এবং যে কোন ফসফেট লবণে থাকে। কোন কোন খনিজ শিলাতেও ফসফরাস বর্তমান।

ফসফরাস এক অতি বিস্ময়কর পদার্থ। অনেকে মনে করেন, অতি প্রাচীনকালে আরবীয় অ্যালকেমিস্টরাই ফসফরাসকে তার কোন না কোন যৌগিক থেকে পৃথক করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু কোন্ যৌগিক থেকে এবং কি ভাবে যে নিষ্কাশন করেছিলেন সে বিষয়ে কোন প্রামান্য তথ্য লাভ করা যায় না। তবে মধ্যযুগে ইউরোপের দু চারজন রসায়নবিদ ফসফরাস নিষ্কাশন পদ্ধতি আবিষ্কার করলেও তাঁরা তাঁদের আবিষ্কারের কথা প্রকাশ করেন নি। সম্ভবতঃ ওর ভূতুড়ে গুণ দেখে অর্থ উপার্জনের লোভ সংবরণ করতে না পেরে একেবারেই চেপে গিয়েছিলেন।

ব্যাপারটা একটু খুলেই বলা যাক।

ফসফরাস আর্দ্র বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে প্রথমে ধোঁয়া উৎপন্ন করে.

পরে সবুজ আলোক শিখা বিকীর্ণ করে। এই শিখা সম্পূর্ণ তাপহীন। বিজ্ঞানের ভাষায় উক্ত আলোককে বলা হয় ঠাণ্ডা আলো। যাঁরা ফসফরাসকে প্রস্তুত করেছিলেন তাঁরা জনসমক্ষে ঐ ঠাণ্ডা আলোক শিখা প্রদর্শন করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিতেন।

ফসফরাসকে নিয়ে আরও অনেক খেলা দেখাতেন তাঁরা। সেই খেলাগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো। এই পরীক্ষাগুলো যে কেউ হাতে নাতে করে দেখাতেও পারেন।

প্রথমত, তাঁরা জলের তলায় এক টুকরো ফসফরাসকে রেখে নল যোগে বাহির থেকে তার উপর বায়ু (অক্সিজেন হলে আরও ভালো হয়) পাঠাতেন সেই জলের তলায়ই আগুন জ্বলতে থাকতো।

দ্বিতীয়ত, ফসফরাসকে কারবন ডাই-সালফাইডের দ্রবণে দ্রবীভূত করে কোন কিছুর উপর ঐ দ্রবণকে ছিটিয়ে দিলে অল্প পরে কারবন ডাই-সালফাইড উবে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠতো। দর্শক সাধারণ জল মনে করে খেলোয়াড়ের যাদু বিদ্যা দেখে আশ্চর্য হয়ে যেতো।

তৃতীয়ত, ফসফরাস ও কষ্টিক সোডাকে একত্রে মিশিয়ে গরম করতেন। তারপর যে গ্যাসটি উৎপন্ন হতো তাকে পাঠাতেন জলের ভেতর দিয়ে। ফলে উৎপন্ন হতো গ্যাসীয় বলয়।

ফসফরাসকে নিয়ে আরও বহু খেলা দেখাতেন তাঁরা। প্রতিটি খেলাই দর্শকমনে গভীরভাবে রেখাপাত করতো। বিশেষ করে তাপহীন অগ্নিশিখা এবং জল ছিটিয়ে আগুন জ্বেলে দেওয়া অথবা জলের নীচে আগুন জ্বালানো ইত্যাদি খেলোয়াড়ের অলৌকিক শক্তির পরিচয় প্রদান করতো। আর সাধারণ মানুষ তাঁদের সমীহ করে চলতো। তাই আবিষ্কারক কোনদিন প্রকাশ করতেন না তাঁর আবিষ্কারের কথা। কিন্তু ঐ ভুতুড়ে ব্যাপ্যারগুলো আয়ত্ত করার জন্য অনেক সুযোগ সন্ধানী তাঁদের গুরুরূপে বরণ করতো। গুরুর কৃপা হলে শেষ বয়সে বেশ কিছু উপার্জনের পর কোনও একজন বা দুজন শিষ্যকে শিখিয়ে দিতেন। তারপর শিষ্য আরম্ভ করতো ব্যবসা। এইভাবে কয়েকশ' বছর ধরে ফসফরাস মুষ্টিমেয় দু চারজনের অর্থ উপার্জনের সহায় হয়ে এসেছিল।

যাদুকরদের যাদুকাঠি থেকে ফসফরাস প্রথম মুক্তিলাভ করে ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে। ব্রাণ্ড নামে এক বিজ্ঞানীর হঠাৎ একদিন কি খেয়াল হল। তিনি মূত্রের জলীয় অংশকে বাষ্পীভূত করে অবশেষকে বালি ও কাঠকয়লা দিয়ে পুড়িয়ে পাতিত করলেন। সেই দিনই ব্রাণ্ড জানতে পারলেন ফসফরাসের কথা। তবে আবিষ্কার করা মাত্র তিনি প্রকাশ করেন নি। অনেকদিন ব্যাপারটা গোপন রেখেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ফসফরাস সম্বন্ধে মানুষ প্রথম জ্ঞান লাভ করে ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে— বিজ্ঞানী "গ্যান" এর আবিষ্কার থেকে। গ্যান প্রাণীর অস্থি থেকেই ফসফরাস নিষ্কাশিত করেছিলেন এবং প্রমাণ করেছিলেন, যে কোন প্রাণীর অস্থিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ ফসফরাস থাকে।

সমসাময়িক কালের বিবিধ পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয়েছে, জীব-জন্তুর অস্থির

একটা প্রধান উপাদান ফসফরাস। জীবদেহের মাংসপেশী, জীবকোষ, স্নায়ু, অস্থিমজ্জা, মস্তিষ্ক প্রভৃতিতেও ফসফরাস বিদ্যমান। তাই দেহ গঠনের জন্য ফসফরাস ঘটিত খাদ্যের একান্ত প্রয়োজন। ডিমের কুসুম, মাংসের হাড় ও মজ্জায় এবং সামুদ্রিক মাছে প্রচুর ফসফরাস থাকে। ছোট ছোট মাছ—যাদের কাঁটা সমেত চিবিয়ে খাওয়া যেতে পারে তেমন মাছ ও শরীরে প্রয়োজনীয় ফসফরাসকে সরবরাহ করে।

আসলে মৌলিক পদার্থ হিসেবে ফসফরাস অত্যন্ত বিষাক্ত। অতি সামান্য পরিমাণ পেটে পড়লেই মৃত্যু অবধারিত। কিন্তু ফসফরাস ঘটিত খাদ্য আমাদের দেহের একটি অপরিহার্য উপাদান। মৌলিক পদার্থরূপে ওকে তিনভাবে পাওয়া যায়—সাদা, লাল ও কালো। লাল ও কালো ফসফরাসের তুলনায় সাদা ফসফরাস অনেক—অনেক বিষাক্ত।

ফসফরাসের একটা বড় গুণ হলো অনুপ্রভা বিতরণ করা। রাত্রিতে সমুদ্রের জলকে ছিটিয়ে দিলে বেশ চক চক করতে দেখা যায়। এটি সমুদ্রজলে দ্রবীভূত ফসফরাস কর্তৃক অনুপ্রভা বিতরণ। দেখা গেছে, পাঁচ লক্ষ ভাগ জলে মাত্র একভাগ যদি ফসফরাস থাকে তাহলে অন্ধকারে নীলাভ দ্যুতি বিকিরণ করে বা অনুপ্রভা দেখা যায়। লোনা মাছকে অন্ধকারে চকচক করতে দেখা যায়। রাতে জোনাকিরা নীলাভ আলো বিতরণ করে। তার কারণও ঐ ফসফরাস ও তার অনুপ্রভা। জোনাকির দেহে ফসফরাসের যৌগ লুসিফেরিণ থাকায় ওটি একটি বিষাক্ত পোকা। তাই বড়রা বলে থাকেন, যে খাদ্যে জোনাকি পোকা পড়ে সে খাদ্য খেতে নেই।

———

✪ সূর্যদেহে পার্থিব বস্তু ✪

জ্যোতির্বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানীদের ধারণা জন্মে যে, আমাদের সৌরজগতের সমস্ত গ্রহ এবং উপগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে সূর্য দেহ থেকে। কিন্তু নিছক কল্পনাকে বিজ্ঞান স্বীকার করে নিতে পারে না। তার জন্য চাই বাস্তব পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ।

উক্ত কল্পনাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বহু বিজ্ঞানী এগিয়ে এসেছিলেন সূর্যরশ্মিকে বিশ্লেষণ করতে। কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেও বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। শুধু প্রমাণ করলেন তাঁরা, সূর্যদেহে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম নামক দুটি গ্যাসের প্রাধান্য। কিন্তু পৃথিবীর গঠন উপাদান তো হাইড্রোজেন এবং হিলিয়াম নয়! তাহলে পৃথিবী কী সূর্য দেহ থেকে উৎপন্ন হয়নি? অথবা আদিম কালের কোন গাঢ় মেঘপুঞ্জ থেকে একসঙ্গে সূর্য এবং তার গ্রহ উপগ্রহাদি জন্মগ্রহণ করেনি?

মুষড়ে পড়লেন বিজ্ঞানীরা। বহুদিন থেকে তাঁরা পৃথিবীর জন্ম রহস্য উদঘাটনের জন্যও ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁদের কল্পনা বাস্তবে পরিণত হলে একটি মহান সত্য ধরা পড়তো পৃথিবীর মানুষের কাছে।

তবে কী পৃথিবীর জন্মরহস্য উদঘাটন করা যাবে না? চিন্তিত হলেন পৃথিবীর বিজ্ঞান সমাজ। কিন্তু তাই বলে হার মানলেন না তাঁরা। নিজেদের তৈরী যন্ত্রপাতি হাতে করে এগিয়ে এলেন আরও বহু জ্যোতির্বিজ্ঞানী। এক তরুণ ভারতীয় বিজ্ঞানীও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। দীর্ঘকাল গবেষণার পর একমাত্র কৃতকার্য হলেন তিনিই। বর্ণালীবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে সূর্যের বর্ণালী বিশ্লেষণ করে প্রমাণ করলেন, পার্থিব মৌলিক পদার্থগুলির সব ক'টিই অবস্থান করছে সূর্য দেহে। একটা হিসাবও দাখিল করলেন তিনি। তাঁর সেই হিসাব থেকে পৃথিবীর মানুষ জানতে পারলো, সূর্যদেহে একমাত্র হাইড্রোজেনেরই পরিমাণ ৮১·৭ ভাগের মত। অবশিষ্টের মধ্যে হিলিয়াম আছে ১৮·১৭ ভাগ এবং কারবন আছে ·০৭ ভাগ। নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, লোহা, দস্তা, টিন, নিকেল, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতি পার্থিব বস্তুর পরিমাণ মাত্র ·০৬ ভাগের মত। তাঁর এই হিসেবে এখনও ভুল ধরা পড়েনি।

ভারতীয় এই বিজ্ঞানীটির আবিষ্কার নানা দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমত, তাঁর গবেষণা থেকেই হস্তগত হল পৃথিবীর জন্ম রহস্যের খবরটা। দ্বিতীয়ত, সূর্য কিংবা যে কোন নক্ষত্রপৃষ্ঠে প্রচণ্ড তাপের কারণও ব্যাখ্যা করা গেল। তখনই পৃথিবীর সমস্ত বিজ্ঞানী এক বাক্যে স্বীকার করলেন, নিউটনের আবিষ্কারের পর জ্যোতির্বিজ্ঞানে আর এতবড় আবিষ্কার হয়নি। ধন্য ধন্য পড়ে গেল পৃথিবীতে।

এই ভারতীয় বিজ্ঞানীটির নাম ডঃ মেঘনাদ সাহা। পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় বিজ্ঞানীদের মধ্যে ইনিও একজন। আয়নমণ্ডল এবং বেতার তরঙ্গ সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবান গবেষণাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীকালে উদঘাটিত হয়েছে নানা মূল্যবান তথ্য। তাঁর আজীবন গবেষণার ফল জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং পদার্থ বিজ্ঞান—বিজ্ঞানের দুই শাখাকে করেছে সমৃদ্ধ।

✪ দিয়াশলাই ✪

সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ আগুন জ্বালাতো দুখানি শুষ্ক কাঠখণ্ডের ঘর্ষণের দ্বারা। তারপর কবে যে মানুষ চকমকি পাথরের সন্ধান পেয়েছিল—সে কথা আজ আর কেউ বলতে পারে না। তবে ঐ জিনিসটি হাতে পাওয়ায় তাদের আগুন জ্বালানর কাজ অনেকটা সহজ হয়েছিল। এখনও যে সে নিয়ম সম্পূর্ণ পরিত্যক্ত হয়েছে—এমন নয়। আজও দেখা যায়, পূজা পদ্ধতিতে—যেখানে পবিত্র অগ্নিশিখা উৎপাদন করার প্রয়োজন হয়—সেখানে থাকে চকমকির ব্যবস্থা।

সাধারণতঃ পাট, নারকেল ছোবড়া বা অন্য কোন শুষ্ক দাহ্যবস্তুর উপর চকমকি পাথর ধরে তাতে একটি লৌহখণ্ডের দ্বারা আঘাত করা হয়। ফলে নির্গত হয় আগুনের ফুলকি। দু চারটা ফুলকি এক সঙ্গে দাহ্য বস্তুতে ঝরে পড়লেই অগ্নিসংযোগ ঘটে।

চকমকি পাথর ঠুকে আগুন জ্বালাবার রীতি দীর্ঘকাল ধরেই প্রচলিত ছিল। এককালে আগুন ছিল অতিশয় পবিত্র। তাই মন্দিরে মন্দিরে পবিত্র অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলনের ব্যবস্থা ছিল এবং ঐ অগ্নিকে সাবধানে সংরক্ষণেরও ব্যবস্থা ছিল। সেদিন দৈনন্দিন কাজে ব্যবহারের জন্যও অনেকে অগ্নি সংরক্ষণ করতেন। চকমকি পাথর রাখার সবাই সুযোগ পেতেন না। কেবল অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে, পুরোহিতের কাছে এবং দেবালয়েই চকমকি পাথর থাকতো। একরকম হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসছিল এই রীতি।

মানুষের শত শত বছরের ঐকান্তিক সাধনার ফলে একদিন বিজ্ঞান হল উন্নত। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে মনুষ্য সভ্যতাও এগিয়ে চললো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে। যে কোন কঠিন কাজকে সহজ করতে মানুষের চিন্তা ভাবনার অন্ত রইল না। তখন অনেকেরই দৃষ্টি গেল সহজভাবে আগুন জ্বালানর দিকে। কত রকমের কত প্রচেষ্টা চললো দীর্ঘকাল। কিন্তু সব চিন্তাই ঐ চকমকি পাথরের মধ্যে রইল সীমাবদ্ধ। শুধু সচেষ্ট হল এমন এক দাহ্য বস্তুর সন্ধানে—যাতে সামান্য আগুনের ফুলকি পড়লে সহজে জ্বলে উঠবে।

এই প্রচেষ্টা সার্থক হল ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে হাউক উইৎস নামক জনৈক বিজ্ঞানীর হাতে। তিনি প্রথমে নরম কাঠকে সরু সরু করে আধুনিক দিয়াশলাইর কাঠির রূপ দিলেন। তারপর কাঠিকে ভালভাবে শুকিয়ে তাতে গন্ধকের প্রলেপ দিলেন। আগুন জ্বালানর কাজ এতদিনে অনেকটা সহজ হল। কাঠির উপর চকমকি ঠুকলেই অল্পায়াসে পাওয়া গেল আগুন। প্রথম কাঠির পরিকল্পনা করেছিলেন বলেই বিশেষজ্ঞদের মতে হাউক উইৎসই আধুনিক দিয়াশলাই আবিষ্কারের পথিকৃৎ।

হাউক উইৎস এর পর অতিবাহিত হয়ে গেল আরও কত কাল। ধীরে ধীরে মানুষের হাতে এলো বহু রাসায়নিক পদার্থ—যেগুলো বাতাসে জারিত হয়ে অথবা একটিকে অপরটির সঙ্গে মিশ্রিত করলে স্বতঃই জ্বলে উঠে। তখন এইসব পদার্থ নিয়েই গবেষণা সুরু হল। অবশেষে উদ্ভাবিতও হল একটি পদ্ধতি। সেই পদ্ধতি অনুযায়ী একটি শুকনো কাঠির মাথায় ক্লোরেট অফ পটাশ এবং চিনিকে আঠার সঙ্গে মিশিয়ে পুঁটলির মত বেঁধে দেওয়া হল। আর হাতের কাছে মজুত রাখা হল ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড ভরা একটি পাত্র। প্রয়োজনানুযায়ী কাঠির ডগাটা সালফিউরিক অ্যাসিডে ডুবিয়ে অগ্নি উৎপাদন করা হতে লাগল।

উপরোক্ত ব্যবস্থা কিন্তু দীর্ঘকাল ধরে অনুসৃত হল না। কারণ, ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড বড় ভয়ানক জিনিস। ওকে ব্যবহার করতে গেলে যে-কোন মুহূর্তে বিপদের সম্ভাবনা আছে। তাই সহজে ও নিরাপদে অগ্নিশিখা উৎপাদনের অন্য উপায় চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন বিজ্ঞানীরা।

ওয়াকার নামে এক বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি ভাবলেন, দুটি বস্তুকে ঘর্ষণ করলে

অণুর গতি বৃদ্ধির জন্য তাপ উৎপন্ন হয়। অতএব দুটি বস্তুর একটি যদি সহজ দাহ্য-পদার্থ হয় তাহলে ঘর্ষণে কেন আগুন উৎপন্ন হবে না ?

ওয়াকার খুব ভালভাবে চিন্তা করে বসে গেলেন গবেষণায়। একদিন কৃতকার্যও হলেন তিনি। কাঠির মাথায় আঠার সাহায্যে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের প্রলেপ দিয়ে অমসৃণ জায়গায় দু-চারবার ঘষলেন। সত্য সত্যই উৎপন্ন হল আগুন। তাঁর এই পদ্ধতিটিকে সর্বাধুনিক পদ্ধতি বলা যেতে পারে। কারণ, তাঁরই আবিষ্কারকে ভিত্তি করে পরবর্তীকালে আবিষ্কৃত হয়েছে নিরাপদ ঘর্ষণ দিয়াশলাই।

ওয়াকারের আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানীদের মধ্যে যেন সাড়া পড়ে যায়। কত বিজ্ঞানী কতরকমের যে ঘর্ষণ দিয়াশলাই আবিষ্কার করেছিলেন তার সঠিক তথ্য এখন আর প্রদান করা সম্ভব নয়। তবে ওয়াকারের আবিষ্কারের প্রায় কুড়ি বছর পরে বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় আত্মপ্রকাশ করে লুসিফার দিয়াশলাই। এই দিয়াশলাই দ্বারা আগুন জ্বালানো সহজ হলেও অনেকগুলি ত্রুটি ছিল। প্রধান ত্রুটি—শ্বেত ফসফরাসের ব্যবহার। বায়ুর অক্সিজেনের দ্বারা জারিত হয়ে শ্বেত ফসফরাস স্বতঃই জ্বলে উঠে। যদিও অল্প শিরিষ মেশান হত বলে ওকে জারণ থেকে রক্ষা করতো তবুও এই দিয়াশলাই একেবারে নিরাপদ ছিল না। কাঠিগুলোকে এক সঙ্গে রেখে দিলে কাঠিতে কাঠিতে মৃদু ঘর্ষণেই আগুন জ্বলে উঠতো। তাই লুসিফার দিয়াশলাই একরকম পরিত্যক্ত হল এবং বিজ্ঞানীরা অন্য উপায় চিন্তা করতে আরম্ভ করলেন।

বেশ কয়েকবছর পরে বিজ্ঞানীদের চেষ্টায় ও যত্নে আবিষ্কৃত হল সেফটি ম্যাচ বা নিরাপদ দিয়াশলাই। এই দিয়াশলাইর কাঠিতে শ্বেত ফসফরাসের বদলে ব্যবহৃত হল লাল ফসফরাস। পটাসিয়াম ক্লোরেট এবং লাল ফসফরাসের মিশ্রণকে কাঠির ডগায় আঠার সাহায্যে আটকে দেওয়া হল। আর বাক্সের দুদিকে আঠার সাহায্যে প্রলেপ দেওয়া হল রেড লেড, সোডিয়াম নাইট্রেট এবং বালি বা মিহি কাচের গুঁড়া। ওতে আর অতি সহজে অগ্নি প্রজ্জ্বলনের ভয় থাকল না। ফলে দিয়াশলাই ব্যবহারে অনেকটা নিরাপত্তা এল।

পরে ঐ দিয়াশলাইকে দিয়ে আরও গবেষণা হয়েছে। কাঠি যাতে সহজে ফুঁ দিলে নিভে যায় এবং নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একেবারে ছাই হয়ে যেতে পারে তার জন্য কখনও ওকে সোহাগার দ্রবণে ডুবিয়ে আবার কখনও অ্যামোনিয়াম ফসফেটের দ্রবণে ডুবিয়ে শুষ্ক করা হয়। কাঠির মাথায় থাকে রেড লেড, এণ্টিমনি সালফাইড, পটাসিয়াম ক্লোরেট, লাল ফসফরাস, পটাসিয়াম ডাই-ক্রোমেট। কখনও বা লোহিত ফসফরাসের পরিবর্তে ফসফরাস সালফাইডও ব্যবহার করা হয়। আঠার বদলে ব্যবহার করা হয় শিরিষের লেই। বাক্সের দুদিকে অমসৃণ কাগজটাতে পূর্বের মত লাল ফসফরাস, রেড লেড, বালি প্রভৃতিকে শিরিষের লেইর সাহায্যে আটকে দেওয়া হয়।

সম্প্রতি কাঠির জন্য কোন কোন দিয়াশলাইয়ের কারখানা নরম কাঠের পরিবর্তে শক্ত কাগজ ব্যবহার করছে। কাঠির মাথায় পুঁটলী তৈরি করার আগে একরকম

প্লাস্টিকের মধ্যে কাঠিকে ডুবিয়ে রাখা হয়। তাই ঐ কাঠি বেশ পেচ্ছিল মনে হয়। ওতে খরচ কম এবং গুণেও ভাল। বিশেষ করে জলে ভিজে গেলেও ঐ কাঠিকে জ্বলতে অসুবিধা হয় না। আমাদের দেশে প্রচুর দিয়াশলাইয়ের কারখানা আছে। দিয়াশলাই এমন একটি শিল্প, যাকে বড় শিল্প এবং ক্ষুদ্র শিল্প উভয় শিল্পেরই আওতায় আনা যায়।

✪ ডাকটিকিটি ✪

পৃথিবীর প্রায় সবদেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে ডাকটিকিট সংগ্রহ করার নেশা অত্যন্ত প্রবল। ঐ ছেলেমেয়েরা যখন বড় হয় তখনও তাদের মধ্যে সেই সখ বিদ্যমান থাকে। এমনও দেখা গেছে, অতি সাধারণ মূল্যের একটা ডাকটিকিটের জন্য তাঁরা হাজার টাকা ব্যয় করতেও কুণ্ঠা বোধ করে না।

ডাকটিকিট সংগ্রহের অভ্যাসটি নিঃসন্দেহে একটি ভাল অভ্যাস। ডাকটিকিটে সাধারণতঃ দেশের রাজা বা প্রেসিডেন্ট, কবি ও সাহিত্যিক, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, দেশবরেণ্য নেতা প্রভৃতির প্রতিকৃতি মুদ্রিত হয়। আবার কোন কোন মূল্যের টিকিটে নিসর্গ দৃশ্য, জীবজন্তু, ফুলফল অথবা কোন ঐতিহাসিক ঘটনার ছবিও থাকে। তাই ডাকটিকিটের মাধ্যমে ছেলেমেয়েরা বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক অবস্থা থেকে আরম্ভ করে বহু মনীষীর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। আমাদের ছেলেমেয়েদের প্রত্যেকেরই এই অভ্যাস গড়ে ওঠা উচিত।

এই ডাকটিকিটের ইতিহাস কিন্তু বেশিদিনের নয়। পৃথিবীর মধ্যে সর্বপ্রথম ইংলণ্ডেই ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই মে তারিখে ডাকটিকিটের প্রচলন হয়। আবিষ্কর্তা হলেন স্যার রোনাল্ড হিল নামে জনৈক পোস্টমাস্টার জেনারেল। তাঁর এই আবিষ্কার ডাক ব্যবস্থাকে যথেষ্ট ভাবে উন্নত করেছে।

সেদিন এক পেনি এবং দুপেনি মূল্যের মাত্র দুরকমের ডাকটিকিট বাজারে ছেড়ে ছিলেন রোনাল্ড হিল। প্রত্যেকটি টিকিটের উপরে ইংলণ্ডের রাজার প্রতিকৃতি ছিল, কিন্তু আজকের দিনের টিকিটের মত চারপাশে ছিদ্র ছিল না। টিকিট যাতে জাল হতে না পারে তার জন্য কাগজের মধ্যে জলছাপের ব্যবস্থা করেছিলেন রোনাল্ড হিল। তাঁর ঐ ব্যবস্থা এখনও অনুসরণ করা হয়।

প্রথম ডাকটিকিটের পেছনে আঠা লাগানোর ব্যবস্থা ছিল না। আর পোস্টমাস্টার কাঁচিতে কেটে টিকিট সরবরাহ করতেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কাজটাকে সহজ করার জন্য আর্চার নামে জনৈক যন্ত্রবিদ ডাকটিকিটের চারপাশে ছিদ্র করার জন্য একধরনের যন্ত্রের আবিষ্কার করেন। আঠা লাগিয়ে শুকিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয় আরও অনেক পরে।

ডাকটিকিট আবিষ্কারের পূর্বে পোস্টমাস্টার এবং পত্রদাতা উভয়েরই ভয়ানক অসুবিধা হতো। পত্রদাতাকে পোস্ট অফিসে গিয়ে কোথায় পত্র প্রেরণ করবে জানাতে হতো। পোস্টমাস্টার দূরত্ব হিসাব করে মাশুলের পরিমাণ জানাতেন। তারপর পয়সা গ্রহণ করে তামার পাতে ছাপ দিয়ে চিঠির সঙ্গে আটকে দিতেন। তাতে একটা চিঠির পেছনে পোস্টমাস্টারকে অন্ততঃপক্ষে পাঁচটা মিনিট ব্যয় করতে হতো। এখনকার মত ডাকবাক্স ছিল না এবং যখন খুশি চিঠিও ডাকে দেওয়া যেত না। এই ব্যবস্থার উন্নতির জন্য সেকালে অনেকেই চিন্তা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত রোনাল্ড হিলের ব্যবস্থাই ইংলণ্ড গ্রহণ করে এবং দেখতে দেখতে সবদেশই উক্ত ব্যবস্থাকে স্বাগত জানায়।

ভারতবর্ষে ডাকটিকিটের প্রচলন হয় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের ১লা অক্টোবর। বিশেষ আইনের বলে সেইদিন থেকে চিঠির ওজন অনুযায়ী ডাক-মাশুল নির্ধারিত হয় এবং প্রেরককে ডাকটিকিট লাগাতে বাধ্য করা হয়। বলা বাহুল্য ব্যবস্থাটা ছিল ইংলণ্ডেরই অনুরূপ। এখানেও কাঁচি দিয়ে টিকিটকে কাটতে হতো। টিকিটে থাকতো ইংলণ্ডের রাজার প্রতিকৃতি এবং লেখা থাকতো "ইস্ট ইণ্ডিয়া পোস্টেজ"। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া পোস্টেজের পরিবর্তে লেখা হল কেবল 'ইণ্ডিয়া পোস্টেজ'।

বৃটিশ ভারতে ডাকটিকিটের উপর রাজার প্রতিকৃতিই ছাপান হতো। স্বাধীনতা লাভের পর বিশেষ বিশেষ সময়ে প্রধানমন্ত্রী থেকে বড় বড় দেশনেতা, ভারতের অগ্রগতি, জাতীয় ফুল—পাখী—জন্তু সবকিছুই ডাকটিকিটের মাধ্যমে প্রকাশ করা হচ্ছে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ভারতের ডাক ব্যবস্থা অতি প্রাচীন। সুলতানি আমলে সরকারি ডাকের প্রচলন ছিল। শের শাহের আমল থেকে এই ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। ঘোড়ার ডাকের সাহায্যে সরকারি খবর পঞ্চাশ-দিনের পথ মাত্র পাঁচদিনে অতিক্রম করে রাজার কানে এসে পৌঁছতো। অবশ্য আজকের মত সেকালে জনসাধারণের বাহিরে চিঠি লেখার বিশেষ প্রয়োজন হতো না। কেবল যারা রাজার চাকরি গ্রহণ করে দূরে থাকতো তাদেরই চিঠি লেখার প্রয়োজন হতো। যারা চিঠি লিখতো তারা হয় সরকারি ব্যবস্থার মাধ্যমে অথবা নিজস্ব বাহক মাধ্যমে চিঠি পাঠাতো। বর্তমানে আমাদের কর্মক্ষেত্র যেভাবে প্রসারিত হয়েছে তাতে ডাক ব্যবস্থা উন্নতি না হলে ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো। তাই স্যার রোনাল্ড হিল এবং আর্চারের আবিষ্কারের তুলনা হয় না।

✪ খনিজ তৈল থেকে প্রোটিন ✪

খনিজ তৈল অত্যন্ত বিশ্রী ও দুর্গন্ধযুক্ত তরল পদার্থ। তাকে বিভিন্ন তাপমাত্রায় পাতিত করে পেট্রোলিয়াম, কেরোসিন, ভারী তেল প্রভৃতিকে পৃথক করে নেওয়া

হয়। অবশেষ রূপেও পড়ে থাকে বহু তরল পদার্থ। চিনি পৃথক করে নেওয়ার পর অবশেষ থেকে যেমন সন্ধান ক্রিয়ার দ্বারা অ্যালকোহল, গ্লুকোজ প্রভৃতি মূল্যবান পদার্থ প্রস্তুত করা যায় ঠিক তেমনই বিশেষ ধরনের সন্ধানক্রিয়া বা কিণ্বন পদ্ধতির দ্বারা খনিজ তৈলের অবশেষ থেকে প্রোটিন নামক আমাদের অতি প্রয়োজনীয় খাদ্যোপাদানটি প্রস্তুত করা হয়ে থাকে। বর্তমান শতাব্দীর এটিও একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার।

জীবদেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি সাধনে প্রোটিনের গুরুত্ব সর্বাধিক। আমরা যে খাদ্য-দ্রব্যগুলি গ্রহণ করি তাকে হজম করার জন্য এনজাইম নামক যে জৈব অণুঘটকগুলি সাহায্য করে সেগুলি প্রোটিন জাতীয়। আবার রক্ত উৎপাদনের জন্য এবং শরীরকে রোগ-প্রতিষেধক ক্ষমতা দান করার জন্য প্রোটিন একান্ত প্রয়োজনীয়। তাই আমরা প্রতিদিন যে খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে থাকি সেই তালিকায় প্রোটিন জাতীয় খাদ্য থাকার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়তা আছে। এখন এই প্রোটিন সম্বন্ধে দু-চার কথা বললেই ওর গুরত্ব আরও ভালভাবে উপলব্ধি করা যাবে।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিখ্যাত বিজ্ঞানী এমিল ফিসার সর্বপ্রথম প্রোটিনের রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। অবশেষে তাঁর এবং সহকর্মীদের অক্লান্ত চেষ্টায় একদিন প্রোটিন তাঁর অবগুণ্ঠন মোচন করে। তাঁদের পরীক্ষাগুলি থেকে প্রমাণিত হয়, প্রোটিন কতকগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নয়। এমিল ফিসার পরীক্ষার দ্বারা আরও প্রমাণ করেন, অ্যামিনো অ্যাসিডরা প্রোটিনে পর পর শৃঙ্খলের আকারে সাজান থাকে। আবার ঐ অ্যামিনো অ্যাসিডগুলির উপাদান একই হলেও আণবিক ওজন ওদের ভিন্ন ভিন্ন। এক একটির আণবিক ওজন কয়েক হাজার থেকে কয়েক লক্ষও হতে পারে।

প্রোটিন দু' রকমের। উদ্ভিজ্জ প্রোটিন এবং প্রাণীজ প্রোটিন। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে, উদ্ভিজ্জ প্রোটিনের অ্যামিনো অ্যাসিডের পুষ্টিমান এবং প্রাণীজ প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের পুষ্টিমান সমান নয়। আমাদের দেহতন্তু যেসব অ্যামিনো অ্যাসিড দিয়ে তৈরি বা আমাদের দেহে যে অ্যামিনো অ্যাসিড-গুলির প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি—সেগুলি লাভ করা যায় ঐ প্রাণীজ প্রোটিন থেকেই। কিন্তু এমন কিছু কিছু দেশ আছে যেখানে প্রাণীজ প্রোটিন সহজলভ্য নয়। আবার পৃথিবীতে জনসংখ্যা যে হারে বেড়ে চলেছে তাতে মনে হয় ভবিষ্যতে ঐ খাদ্যোপাদানটি দুর্মূল্য হয়ে উঠবে। তাই আগে থেকেই বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম-ভাবে প্রাণীজ প্রোটিন উৎপাদন করার জন্য আগ্রহশীল হয়ে উঠেন এবং অতি অল্পখরচে যাতে পুষ্টিকর প্রোটিন উৎপাদন করা যায় তার জন্যও যত্নবান হন।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই খোঁজাখুঁজি সুরু হয় বিজ্ঞানীদের। তারপর একদিন সন্ধান পেলেন ইস্ট নামক এককোষী জীবাণুর কোষে যে প্রোটিন থাকে তাতেই আমাদের দেহ গঠনের উপযোগী অ্যামিনো অ্যাসিড বর্তমান। এখন বিজ্ঞানীদের চিন্তা হল, কেমন করে সহজভাবে ঈস্টকে লাভ করা যাবে?

সুরু হল বিজ্ঞানীদের গবেষণা। শেষ পর্যন্ত জীবাণুর বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় কারবনের উৎস খুঁজতে গিয়ে পরিত্যক্ত খনিজ তেলের উপর তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ

হল। চললো বিভিন্ন দেশে গবেষণা। ইওরোপের অধিকাংশ দেশ, আমেরিকা, সোভিয়েত রাশিয়া কেউ বাদ পড়লেন না।

সমস্যার সমাধান হল একদিন। বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, খনিজ তৈল থেকে পেট্রোলিয়ামাদি পৃথক করে নেওয়ার পর যে অবশেষ পড়ে থাকে তাতে বহু জৈব যৌগ বর্তমান থাকে। ঐ জৈব যৌগগুলি জীবাণু বৃদ্ধির পক্ষে বেশ সহায়ক। তারপর কয়েকটি ধাতব লবণ উক্ত অবশেষে যোগ করে তাপমাত্রা ও অম্লত্ব নির্দিষ্ট রেখে ঈস্ট চাষ করতে গিয়ে অবাক হলেন। দেখলেন, এই প্রক্রিয়ায় ঈস্টদের বংশ বৃদ্ধি ঘটে অস্বাভাবিক ভাবে। তারপরই আবিষ্কৃত হয় বিশেষ ধরনের সন্ধান প্রক্রিয়ার যন্ত্র। সেই যন্ত্রের সাহায্যে খনিজ তেলের অবশেষ থেকে প্রোটিন নিষ্কাশিত হল। ইওরোপের প্রায় সবদেশ বর্তমানে এই উপায়ে প্রোটিন উৎপাদন করছে। ভারতবর্ষের বিজ্ঞানীরাও দীর্ঘকাল প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছিলেন। বর্তমানে তাঁরাও কৃতকার্য হয়েছেন। দেখা গেছে, কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত প্রোটিনের খাদ্যমূল্য কোন অংশে প্রাণীজ প্রোটিন অপেক্ষা নিকৃষ্ট নয়।

এখন প্রশ্ন, কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত প্রোটিন—যার গুণ মাছ কিংবা মাংস ভক্ষণের মতই, তাকে নিরামিষ অথবা আমিষ, কী বলা যাবে?

কয়লাকে গুঁড়ো করে অত্যধিক চাপ ও তাপমাত্রায় তার উপর দিয়ে হাইড্রোজনকে পরিচালনা করে কৃত্রিমভাবে পেট্রোলিয়ামও তৈরি করা যায়। অতএব কয়লা থেকে সরাসরি এক প্লেট সুস্বাদু মাংসের তরকারি কৃত্রিমভাবে বানাতে পার কিনা—সে বিষয়ে তোমরা চেষ্টা করে দেখতে পার।

✪ জীবদেহে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া ✪

অনেকদিন আগেকার কথা।

সেকালে মানুষের ধারণা ছিল, শরীরের মাংসপেশী, হাড় ইত্যাদির মত রক্তটাও শরীরের সর্বত্র স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ রক্তের সঞ্চালন হয় না। এই প্রাচীন ধারণায় প্রথম অসন্তোষ প্রকাশ করেন ইটালীর পাডুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেষজবিদ্যার অধ্যাপক এনড্রিয়া ভেসালিয়াম। কিন্তু বহুকাল গবেষণা করেও তিনি কোন নতুন তথ্য উপস্থাপিত করতে সক্ষম হলেন না।

ভেসালিয়ামের কাল গত হল। তাঁর সন্দেহ প্রভাবিত করলো অনেককে। তাঁরা সবাই আরম্ভ করলেন চিন্তা। তবে সুবিধা করতে পারলেন না কেউ। শেষে মাইকেল সারভেটাস নামে একজম দার্শনিক ও শারীরতত্ত্ববিদ এক নতুন তথ্য পরিবেশন করলেন। তিনি বললেন, আমাদের কিংবা যে-কোন জীবদেহে রক্ত এক জায়গায় স্থিরভাবে অবস্থান করছে না। সবসময় ফুসফুসের মাধ্যমে হৃদয়ের ডান প্রকোষ্ঠ থেকে বাম প্রকোষ্ঠে প্রবাহিত হচ্ছে এবং ঐখান থেকে শরীরের সর্বত্র সঞ্চালিত হচ্ছে।

কথাটা ভাল লাগলো না অনেকের। বিশেষ করে ধর্মযাজকরা ক্ষুণ্ণ হলেন। কারণ, প্রাচীন সংস্কার এবং প্রচলিত ধর্মশাস্ত্রগুলি যেভাবে শরীর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছে সারভেটাসের মতবাদ সেগুলির সম্পূর্ণ বিপরীত। তবুও চুপচাপ ছিলেন ধর্মগুরুরা। কিন্তু কী খেয়াল হল সারভেটাসের! একদিন প্রচার করতে আরম্ভ করলেন, জীবের আত্মা ঐ রক্তের মধ্যেই অবস্থান করে। এবার সত্য সত্যই ধৈর্য-চ্যুতি ঘটলো ধর্মযাজকদের। শাস্ত্রানুযায়ী আত্মা অবিনশ্বর এবং সে দেহ ও মনের অতীত। সারভেটাসের মতবাদ মানুষকে কুপথে পরিচালিত করবে, মানুষ ধর্ম ও ঈশ্বরকে মানবে না, অধর্মে ভরে যাবে দেশ—এইসব অজুহাতে তাঁরা সারভেটাসকে অভিযুক্ত করলো। জনসাধারণকেও তাঁরা বুঝালেন, ধর্মদ্রোহীতার ফল আদৌ ভাল হয় না। একের পাপে সারাদেশকেই ফলভোগ করতে হয়।

ধর্মযাজকদের প্ররোচনায় জনসাধারণ একেবারে ক্ষেপে উঠলো। অবশেষে হল বিচার। বিচারক রায় দিলেন, সারভেটাস যদি তাঁর মত প্রত্যাহার করে দোষ স্বীকার করেন তাহলে তাঁকে ক্ষমা করা হবে। নতুবা ধর্মবিরুদ্ধ প্রচারের জন্য অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করা হবে।

সারভেটাস্ কিন্তু রইলেন অচল ও অটল হয়ে। ফলে একদিন সত্য সত্যই তাঁকে আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হল। সারভেটাস্ তাঁর মতবাদকে জনসমক্ষে প্রচার করার জন্য একটি বইও লিখেছিলেন। সে বইটিও রক্ষা পেল না। তাকেও পুড়িয়ে ফেলা হল আগুনে। ধর্মযাজকগণ ভাবলেন, অতঃপর এ ধরনের কথা আর কেউ প্রচার করতে সাহসী হবে না। যেন নিশ্চিন্ত হলেন তাঁরা।

কিন্তু সন্দেহ জিনিসটা বড় ভয়ানক। অতি সঙ্গোপনে সে সর্বত্র সমভাবে সংক্রমিত হয়ে পড়ে। তাছাড়া যে ব্যক্তি আপন মতবাদকে গুরুত্ব দিয়ে প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিলেন, তাঁর মতবাদটি কতখানি সত্য তা যাচাই করার জন্য অনেকেই হয়ে উঠলেন আগ্রহী এবং নানা দৃষ্টিকোণ থেকে করলেন চিন্তা ও গবেষণা। অবশেষে সারভেটাসের মৃত্যুর সাত বছর পরে রিয়ালভাস কোলাম্বাস নামক এক শারীরতত্ত্ব-বিদের কাছে তাঁর মতবাদের গুরুত্ব ধরা পড়ল। কিন্তু কোলাম্বাস সাহসী হলেন না মতবাদটিকে পুনরায় প্রচার করতে। আরও কয়েকবছর পরে ব্রুনো নামক এক বিজ্ঞানীও সারভেটাসের মতকে সমর্থন করলেন। তবে ঐ পর্যন্তই সার হল। তাঁরা প্রচার না করে ভাবীকালের গবেষকদের জন্য লিখে রেখে গেলেন।

একদিন এল প্রখ্যাত শারীরতত্ত্ববিদ উইলিয়ম হার্ভের কাল। উপরোক্ত বিজ্ঞানীদের মতবাদ প্রভাবিত করলো তাঁকেও। তিনি কেবলমাত্র চিন্তাভাবনার মধ্যে তাঁর গবেষণাকে সীমাবদ্ধ রাখলেন না—নানাবিধ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে আরম্ভ করলেন। শেষে তিনিই প্রতিষ্ঠিত করলেন রক্তসঞ্চালন তত্ত্বকে—যা অনেকটা হতভাগ্য বিজ্ঞানী সারভেটাসের মতবাদের অনুরূপ। তবে হার্ভে রক্তসঞ্চালন প্রমাণ করতে গিয়ে আত্মাকে টেনে আনেননি।

হার্ভের পরও রক্তসঞ্চালন সম্বন্ধে দীর্ঘকাল ধরে গবেষণা হয়েছিল। সর্বশেষে অণুবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কৃত হলে সব বিতর্ক এবং সব গোঁড়ামির অবসান হয়।

———

✪ ফেজ কনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ ✪

এক ছিলেন কিশোর। নাম তাঁর ফ্রিট্স জার্নিক। আমস্টারডাম শহরের একটি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতেন। ভারি বুদ্ধিমান ছিলেন জার্নিক। স্বভাবটাও ছিল খুব সুন্দর। সহপাঠী বন্ধুদের সঙ্গে কক্ষনো ঝগড়াঝাটি করতেন না। শ্রদ্ধাবান ছিলেন শিক্ষক ও গুরুজনদের প্রতি।

সেই ছোটবেলা থেকে জার্নিকের অজানাকে জানার কৌতূহল ছিল প্রবল। একদিন স্কুল যাওয়ার পথে দেখলেন, এক ফেরিওয়ালা পেতলের তৈরি খেলনা দূরবীন বিক্রী করছে। বালক জার্নিক দূরবীন একটা হাতে নিয়ে বেশ ভালভাবে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। ভারি সুন্দর এই খেলনাতো? চোখের সামনে ধরলে দূরের বস্তুকে বেশ বড় দেখাচ্ছে।

টিফিনের জন্যে পয়সা দিয়েছিলেন বাবা। ভাবলেন জার্নিক একদিন স্কুলে না খেলে এমন কিছু অসুবিধা হবে না। তার চেয়ে এই খেলনা দূরবীনই একটা কেনা যাক! বেশ মজা হবে তাহলে। সঙ্গে সঙ্গে পকেট থেকে পয়সাগুলো বার করে ফেরিওয়ালার কাছ থেকে কিনে নিলেন একটা দূরবীন।

স্কুল ছুটির পর বাড়িতে এসে দূরবীন নিয়েই মেতে উঠলেন জার্নিক। যন্ত্রটির সাহায্যে দূরের বস্তুরাদিকে কেবল তাকিয়েই ক্ষান্ত হলেন না, ওর ভেতরটায় কী রহস্য লুকিয়ে আছে তাই জানার জন্য হলেন বদ্ধপরিকর। ভাবলেন, একবার খুলেই দেখা যাক!

যেই ভাবা সেই কাজ। কিন্তু খুলে ফেলতেই তাঁর চক্ষুস্থির। পেতলের নলের ভেতরে কেবলমাত্র দু'খানা গোল গোল কাচের চাকতি ছাড়া আর কিছুই নেই। ঐ কাচগুলোর একটু বৈশিষ্ট্য যা চোখে পড়ল। ভাবলেন, এমন কাচের চাকতি পেলে তিনিও দূরবীন তৈরি করতে পারেন। কিন্তু কোথায় পাওয়া যাবে এই ধরনের কাচের চাকতি?

অনেক চিন্তা করে মোটা মোটা কাচের টুকরাকে ঘষে ঘষে দূরবীনের কাচের মত বানাতে সচেষ্ট হলেন, কিন্তু পারলেন না সেদিন। তবে লেন্স ও আলোর সম্বন্ধে ভালভাবে জানার দুর্বার এক কৌতূহল অনুভব করলেন মনে মনে। ভাবলেন, বড় হয়ে তিনি এই দুটি বিষয়ে গবেষণা করবেন।

কতদিন কেটে গেল। ফ্রিট্স জার্নিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লাভ করলেন পদার্থবিদ্যার উপর সর্বোচ্চ ডিগ্রী। কিন্তু ভুললেন না সেই ছেলেবেলায় দেখা দূরবীনের কথা। একদিন সত্য-সত্যই গবেষণা আরম্ভ করলেন লেন্স ও আলোককে নিয়ে। তৈরি করলেন উত্তল অবতল প্রভৃতি কত ধরনের লেন্স। রাতদিন চলল কেবল পরীক্ষার পর পরীক্ষা। শেষে তৈরি করলেন এক অদ্ভুত রকমের অণুবীক্ষণ যন্ত্র—যার কার্যকরী ক্ষমতা সাধারণ অণুবীক্ষণ যন্ত্র অপেক্ষা অনেক—অনেক গুণ বেশি। সেই অণুবীক্ষণ যন্ত্রটির নাম রাখলেন "ফেজ কন্‌ট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ"।

ফেজ কন্‌ট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপ আজকে সকল রকমের সূক্ষ্ম গবেষণায় অপরিহার্য

হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই অণুবীক্ষণ যন্ত্রের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে জীবন্ত তন্তুর ক্রিয়া-কলাপ লক্ষ্য করা এবং জীবনের মূল রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা। তাই জীবন বিজ্ঞান এত দ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

যন্ত্রটির বিস্ময়কর কার্যকারিতা দেখে ১৯৫৩ খ্রীষ্টাব্দে জার্নিককে নোবেল পুরস্কার প্রদান করে সম্মানিত করা হয়েছে।

কোথায় সেই খেলনা দূরবীন আর কোথায় ফেজ কনট্রাষ্ট মাইক্রোস্কোপ? অজানাকে জানার কৌতূহল, অধ্যবসায় এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল বলে জার্নিক এতবড় হতে পেরেছিলেন।

✪ শনির বলয় গ্রহাণুপুঞ্জ, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো ✪

প্রাচীনকালেই মানুষ বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি ও শনি এই পাঁচটি গ্রহকে আকাশে দেখতে পেয়েছিল। সম্ভব হয়েছিল খালি চোখে এদের সবাইকে দেখা যায় বলে। কিন্তু শনিগ্রহের বলয়ের কথা কেউ জানতো না। বলয় ধরা পড়ল গ্যালিলিও দূরবীন তৈরি করার পর থেকেই।

আকাশে শনিগ্রহের স্বাতন্ত্র্য ওর বলয়ের জন্যই। বহুদিন থেকে এই বলয় ভাবিয়ে এসেছিল বিজ্ঞানীদের। দূরবীনের সাহায্যে তাঁরা দেখতে পেয়েছিলেন, শনির নিরক্ষবৃত্তের চারদিক বেষ্টন করে আছে পর পর নিচ থেকে উপরের দিকে তিনটি বলয়। বলয়গুলির উপাদান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ড ছাড়া আর কিছুই নয়। সেগুলি সবসময় অস্থিরভাবে ছুটাছুটি করছে বলয়ের মধ্যে। বোধহয় এই কারণেই শনি মানুষের মনে এত ভীতির সঞ্চার করে এসেছিল।

দীর্ঘদিন ধরে বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেও শনির বলয়ের মীমাংসা করতে পারেননি। শেষে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে "রচি" নামে এক বিজ্ঞানী এই রহস্যের সমাধান করেছেন এবং তাঁর সেই মতবাদকে মেনে নিয়েছেন সমস্ত বিজ্ঞানীরা।

আজ পর্যন্ত আবিষ্কৃত শনির উপগ্রহের সংখ্যা ২২টি হলেও পূর্বে উপগ্রহের সংখ্যা আর একটি বেশী ছিল রচির মতে নিকটতম উপগ্রহটি শনির কাছাকাছি এসে পড়ায় ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে বলয়ের সৃষ্টি করেছে এবং আজও সেই টুকরোগুলো সমানে ঘুরে বেড়াচ্ছে বলয়ের আকারে।

উপগ্রহটি ভেঙে পড়ার কারণও নির্দেশ করেছেন রচি। বলেছেন, যদি কোন গ্রহের উপগ্রহ তার ব্যাসার্ধের মাত্র ২·৪৫ গুণ দূরে এসে পড়ে তাহলে উপগ্রহটি ভেঙে পড়বেই। তবে এই ব্যাপারটি সম্ভব কেবলমাত্র বড় বড় গ্রহদের ক্ষেত্রে। পৃথিবী প্রভৃতি ছোট ছোট গ্রহ—যাদের আকর্ষণ বল কম তাদের ক্ষেত্রে কখনই সম্ভব নয়। এই একই কারণে বৃহস্পতির একটি উপগ্রহের কাল আসন্ন। হয়ত অদূর ভবিষ্যতে সেই উপগ্রহটিও বৃহস্পতিপৃষ্ঠে ভেঙে পড়বে এবং শনির মত তারও সৃষ্টি হবে বলয়।

ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো সূর্য থেকে বহুদূরে অবস্থান করছে। খালি চোখে ওদের দেখা যায় না। তাই ওদের আবিষ্কার করা হয়েছে অনেক পরে। ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কৃত হয়েছে ইউরেনাস, ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে নেপচুন এবং প্লুটো আবিষ্কৃত হয়েছে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে। এদের আবিষ্কারের পেছনে আছে জ্যোতির্বিজ্ঞানী বোড এবং তাঁর সহকর্মী টিসিয়াস কর্তৃক প্রদত্ত গ্রহদের দূরত্বসূচক এক বিশেষ ধরনের গণনা। এই গণনার ফলেও আবিষ্কৃত হয়েছে মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে অবস্থানকারী গ্রহাণুপুঞ্জ।

এককালে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে বিরাট ফাঁকা জায়গা দেখে অবাক হয়ে ছিলেন। পরে বোড এবং টিসিয়াসের সূত্র হাতে পেয়ে কয়েকজন বিজ্ঞানী চিন্তা করলেন, এই দুই গ্রহের মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটি গ্রহের অস্তিত্ব সম্ভব। তখন তাঁরা সবাই সচেষ্ট হলেন ফাঁকা জায়গাটায় কোন গ্রহ অবস্থান করছে কিনা তা আবিষ্কার করার জন্য। শেষে সিসিলির প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী পিয়াজী আবিষ্কার করলেন গ্রহদের তুলনায় অতি ক্ষুদ্র একটি বস্তুপিণ্ডকে। যার আকৃতি ঠিক ঠিক গ্রহের মত না হলেও আচরণে গ্রহের মতই। পিয়াজী রোমক দেবতার নামানুসারে ক্ষুদ্র গ্রহটি নামকরণ করলেন 'সিরিস'। সিরিসের ব্যাস মাত্র ৪৮০ মাইল।

পিয়াজীর আবিষ্কারের পর বিজ্ঞানী মহলে সাড়া পড়ে গেল। অনেকেই চালালেন অনুসন্ধান। একে একে আবিষ্কৃত হল ৩০০ মাইল ব্যাসের বস্তুপিণ্ড থেকে মাত্র এক মাইল ব্যাসের অসংখ্য বস্তুপিণ্ড। এদের ছাড়াও বিজ্ঞানীরা বুঝতে পারলেন, নগন্য ব্যাসের বস্তুপিণ্ডের সংখ্যাও কিছু কম নয়। লক্ষ লক্ষ এমন কি কোটি কোটি ওরা প্রদক্ষিণ করছে সূর্যকে। তাদের আকৃতি কোনটি গোল, কোনটি বেলনাকার, কোনটি মোচার খোলের মত, কোনটি পিরামিডের আকৃতি বিশিষ্ট, আবার কোনটির আকৃতি শিলনোড়ার মত। অধিকাংশই চরকির মত পাক খেতে খেতে ঘুরছে তাদের কক্ষপথে। একত্রে ওদের সবাইকে বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ। বড়গুলির কয়েকটির নামকরণ করেছেন বিজ্ঞানীরা। তাদের নাম হল সিরিস, ঈরস, ভেস্টা, পেলাস প্রভৃতি। বিজ্ঞানীরা অনুমান করেন, মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যাস্থিত গ্রহটি কোন কারণে ধ্বংস হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। অথবা সেই সুদূর অতীতে গ্রহদের উৎপত্তির সময় এখানকার বস্তুপিণ্ডগুলি একত্রিত হয়ে বড় গ্রহের রূপ গ্রহণ করতে পারেনি।

এবার আসা যাক সূর্যের দূরের গ্রহগুলির কথায়। বলা বাহুল্য এগুলিও আবিষ্কৃত হয়েছে বোড ও টিসিয়াসের সূত্রকে অনুসরণ করে। সূত্র প্রকাশের পর বিজ্ঞানীরা অনুমান করলেন, শনির পরেও গ্রহ থাকা সম্ভব। অনেকেই এগিয়ে এলেন গবেষণা করতে। কিন্তু আবিষ্কার করা সম্ভব হল না কারুর পক্ষে। কিন্তু প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী হার্শেল এ-বিষয়ে গবেষণা না করেই আকস্মিকভাবে আবিষ্কার করলেন ইউরেনাসকে।

হার্সেল তাঁর মানমন্দিরে বসে দৈনিক আকাশ পর্যবেক্ষণ করতেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নিজ হাতে তৈরি করেছিলেন একটি খুব শক্তিশালী দূরবীন। একদিন

রাতে তিনি মিথুন রাশিকে পর্যবেক্ষণ করার সময় দেখলেন, আকাশের গায়ে উঁকি দিচ্ছে অস্পষ্ট এক আলোর চাকতি। হার্সেল প্রথমে মনে করেছিলেন এটি একটি ধূমকেতু ছাড়া অন্য কিছুই নয়। শেষে অনেক গবেষণার পর বুঝতে পারলেন, তিনি একটি নতুন গ্রহ আবিষ্কার করেছেন। এটি হল সূর্যের সপ্তম গ্রহ।

ইউরেনাস আবিষ্কারের পর আবার বিজ্ঞানীদের মধ্যে সুরু হল তোড়জোড়। সূর্য থেকে ইউরেনাসের দূরত্ব এবং গতি নির্ণয় করার জন্য আরম্ভ হল অঙ্ক কষা। এবার বিজ্ঞানীরা সত্যই বড় গোলমালে পড়লেন। আকাশে ইউরেনাসের গতির সঙ্গে গাণিতিক পদ্ধতিতে নির্ণয় করা গতির মধ্যে দেখা গেল বেশ একটু গরমিল। মহা ভাবনায় পড়লেন বিজ্ঞানীরা। গণিত তো আর মিছে কথা বলবে না ?,

বিজ্ঞানীরা আবার নতুন করে চিন্তা করতে বসলেন। পরে ঠিক করলেন, গতির গরমিল হতে পারে—যদি অজ্ঞাত কোন গ্রহের আকর্ষণ ইউরেনাসের উপর পড়ে থাকে।

আবার তৎপর হয়ে উঠলেন বিজ্ঞানীরা। কোথায় সেই অজ্ঞাত গ্রহ? যে কোন প্রকারে তাকে খুঁজে বার করতেই হবে।

সুরু হল অঙ্ক কষা—অঙ্ক কষা—আর অঙ্ক কষা। অঙ্কের মাধ্যমেই বিজ্ঞানীরা ঠিক করলেন ইউরেনাস থেকে কতদূরে এবং আকাশের কোন অংশে এই গ্রহটির অবস্থান সম্ভব।

ব্রিটিশ বিজ্ঞানী অ্যাডামসই প্রথম গণনা করে নতুন গ্রহটি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন। কিন্তু কোন কারণে তিনি নিজে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত না হয়ে তাঁর পরিচিত এক জ্যোতির্বিজ্ঞানীকে অনুসন্ধান করার জন্যে অনুরোধ জানালেন। সেই জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম ছিল চ্যালিস। চ্যালিস সহজেই রাজি হলেন। কিন্তু তখন ইংলণ্ডের কোন মানমন্দিরে আকাশের গ্রহনক্ষত্রাদির ভাল নকসা না থাকায় গবেষণা চালাতে ভয়ানক অসুবিধার সম্মুখীন হলেন তিনি। তখন বাধ্য হয়ে চ্যালিসকে কেম্ব্রিজ মানমন্দিরে গিয়ে আগে নকসা প্রস্তুত করতে হল।

অপরদিকে 'লেভেরিয়ে' নামে জনৈক ফরাসী বিজ্ঞানী অ্যাডামসের মত অঙ্ক কষে নতুন গ্রহটি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। তিনিও অনুসন্ধানের জন্য অনুরোধ জানিয়েছিলেন বার্লিনের জ্যোতির্বিজ্ঞানী 'গাল'কে। গাল কিন্তু বিন্দুমাত্র বিলম্ব করলেন না। সঙ্গে সঙ্গেই দূরবীন নিয়ে বসে গেলেন বার্লিন মানমন্দিরে। আকাশের নক্‌সা পেতেও অসুবিধা হল না তাঁর। কারণ বার্লিন মানমন্দিরে পূর্ব থেকে রক্ষিত ছিল নিখুঁত নক্‌সা। ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দের একদিন রাতে লেভেরিয়ে যে জায়গায় নতুন গ্রহটি থাকার সম্ভাবনার কথা নির্দেশ করেছিলেন ঠিক সেই জায়গায় নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যে একটু বড় ম্লান আলোর চাকতির মত গ্রহটির সন্ধান লাভ করলেন গাল। রোমে সমুদ্রের দেবতাকে বলা হয় নেপচুন। সদ্য আবিষ্কৃত এই গ্রহটি অন্ধকার মহাসমুদ্র সদৃশ মহাকাশে বিচরণ করছে বলে নাম রাখা হল নেপচুন।

সংবাদটা শ্রবণ করে ব্যথিত হয়েছিলেন অ্যাডম্‌স ও চ্যালিস। কারণ,

লেভেরিয়ের মতই নিভু'ল ভাবে অঙ্ক কষে নির্দেশ দিয়েছিলেন অ্যাডামসও। অ্যাডামস আবশ্য সম্মানিত হয়েছিলেন তাঁর ভবিষ্যদ্বানীর জন্য। কিন্তু বেচারা চ্যালিস। দীর্ঘদিন অক্লান্তভাবে পরিশ্রম করেও আবিষ্কারকের গৌরব অর্জন করতে পারলেন না।

সূর্য থেকে ২৭৯'৩ কোটি মাইল দূরে অবস্থিত নেপচুনকে পৃথিবী থেকে খালি চোখে দেখার উপায় নেই। অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়ঙ্কর শীতল এই গ্রহটি। ভোরের আকাশে শুকতারাকে যতবড় দেখায় নেপচুন থেকে সূর্যকেও দেখা যায় তত বড়। অথচ গ্রহটি পৃথিবীর প্রায় চারগুণ বড়। একটা আবহমণ্ডলকেও বন্দী করে রেখেছে সে। কিন্তু আবহমণ্ডলের বেশির ভাগই হচ্ছে মিথেন গ্যাস। দুটি উপগ্রহও আছে নেপচুনের। একটির নাম ট্রাইট্রন, অপরটির নাম নেরিড।

সূর্যের নবম গ্রহের নাম প্লুটো। নেপচুন আবিষ্কারের পরও বিজ্ঞানীদের অঙ্ক কষা সমানে চলতে লাগল। ধারণাটা এই, নেপচুনের পর গ্রহ থাকলেও থাকতে পারে। কতদিন কেটে গেল। শেষে উত্তর আমেরিকার প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিজ্ঞানী পার্সিভ্যাল লাওয়েল একদিন বুঝতে পারলেন, আবিষ্কৃত সবগুলি গ্রহের আকর্ষণ হিসাব করলেও ইউরেনাসের গতির গরমিল থেকে যাচ্ছে। অনেক চিন্তা করে ফ্ল্যাগস্টাফ মানমন্দির থেকে তিনি ঘোষণা করলেন, নেপচুনের পরও গ্রহ আছে। লাওয়েল কেবল ঘোষণা করে ক্ষান্ত হলেন না, নিজেই সচেষ্ট হলেন গ্রহটি আবিষ্কারের জন্য।

কেটে গেল সুদীর্ঘ আট বছর। লাওয়েলের গবেষণা তখন অনেক দূর এগিয়ে গেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য তাঁর। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে আকস্মিকভাবে পরলোক গমন করলেন তিনি। সুসম্পন্ন করতে পারলেন না নিজের কাজ।

লাওয়েল একা গবেষণা করতেন না। কয়েকজন সহকর্মীও তাঁর ছিল। মৃত্যুর পর সেই সহকর্মীরাই এগিয়ে এলেন নতুন গ্রহটির খোঁজে। এদিকে লাওয়েল যে মানমন্দিরে কাজ করতেন, সেই মানমন্দিরটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন তিনি নিজেই। কিন্তু সেখানে কোন শক্তিশালী দূরবীন ছিল না। লাওয়েলের মৃত্যুর পর মানমন্দিরটির নামকরণ করা হল লাওয়েল মানমন্দির এবং তাঁর মৃত্যুর প্রায় তের বছর পরে সেখানে বসান হল একটি মহাশক্তিশালী দূরবীন। তরুণ গবেষক টমবাউ ঐ মানমন্দির থেকেই ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে আবিষ্কার করলেন নতুন গ্রহ। এই গ্রহটি আবিষ্কারের পেছনে আছে দুজন বিজ্ঞানীর কৃতিত্ব। একজন হলেন পার্সিভাল লাওয়েল এবং অপরজন টমবাউ। তাই দুই-বিজ্ঞানীর নামকে জড়িয়ে গ্রহটির নামকরণ করা হল Pluto (প্লুটো)। অন্যদিক দিয়েও প্লুটোর নামকরণের সার্থকতা আছে। গ্রীকপুরানের পাতালপুরীর দেবতার নাম প্লুটো। ঘন তমসাচ্ছন্ন পাতাল পুরীতে নিঃশব্দে পদচারনা করেন প্লুটো। সূর্য থেকে বহুদূরে অর্থাৎ ৩৬৭ কোটি মাইল দূরে অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে ২৪৮ বছরে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে বলে প্লুটোর নামানুসারে এই গ্রহটির নাম। এর আয়তন বেশ ছোট। বিজ্ঞানীরা এখনও গ্রহটির সমূহ তথ্য আবিষ্কার করতে সক্ষম হননি।

✪ প্লাজমা ✪

আমাদের চারিদিকে যে বিশাল বস্তুজগৎ ছড়িয়ে আছে আমরা সাধারণতঃ তাদের তিনটি অবস্থায় দেখতে পাই। সে অবস্থাগুলি হল কঠিন, তরল এবং বায়বীয়। তিনটি অবস্থার কোনটিই বস্তুর স্থায়ী রূপ নয়। একমাত্র তাপের প্রভাবেই বস্তুর রূপান্তর ঘটে। সীসা, লোহা প্রভৃতি কঠিন পদার্থ সন্দেহ নেই। সেই সীসাকে গনগনে আগুনের উপর রেখে দিলে একটু পরেই চকচকে তরল পদার্থে পরিণত হয়। কামারশালায় লোহাকে তরল করতে কে না দেখেছে? আবার কঠিন পদার্থ বরফকে তাপপ্রয়োগ করলে জল হয়ে যায়। পরে সেই জলকেও উত্তপ্ত করলে বাষ্পে পরিণত হয়।

এই সব উদাহরণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, বস্তুমাত্রই কঠিন, তরল কিংবা বায়বীয় যে কোন অবস্থায় থাকতে পারে এবং আমরা চেষ্টা করলে বস্তুর অবস্থান্তর ঘটাতে পারি। আবার সে অবস্থান্তর আসে একমাত্র তাপমাত্রার হেরফেরের জন্যেই। উদাহরণ স্বরূপ আরও বলা যেতে পারে, এই পৃথিবীটাই জন্মলগ্নে ছিল অতিতপ্ত গ্যাসীয় পদার্থে পরিপূর্ণ। কালক্রমে পৃথিবী তাপ হারিয়ে শীতল হতে থাকায় প্রথমে গ্যাসীয় পদার্থ ঘনীভূত হয়ে তরল, তারপর আরও শীতল হয়ে কঠিন পদার্থে রূপান্তরিত হয়েছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরের তাপমাত্রা এখনও প্রচণ্ড বলে সেখানকার সমূহ পদার্থ তরল এবং গ্যাসীয় অবস্থায় আছে। তার কারণ, একই তাপমাত্রায় সব গ্যাসীয় পদার্থ ঘনীভূত হতে পারেনা কিংবা সমূহ কঠিন পদার্থ একই তাপমাত্রায় গলেনা। পৃথিবীর আবহমণ্ডলে যে সব গ্যাস অবস্থান করছে তারাও স্থায়ী নয়। যতখানি শীতল করলে তারা ঘনীভূত হয় সে পরিমাণ পৃথিবীপৃষ্ঠ শীতল নয় বলেই ওরা গ্যাসীয় অবস্থায় আছে।

এককালে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, বিশ্বের যাবতীয় পদার্থ কঠিন, তরল অথবা বায়বীয় যে কোন একটি অবস্থায় আছে। এদের মধ্যে কঠিন ও তরলকে আমরা চোখে দেখতে পাই কিন্তু বায়বীয় পদার্থকে আমরা দেখতে পাইনা। দীর্ঘকাল ধরেই চলে আসছিল এই ধারণা। অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা পদার্থের আর একটি অবস্থার সন্ধান পেয়েছেন। সেই অবস্থাটির নাম রেখেছেন প্লাজমা। আগে যেখানে পদার্থের শেষ অবস্থা বলতে গ্যাসীয় পদার্থকে বোঝান হত, এখন সেখানে শেষ অবস্থা প্লাজমাকে বোঝায়।

আবার বহু বৈজ্ঞানিকের মতে পদার্থের শেষ অবস্থা প্লাজমাও নয়। তার পরেও বস্তুর আর এক অবস্থা থাকা উচিত। সেইটিই হবে বস্তুর পঞ্চম ও শেষ অবস্থা। অবশ্য বিজ্ঞানীরা তাত্ত্বিক ভাবে মেনে নিয়েছেন একথা। এখনও প্রমাণিত হয়নি। তবে প্লাজমা অবস্থার পরিচয় বিজ্ঞানীরা লাভ করেছেন।

প্লাজমা অবস্থা আবিষ্কারের মূলে আছে পরমাণু বিজ্ঞানীদের অবদান। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেও বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, পদার্থের সূক্ষ্মাতিতম সূক্ষ্ম অস্তিত্ব

কণাই হচ্ছে পরমাণু। তাঁরা আরও মনে করতেন পরমাণুরা অবিভাজ্য কণা—ওকে ভাঙা যায়না এবং গড়াও যায় না।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানীরা অসাধ্য সাধন করলেন। পৃথিবীকে তাঁরা শোনালেন, পরমাণুরা নিরেট, ঠাসা বা অবিভাজ্য কণা নয়। ওদের ভাঙা যায় এবং গড়াও যায়। তাঁরা আরও জানালেন, পরমাণু বস্তুর অন্তিম কণাও নয়। খালি চোখে অদৃশ্য অতি সূক্ষ্ম যে পরমাণু, তার কেন্দ্রে পিণ্ডাবদ্ধ অবস্থায় থাকে প্রোটন, নিউট্রন, মেসন প্রভৃতি কণা। পরমাণুর মধ্যস্থিত এই জায়গাটির নাম কেন্দ্রক। কেন্দ্রকের চারপাশে বিরাট ফাঁকা জায়গা। সেই ফাঁকা জায়গাটায় দলে দলে ঘুরছে ইলেকট্রন। সূর্যের চারপাশে যেমন বিভিন্ন কক্ষপথে গ্রহরা পরিভ্রমণ করে ঠিক তেমনটি ইলেকট্রনরা পরিভ্রমণ করে কেন্দ্রকের চারপাশে। তবে গ্রহরা ঘুরে একক ভাবে, আর ইলেকট্রন কোথাও একা, কোথাও ঘুরে দলে দলে।

বিজ্ঞানীরা জেনে নিয়েছেন, কেন্দ্রকে যতগুলি প্রোটন থাকে বাহিরে ভ্রমণ করে ঠিক ততটা ইলেকট্রন। স্বভাবের দিক থেকে প্রোটনরা তড়িৎ ধনাত্মক এবং ইলেকট্রনরা তড়িৎ ঋণাত্মক। তাই পরমাণুর মধ্যে প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান সমান থাকায় বাহির থেকে পরমাণুকে তড়িৎ নিরপেক্ষ মনে হয়।

আগে বলা হয়েছে, ইলেকট্রনরা দলে দলে বিভিন্ন কক্ষপথে কেন্দ্রককে পরিক্রমা করে। পরমাণুর মধ্যে ইলেকট্রনের সংখ্যা যদি বেশি থাকে তাহলে সর্বশেষ কক্ষের ইলেকট্রনদের দূরত্ব কেন্দ্রক থেকে বেশ দূরে হয়। তাই স্বাভাবিক কারণেই কেন্দ্রকের আকর্ষণ তাদের উপর কিছুটা কম। বিজ্ঞানীদের ভাষায় সেই সব ইলেকট্রনরা একটু আলগাভাবে অবস্থান করে এবং এই ধরনের ইলেকট্রনদের অল্পায়াসে সরিয়েও নেওয়া যায়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, অপেক্ষাকৃত ভারি পরমাণুর (ওদের প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা বেশি) উচ্চতাপে উত্তপ্ত করলে ইলেকট্রন বিচ্যুত হয়ে যায় কিন্তু প্রোটন বিচ্যুত হয় না। কারণ হিসাবে তাঁরা জানিয়েছেন, কেন্দ্রকের মধ্যে কাজ করে প্রবল আকর্ষণ বল। তাকে বিচ্ছিন্ন করতে এমন প্রচণ্ড তাপমাত্রার প্রয়োজন যে, উক্ত তাপ সৃষ্টি করা মানুষের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক।

বিজ্ঞানীরা প্রোটনকে সরাতে না পারলেও উচ্চ উষ্ণতায় পরমাণু থেকে ইলেকট্রনকে সরিয়ে আনতে পারেন। কিন্তু যখনই পরমাণু থেকে ইলেকট্রন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখনই মূল পরমাণুটি হয়ে পড়ে ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট। কেননা পরমাণুর মধ্যে যতটা প্রোটন থাকে ঠিক ততটা থাকে ইলেকট্রন। মাত্র একটা ইলেকট্রনকে খসিয়ে আনলেই তড়িৎ সাম্য নষ্ট হয়ে যাবে। পদার্থটি যদি কঠিন কিংবা তরল না হয়ে গ্যাস হয় তাহলে ক্রমাগত তাপ প্রয়োগের ফলে বিচ্যুত ইলেকট্রনের সংখ্যা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং অপরদিকে ধনাত্মক আধানের সংখ্যাও বেড়ে যায়।

বিজ্ঞানীরা বলেন, অত্যধিক তাপপ্রয়োগের দ্বারা গ্যাসকে এমন এক অবস্থায় আনা সম্ভব—যে অবস্থায় গ্যাসের মধ্যে থাকবে কেবলমাত্র মুক্ত ইলেকট্রন কণিকা এবং ধনাত্মক আধান বিশিষ্ট কনিকা। এই অবস্থারই নাম দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা

"পদার্থের চতুর্থ অবস্থা" বা "প্লাজমা"।

প্লাজমার দুটি স্তর। কোন গ্যাসের সমূহ পরমাণু যদি বিয়োজিত হয়ে ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আধানে বিভক্ত হয়ে পড়ে তখন বলা হয় "সম্পূর্ণ আয়নিত প্লাজমা"। আর বিয়োজন সম্পূর্ণ না হয়ে যদি কিছু কিছু তড়িৎ নিরপেক্ষ পরমাণু থেকে যায় তাহলে তাকে বলা হয় আংশিক আয়নিত প্লাজমা। প্রকৃতপক্ষে বিয়োজন সম্পূর্ণ হলেই আসে গ্যাসের প্লাজমা অবস্থা। এই অবস্থায় সমূহ ধনাত্মক আধান ও ঋণাত্মক আধান পৃথক পৃথকভাবে গ্যাসের মধ্যে অবস্থান করলেও পরীক্ষা করলে দেখা যাবে গ্যাসটি তড়িৎ নিরপেক্ষ।

গ্যাসের মধ্যে এই ধরনের বিপর্যয় ঘটাতে গেলে প্রচুর তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখেছেন –২৭৩° সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রায় অণু পরমাণুর মধ্যে কোন গতিবিধি থাকে না। অবশ্য একথাও ঠিক যে – "২৭৩°" সেণ্টিগ্রেড পর্যন্ত কোন গ্যাস তার স্বকীয়তা বজায় রাখতে পারে না, বহু পূর্বেই তরলে পরিণত হয়। সে যাই হোক না কেন তাপমাত্রা বাড়ানর সঙ্গে সঙ্গে কঠিন, তরল বা বায়বীয় সব রকমের অণু পরমাণুর গতি বেড়ে যায় এবং পরস্পরের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে তাদের পরমাণুর বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে বায়ুকে প্লাজমা অবস্থায় আনতে হলে প্রায় দশ হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডেরও বেশি তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। কোন কোন গ্যাসের ক্ষেত্রে উক্ত তাপমাত্রার দ্বিগুণ তাপমাত্রারও প্রয়োজন হয়ে পড়ে। কোন গ্যাস বা বায়ু প্লাজমা অবস্থায় এলে তার মধ্যে বিদ্যুৎ ও তাপ পরিবহন ক্ষমতা বেড়ে যায় এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা সহজেই প্রভাবান্বিত করা যায়। এই গুণগুলির জন্যই বর্তমান কালে প্লাজমার প্রয়োজন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই বিজ্ঞানীরা কৃত্রিমভাবে প্লাজমা তৈরি করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে উর্ধ্বের স্তর—যেটিকে আয়নমণ্ডল বলা হয় সেখানকার বিরল বায়ুকণা আয়নিত হয়ে প্লাজমা অবস্থায় আছে বলে বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস। ঐ কারণে সুবিধাও কিছু হয়েছে মানুষের। আমরা পৃথিবী থেকে যে সব বেতারতরঙ্গ আদান প্রদান করি, সেগুলির প্রতিফলন ঘটাতে ঐ আয়নিত প্লাজমার স্তরগুলি যথেষ্ট সাহায্য করে। বর্তমানে কিছু কিছু অসুবিধাও হচ্ছে। পৃথিবী থেকে যে-সব মহাকাশযানগুলি উৎক্ষেপণ করা হচ্ছে, সেগুলি পৃথিবীর বুকে যখন ফিরে আসে তখন তাকে আয়নমণ্ডল অতিক্রম করে ফিরে আসতে হয় বলে তাদের গায়ে জমা হয়ে যায় একটা প্লাজমার স্তর। তারজন্য মহাকাশযানের সঙ্গে সংবাদ আদান প্রদান করতে যে বেতার তরঙ্গ ব্যবহার করা হয় সেটি প্লাজমার স্তরে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বিঘ্নিত হয়। এখন অবশ্য বিজ্ঞানীরা বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করে উক্ত বাধাকে দূর করতে অনেকটা সক্ষম হয়েছেন।

বিজ্ঞানীরা বড় আশাবাদী। তাঁরা প্লাজমার মধ্যে এমন একটি গুণের সন্ধান লাভ করেছেন যা থেকে মনে করছেন, মহাকাশে পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে ঐ প্লাজমাই গ্রহণ করবে মুখ্য ভূমিকা। বিশেষত মহাকাশযানকে ঠিকপথে চালিত করা যাবে ঐ প্লাজমার সাহায্যেই।

এখন প্লাজমাকে কিছু কিছু কাজে নিয়োগও করা হয়েছে। বিশেষ করে পারমাণবিক চুল্লিতে এবং শল্য চিকিৎসার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন ধীরে ধীরে বেড়ে চলেছে। তবে এখনও পর্যন্ত প্লাজমার তাত্ত্বিক দিক ছাড়া প্রয়োগের দিকটা তত বেশি বিস্তারিত নয়। প্লাজমা সম্পর্কে বহু তথ্য এখনও অজ্ঞাত। তবুও এর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রায় সব দেশের বিজ্ঞানীই গবেষণায় লিপ্ত।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তাত্ত্বিক দিক থেকে বিজ্ঞানীরা প্লাজমাকে পদার্থের শেষ অবস্থা বলে মনে করছেন না। তাঁদের মতে পদার্থের পঞ্চম অবস্থা থাকা সম্ভব এবং সেই অবস্থাই হবে পদার্থের শেষ অবস্থা।

এখন প্রশ্ন, পদার্থের ঐ শেষ অবস্থাটা কেমন হবে?

বিজ্ঞানীরা বলতে চান, প্লাজমার পরবর্তী স্তর বা পদার্থের সর্বশেষ স্তর আসবে তখনই, যখন গ্যাসীয় পরমাণু থেকে কেবলমাত্র ইলেকট্রনগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথকভাবে অবস্থান করবে না—কেন্দ্রক থেকে প্রোটন ও নিউট্রনরাও বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্যাসের মধ্যে অবস্থান করবে। তখন সেই গ্যাসকেও প্লাজমা অবস্থার মত তড়িৎ নিরপেক্ষ মনে হবে।

বিজ্ঞানীদের উক্ত তত্ত্বে এখনও সংশয় আছে যথেষ্ট। পরমাণুর কেন্দ্রকের বাহিরে ইলেকট্রনরা আলতোভাবে অবস্থান ও পরিভ্রমণরত আছে বলে তাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব। তাও আবার প্রয়োজন হয় হাজার হাজার ডিগ্রী তাপমাত্রার। কিন্তু কেন্দ্রকের মধ্যে প্রোটন এবং নিউট্রনরা প্রচণ্ড শক্তিতে পরস্পর দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ থাকে। তাদের বিচ্ছিন্ন করা বড্ড দুরূহ ব্যাপার। কারণ, বিজ্ঞানীদের মতে পদার্থকে সর্বশেষ অবস্থায় আনতে হলে কয়েক হাজার কোটি ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেড তাপমাত্রার প্রয়োজন হবে।

এই প্রচণ্ড তাপমাত্রা কী সৃষ্টি করা সম্ভব? এমন যে তাপমাত্রা যা আংশিক প্রয়োগ করলে পৃথিবীর সব কিছুই বাষ্প হয়ে মিশে যাবে মহাশূন্যে। তাই বিজ্ঞানীদের তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তটা খুব বেশিদূর অগ্রসর হতে পারেনি। বিজ্ঞানীদের এই সিদ্ধান্তটি যদি সত্য বলে ধরা হয় তাহলে বলতে হবে বিশ্বসৃষ্টির আদিতে মহাবিশ্বের এক কোণে যে ঘন পুঞ্জীভূত মেঘের সৃষ্টি হয়েছিল সেই মেঘটি ছিল বস্তুর শেষ অবস্থার স্তরে।

✪ সৌরশক্তি ✪

সূর্যরশ্মির ভয়ঙ্কর শক্তির কথা বোধহয় প্রথমে মহাত্মা আর্কিমিদিসই টের পেয়েছিলেন। কারণ, তাঁর সম্বন্ধে একটি কিংবদন্তী আছে। কিংবদন্তীটি নিম্নরূপ—

আর্কিমিদিস ছিলেন সাইরাকিউসের রাজার বন্ধু। একবার রোমানরা বিশাল এক নৌবহর সজ্জিত করে এগিয়ে এসেছিল সাইরাকিউস আক্রমণ করতে।

তাদের প্রতিহত করার সাধ্য সাইরাকিউসের রাজার ছিল না। তাই ডেকে পাঠিয়েছিলেন বিজ্ঞানী বন্ধু আর্কিমিদিসকে। জানিয়েছিলেন রাজ্যের আসন্ন বিপদের কথা।

আর্কিমিদিস অনেক চিন্তা করে কয়েকটি ষড়ভুজাকৃতি দর্পন তৈরি করেছিলেন। যখন রোমান রণতরীগুলি এগিয়ে এসে নোঙর করলো তখন আর্কিমিদিস দর্পন-গুলি হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। নিদাঘের নির্মেঘ মধ্যাহ্ন আকাশে তখন দ্বাদশ সূর্যের দীপ্তি। আর্কিমিদিস দর্পনের সাহায্যে সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে প্রতিফলিত করলেন রণতরীগুলির পালের উপর। অকস্মাৎ দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো পাল। বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল রোমান বাহিনী। অধিকাংশ রণতরী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়ে নিমজ্জিত হলো সাগরে।

কাহিনীটি ২১৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের। ঘটনাটি যদি সত্য হয় তাহলে বুঝতে হবে আর্কিমিদিসই প্রথম সৌরশক্তিকে মানুষের কাজে নিয়োগ করেছিলেন। যদিও কাজটি ছিল ধ্বংসাত্মক।

আর্কিমিদিসের অনেক পরে ৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রোকাস নামে কনস্টাণ্টিনোপলের এক বিজ্ঞানীও উপরোক্ত পদ্ধতিতে বিদেশী রণতরীগুলিকে ধ্বংস করেছিলেন। তবে সূর্যরশ্মি থেকে অগ্নিউৎপাদন পদ্ধতি বেশ পুরাতন। কথিত আছে, এথেন্সবাসীরা তাঁদের আরাধ্যাদেবী ভেস্টার পূজার জন্য পবিত্র অগ্নিশিখার সৃষ্টি করতেন মসৃণ সোনার পাতে সূর্যরশ্মিকে কেন্দ্রীভূত করে। তবে এসব অতি পুরাতন দিনের কথা।

বর্তমানকালে সূর্যরশ্মিকে নানাভাবে কাজে লাগানর প্রচেষ্টা চলেছে। বিজ্ঞানীরা দেখেছেন, অদূর ভবিষ্যতে সূর্যরশ্মিকে সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করার পদ্ধতি আবিষ্কৃত না হলে সভ্যতার অগ্রগতি বজায় থাকবে না। তাঁরা চিন্তিতও হয়ে উঠেছেন। কারণ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শক্তির একটা বিরাট অংশ আসছে কয়লা ও পেট্রোলিয়াম থেকে। অপরদিকে মানুষের শিল্পের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই ভূগর্ভ থেকে যে হারে কয়লা এবং পেট্রোলিয়াম উত্তোলিত হচ্ছে তাতে আগামী কয়েক দশকের পরেই পৃথিবীর বুকে সঞ্চিত ওদের ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত হয়ে যাবে।

তেল এবং কয়লার বিকল্প হিসাবে পরমাণুশক্তিকে মানুষ এখন ব্যবহার করছে। পরমাণুশক্তির উৎস হচ্ছে ইউরেনিয়াম নামক তেজষ্ক্রিয় ধাতুটি। কিন্তু ইউরেনিয়ামের ভাণ্ডারও অফুরন্ত নয়। ব্যবহার করতে করতে মানুষ ওকেও শেষ করে ফেলবে। তাহলে ভবিষ্যতে মানুষ কি করবে? মানব সভ্যতার জয়যাত্রা কি সম্পূর্ণরূপে প্রতিহত হয়ে যাবে?

বিজ্ঞানীরা মনে করেন, মানবসভ্যতার অগ্রগতিকে রোধ করে এমন সাধ্য কার? কয়লা, পেট্রোলিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজষ্ক্রিয় ধাতুর ভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে যেতে পারে কিন্তু সূর্য আকাশ থেকে যাবে কোথায়। তার যে অফুরন্ত শক্তি, কণামাত্র ব্যবহার করার উপায় উদ্ভাবন করতে পারলেই ভবিষ্যতে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তাঁরা হিসেব করে জানিয়েছেন, প্রতি ১০০

ফুট জায়গায় যেটুকু সৌরশক্তি এসে পড়ে তার পরিমাণ একলক্ষ কিলো ক্যালরি। [ক্যালরি তাপশক্তির একক। এককিলো ক্যালরি=এক হাজার ক্যালরি।] শীতপ্রধান দেশ অপেক্ষা গ্রীষ্মপ্রধান দেশে এই শক্তির পরিমাণ আরও বেশী। যদি স্বল্প ব্যয়ে সৌরশক্তিকে সংগ্রহ করা যায় তাহলে কয়লা, খনিজ তৈল, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজষ্ক্রিয় ধাতু প্রভৃতি পৃথিবী থেকে নিঃশেষ হয়ে গেলেও কোন অসুবিধা হবে না।

বিগত অর্ধশতাব্দী ধরে বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করে এসেছেন। ইতিমধ্যে কতকগুলি পদ্ধতিও তাঁদের কৃপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সেই পদ্ধতি-গুলির কয়েকটি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো।

(১) বাসগৃহকে শীতের দিনে গরম রাখার পদ্ধতি।

অনেকগুলি পদ্ধতির মধ্যে সবচেয়ে সহজতম এবং ব্যয়বহুল নয় এমন পদ্ধতি হলো, সৌরশক্তিকে সঞ্চয় করার জন্য সোডিয়াম সালফেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড প্রভৃতির টুকরাকে অ্যালুমিনিয়ামের তৈরী একটি পাত্রে আবদ্ধ রাখা হয়। পাত্রটিকে বলা হয় "সৌরশক্তির সংগ্রাহক"। পাত্রটির মুখে ঢাকা থাকে স্বচ্ছ কাচের পাত এবং অভ্যন্তরে থাকে কয়েক সারি কালো কাচের পাত। কালো পদার্থ তাপ শোষণ করার কাজে বিশেষ উপযোগী বলেই সংগ্রাহকে কালো কাচের পাত ব্যবহার করা হয়। সূর্যরশ্মি সংগ্রাহকের মুখের ঢাকনার ভেতর দিয়ে কাচের পাতের উপর পড়লেই উত্তপ্ত হয়। পাত্রের মধ্যে নালীপথ থাকে। বাসগৃহের শীতল বায়ু সেই নালীপথে প্রবেশ করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তারপর সেই উত্তপ্তবায়ুকে বাসগৃহের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে পরিচালনা করার ব্যবস্থা থাকে। এইভাবে ক্রমাগত পরিচালনা করা এবং সংগ্রাহক প্রকোষ্ঠে পুনরায় প্রেরণ করার ফলে বাসগৃহ উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।

(২) রান্নার কাজে সৌর উনান।

একটি বিশেষ ধরনের তাপঅন্তরক ও বায়ুনিরোধক বাক্সের মুখ স্বচ্ছ কাচের ঢাকনা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। বাক্সের ভেতরের দেওয়ালে থাকে গাঢ় কালো প্রলেপ। অনেক সময় অবতল দর্পনের সাহায্যে সূর্যকিরণকে কেন্দ্রীভূত করে বাক্সের উপর ফেলা হয়।

সুখের কথা, এই যন্ত্রটি আবিষ্কার করেছে ভারতবর্ষের "ন্যাশন্যাল ফিজিক্যাল ল্যাবরেটরি"। ঐ একই পদ্ধতিতে ইসরায়েল তৈরি করেছে সৌর জলাশয়। তাঁরা সূর্যরশ্মিকে সৌর জলাশয়ে সঞ্চিত করে তাকে রূপান্তরিত করছেন বাষ্পীয় শক্তিতে এবং বৈদ্যুতিক শক্তিতে।

(৩) সূর্যরশ্মিকে উত্তল লেন্সের দ্বারা কেন্দ্রীভূত করে অতি অল্প জায়গায় প্রায় তিন হাজার ডিগ্রী সেণ্টিগ্রেডের মত তাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং তাতে এই উপায়েই তাপ উৎপন্ন করার ব্যবস্থা থাকে।

(৪) আমরা জানি, তাপশক্তি থেকে সরাসরিভাবে বিদ্যুৎশক্তি উৎপন্ন করা যায়। দুটি ভিন্ন ধাতুর তারের দুটি প্রান্ত জোড়া লাগিয়ে সেই জোড়া দেওয়া স্থানটিকে বিভিন্ন উষ্ণতায় গরম করলে তারের প্রান্তদ্বয়ে তড়িচ্চালক বলের

তারতম্য ঘটে বলে একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত তড়িৎপ্রবাহ পরিচালিত হয়। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন তড়িৎকে বলা হয় থার্মোইলেকট্রিসিটি। থার্মোইলেকট্রিসিটির জন্য ধাতব তারগুলির প্রান্তদ্বয়কে সূর্যরশ্মির দ্বারা গরম করার পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে।

(৫) সূর্যরশ্মিকে কাজে লাগিয়ে এক রকমের বিদ্যুৎকোষও তৈরী করা হচ্ছে। এই জাতীয় কোষের নাম "ফটোগ্যালভানিক সেল"।

(৬) সৌরশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমুদ্রের লবণাক্ত জলকে পাতিত করার প্রচেষ্টা সবদেশেই সুরু হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরাই এ বিষয়ে অগ্রণী। বেশ কিছুদূর তাঁরা এগিয়েও গেছেন। পদ্ধতিটি কার্যকর হলে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা খুব সহজ হবে।

(৭) বয়লারের জলকে বাষ্পীভূত করে সেই বাষ্পশক্তিকে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন কলকারখানায়। জলকে বাষ্পীভূত করতে তাই প্রয়োজন হয় প্রচুর জ্বালানী। বিশেষত কয়লাকেই জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়। এই জ্বালানীর সমস্যা সমাধানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিজ্ঞানীরা এক ধরনের সৌরযন্ত্রের আবিষ্কার করেছেন। ঐ যন্ত্রটির দ্বারা সূর্যরশ্মির সাহায্যে তাঁরা বয়লারের জলকে বাষ্পীভূত করছেন। এক বিশেষ ধরনের বড় দর্পন ছাড়া এই যন্ত্রের অন্য কোন উল্লেখযোগ্য অংশ নেই। আমাদের দেশে এই ব্যবস্থা অবলম্বন করলে প্রচুর কয়লার সাশ্রয় হতো।

(৮) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মানুষের প্রয়োজনীয় প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় খাদ্য উৎপাদনের নিমিত্ত এখন সৌরশক্তির সাহায্য গ্রহণ করছে। এই উদ্দেশ্যে তারা চাষ করছে ক্লোরেলা নামক এক জাতীয় শ্যাওলা। ওদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ওরা তাড়াতাড়ি বংশ বিস্তার করে এবং অপরাপর উদ্ভিদের তুলনায় বাড়েও দ্রুত। ক্লোরেলার আর একটি বৈশিষ্ট্য, ওরা প্রোটিন ও স্নেহজাতীয় পদার্থে ভয়ানক সমৃদ্ধ। খাদ্য হিসাবে ক্লোরেলা তাই অত্যন্ত মূল্যবান।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বড় বড় জলাভূমিতে সৌরশক্তির সঞ্চয়ন করে ক্লোরেলার চাষ করছে। খাদ্যসমস্যা সমাধানে এটি একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ।

সৌরশক্তিকে কাজে লাগাবার আরও বহু পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছে। পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ এই উদ্দেশ্যে আজ গবেষণারত। বিজ্ঞানীদের গবেষণার ফলে হয়ত একবিংশ শতাব্দীতেই সৌরশক্তি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হবে। সেদিন মানুষ কয়লা ও পেট্রোলিয়ামের দিকে বড় একটা নজর দেবে না। বর্তমানে অনেক পদ্ধতিই আবিষ্কৃত হয়েছে। কিন্তু ব্যয়বাহুল্যের জন্য জনপ্রিয় হচ্ছেনা। অল্প ব্যয়ে যেদিন মানুষ সৌরশক্তিকে উৎপন্ন করতে সমর্থ হবে সেদিন অবশ্যই পৃথিবীর বুকে এক নতুন যুগের সূচনা হবে। ভারতের বহু গবেষণাগারেই এই নিয়ে গবেষণা হচ্ছে। যদিও মার্কিন বিজ্ঞানীরা এবিষয়ে অনেকখানি এগিয়ে গেছেন।

বিজ্ঞানীদের প্রচেষ্টায় চন্দ্রপৃষ্ঠে যাতায়াতের সুবিধা এবং সেখানে উপনিবেশ গড়ে তোলা সম্ভব হলে এ কাজটা আরও সহজ হবে। হয়ত একদিন দেখা যাবে পৃথিবীর থার্মাল ইলেক্ট্রিসিটির প্রধান ঘাঁটি চন্দ্র। সেখান থেকে পৃথিবীর

সর্বত্রই সরবরাহ করা হচ্ছে বিদ্যুৎ। লোডসেডিং আর হচ্ছে না। কবে আসবে সেই দিন? আজকের দিনে তরুণ যারা—তারাই প্রশ্নটির উত্তর দিও।

✪ সূর্যের দশম ও একাদশ গ্রহ ✪

বোড ও টিসিয়াস নামে দুজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী সূর্য থেকে প্রতিটি গ্রহের দূরত্ব কত হবে—সে সম্বন্ধে একটি সূত্র একসময় খাড়া করেছিলেন। তাঁরা দেখিয়েছিলেন, সূর্য থেকে গ্রহদের অবস্থানের একটা নির্দিষ্ট অনুপাত আছে। ওঁদের তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই একদিন আবিষ্কার করা হয়েছিল গ্রহাণুদের এবং শনির পরেও যে গ্রহ আছে, এ সম্বন্ধেও প্রথম একটা ধারণা হয়েছিল।

সে ধারণা একদিন সত্য বলে প্রমাণিত হলো—যখন, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোকে আবিষ্কার করা গেল। অবশ্য এগুলি আবিষ্কারের পেছনে কেবল বোড ও টিসিয়াস সূত্র নয়, নবাবিষ্কৃত গ্রহদের গতিবিধির বৈষম্য দেখেও বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন ইউরেনাসের পরে ও নেপচুনের পরেও গ্রহ আছে। পরিশেষে প্লুটো আবিষ্কার হলেও তাঁরা লক্ষ্য করেন, এখানেও গতিবিধির সঙ্গে গরমিল। যদিও প্রথম প্রথম কেউ উপলব্ধি করতে পারেননি এবং ধরে নিয়েছিলেন প্লুটোই হচ্ছে সৌরজগতের শেষ গ্রহ।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর গতিপথ লক্ষ্য করতে করতে কয়েক বছর পরে যেন কিছুটা অসঙ্গতি লক্ষ্য করেন এবং আরও কিছুকাল পরে তাঁদের সন্দেহ বদ্ধমূল হয় যে, সৌরজগতের শেষ সীমায় আরও গ্রহ আছে। তার অভিকর্ষ প্রভাবিত করছে নেপচুন-প্লুটোদের। তা নাহলে গতিবিধির মধ্যে অসঙ্গতি আসবে কেন? ফলে ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে কালিফোর্নিয়ার লিভারমোর গবেষণাগার থেকে প্রথম ঘোষণা করা হলো, সূর্যের দশম গ্রহ আছে। যোসেফ ব্রাডি নামে জনৈক গণিতজ্ঞ ও জ্যোতির্বিদ গবেষকদের সমর্থন করলেন এবং দশম গ্রহটির আয়তন, কক্ষপথ, সূর্য-প্রদক্ষিণের কাল ইত্যাদি সম্বন্ধে একটা আভাস প্রদান করলেন। অজানা ও অদেখা এই গ্রহটির নাম সেদিন "X", ভলকান ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়েছিল। আর অত্যধিক দূরত্বের জন্য অতি নিষ্প্রভ এই গ্রহকে পৃথিবী থেকে কোন শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি।

সম্প্রতি মানুষের উন্নত মহাকাশ-গবেষণা সূর্যের এই সুদূরতম গ্রহ সম্বন্ধে নতুনভাবে আলোকপাত করেছে। রাশিয়ান বিজ্ঞানীদের মতে প্লুটোর পরে দুটি গ্রহ আছে এবং সে-দুটি X_1 এবং X_2। অপরদিকে পায়োনিয়ার-১০ সৌরজগতের প্রান্তসীমা থেকে যেসব তথ্য পাঠিয়েছে, তাদের বিশ্লেষণ করে ওয়াশিংটনের নেভাল মানমন্দিরে জন এণ্ডারসন এবং ক্যানেথ সিভেলম্যান ঘোষণা করেছেন,

শেষ গ্রহ একটি এবং এর কক্ষপথ অন্য গ্রহদের কক্ষপথকে আড়াআড়িভাবে ছিন্ন করেছে। কক্ষপথও বিরাট। প্রায় হাজার বছরে সে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে আসে।

কেউ কেউ মনে করেন, দশম গ্রহটি প্রকৃত গ্রহ নয়। এটি একটি মৃত নক্ষত্র। এই মতের সমর্থকরা মনে করেন, আমাদের সূর্য-যুগল নক্ষত্র। তার আকর্ষণের আওতায় তার চেয়ে ছোট যে নক্ষত্রটি একদিন বন্দী হয়েছিল—সেটি কালক্রমে নিভে গেছে। নাম নেমেসিস।

রাশিয়ান বিজ্ঞানীদের মতামত কিন্তু উক্ত মতকে সমর্থন করছে না। অর্থাৎ তাঁদের মতে গ্রহদের সংখ্যা ১১টি, দশম গ্রহের পর আরও একটি আছে। অতএব সূর্য যে যুগল নক্ষত্র ছিল—এর সম্ভাবনা নস্যাৎ হয়ে যায়। পায়োনিয়ার-১০ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী গ্রহটি আগামী ২৬০০ সাল নাগাদ পৃথিবীর কিছুটা কাছাকাছি হবে। এই সময় ওকে দেখা গেলেও যেতে পারে। কিংবা তারও আগে অপর কোন উৎস থেকে এই বাদানুবাদের মীমাংসাও হয়ে যেতে পারে। তবে এগুলো এখনও তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তের উপরে আছে। এখনও জ্যোতির্বিজ্ঞান স্বীকার করে নেয়নি সূর্যের দশমগ্রহকে।

✪ সৌরকোষ ✪

বিকল্প শক্তির উৎস খুঁজতে যখন মানুষ পার্থিব সমূহ শক্তির মূল উৎস সূর্যের আলোককে কাজে লাগাতে যত্নবান হয়, তখনই তার মনে প্রশ্ন আসে ব্যাটারি তথা রাসায়নিক কোষ থেকে রাসায়নিক শক্তি যদি বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় এবং সেই বিদ্যুৎশক্তি আলোকশক্তিতে রূপান্তরিত হয় তাহলে সূর্যের আলোক-শক্তিকে কেন বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা যাবে না? কেননা শক্তির তো ক্ষয় হয় না, এক শক্তি থেকে আর একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।

ততদিনে তড়িৎপ্রবাহ সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের ধারণা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তাঁরা বুঝতে পেরেছেন, কোন বর্তনীতে তড়িৎপ্রবাহ তখনই চলে যখন বর্তনীর তার ও রোধের মাধ্যমে ইলেকট্রন প্রবাহ একদিক থেকে অন্যদিকে অব্যাহত থাকে। অতএব ঐ কাজটা যদি রাসায়নিক শক্তির পরিবর্তে আলোকশক্তির দ্বারা সম্পন্ন করানো যায় তাহলে অবশ্যই সফলতা আসবে।

তড়িৎপ্রবাহের নির্দিষ্ট নিয়মও আছে। পাইপ যোগে উচ্চ জলাধার থেকে নিচের জলাধারে স্থানান্তরিত করতে গেলে যেমন একটা প্রবাহ বজায় থাকে তেমনই বিভব পার্থক্য থাকলে উচ্চবিভব থেকে নিম্নবিভবের দিকে ইলেকট্রনের প্রবাহ হয়। আর তখনই উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ।

সূর্যের আলোকের সাহায্যে বিভব প্রভেদ সৃষ্টি করার ব্যাপারে বিজ্ঞানীরা দৃষ্টিনিক্ষেপ করলেন জার্মেনিয়াম, সিলিকন, সেলেনিয়াম প্রভৃতি অর্ধ-পরিবাহীর উপর। এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এদের উপর আলো পড়লে পরিবাহিতা বেড়ে

যায়। অর্থাৎ অর্ধ-পরিবাহী আলোক শোষণ করলে সেখানে ইলেকট্রনের সংখ্যা ও ঘনত্ব দুই-ই বেড়ে যায়।

শুরু হলো পরীক্ষা-নিরীক্ষা। সত্য-সত্যই দেখা গেল, অর্ধ-পরিবাহীর কোন একটি স্থানে সূর্যের আলোক ফেললে আলোকিত অংশে মুক্ত ইলেকট্রনের সংখ্যা বেড়ে যায়। এবং কম ঘনত্বযুক্ত স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়।

উপরোক্ত পদ্ধতিতে সৌরকোষ সৃষ্টি হল বটে, কিন্তু বিজ্ঞানীরা বেশী তড়িচ্চালক বলের সৃষ্টি করতে পারলেন না। মাত্র ০.২ থেকে ০.৩ ভোল্টের মত। এরপর ভাল অর্ধ-পরিবাহী খুঁজতে গিয়ে তাঁরা সিলিকনকে ব্যবহার করেন। এতে পূর্বাপেক্ষা বেশী তড়িচ্চালক বল সৃষ্টি হলো ঠিকই কিন্তু দৈনন্দিন কাজে এবং ঘরকে বৈদ্যুতিকীকরণ করতে প্রয়োজন হলো অসংখ্য সৌরকোষের সমন্বয়। এতে খরচ অনেক বেশী। ঐ কারণে, সৌরকোষ এখনও জনপ্রিয় হতে পারেনি। কেবলমাত্র কৃত্রিম উপগ্রহে এদের ব্যবহার করা হচ্ছে। এবং ভাল ফলও পাওয়া গেছে।

বিজ্ঞানীরা বসে নেই। অল্প খরচে সৌরকোষ তৈরি করার জন্য তাঁরা এখনও গবেষণা করে চলেছেন এবং অনেকটা এগিয়েও গেছেন।

দুটি স্বপ্ন—দুটি আবিষ্কার

✪ সেলাইকল ও বেনজিনের ফরমূলা ✪

সেলাই কল :—

এক ছিলেন তরুণ। নাম তাঁর ইলিয়াস হাউ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসে এক গরীবের ঘরে জন্ম তাঁর।

দারিদ্র্যের জন্য বাবা লেখাপড়া শেখাতে পারলেন না ইলিয়াসকে। একটু বড় হতে লাগিয়ে দিলেন চাষের কাজে। তাতে দুঃখ ছিল না ইলিয়াসের। ক্ষেত-খামারে কাজ করতেন, বাবাকে সাহায্য করতেন, আর অবসর সময়ে খেলনা নয়ত যন্ত্রপাতি বানাতেন। হাতটিও ছিল বেশ পাকা। যা দেখতেন, তাকেই অনুকরণ করতে পারতেন।

ইলিয়াস আরও একটু বড় হলেন। এবার বাবা কিছু রোজগারের জন্য তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন বোস্টন শহরের এক কারখানায়। শ্রমিকের কাজ, মাইনেও কম। তবু মনের মত কাজ পেয়ে খুশিই হলেন ইলিয়াস। রাতদিন যন্ত্রপাতি নাড়াচাড়া করতেন, জিজ্ঞাসু মন নিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কারখানার যন্ত্রগুলোকে দেখতেন এবং নিজ হাতে গড়তেও চেষ্টা করতেন। আর ভাবতেন, বড় হলে তিনি মস্ত বড় এক কারিগর হবেন। তখন এমন যন্ত্র বানাবেন—যা সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। অর্থও উপার্জন করবেন প্রচুর। কিন্তু কী যন্ত্র বানাবেন তিনি?

কারখানায় তাঁরই মত আরও কয়েকজন তরুণ কাজ করতো। তাদের একজনের সঙ্গে ইলিয়াসের ছিল গলায় গলায় ভাব। একদিন কথায় কথায় ইলিয়াস বন্ধুকে বললেন—বলতে পারো, এমন কী একটা যন্ত্র বানানো যাবে—যা থেকে আসবে প্রচুর টাকা! দারিদ্র্যের জ্বালা যে আর সহ্য হচ্ছে না!

বন্ধু অনেক ভেবে চিন্তে বললে—তুমি একটা সেলাই করার কল তৈরি করতে পারো। সূচ হাতে সেলাই করার ঝামেলা অনেক। সময়ও যায় বেশী, আবার সবার হাতের সেলাই সমান সুন্দরও হয় না। তেমন যদি একটা কল খাড়া করতে পারো, তাহলে অনেকেই লুফে নেবে।

বন্ধুর কথাটা মনে ধরলো ইলিয়াসের। কিন্তু একটা কল খাড়া করা তো সোজা কথা নয়! কত পরীক্ষা করতে হবে, কত সাজ-সরঞ্জাম কিনতে হবে, কত জিনিসকে নষ্ট করতে হবে, তবেই না খাড়া হবে একটা কল! এত টাকা পাওয়া যাবে কোথায়?

শেষ পর্যন্ত সেই তরুণ বন্ধুটিই তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। বাড়ীর অবস্থা তার মোটামুটি ভালই ছিল, আর হাতে টাকাও ছিল। সব টাকা ধার হিসেবে দিয়েছিল ইলিয়াসকে।

হাতে যেন স্বর্গ পেলেন ইলিয়াস। বললেন—বন্ধু, তোমার ঋণ জীবনে শোধ করতে পারবো না। তবে হ্যাঁ, যদি সেলাই কল তৈরী করতে পারি তাহলে টাকা তো শোধ করবোই, অধিকন্তু মোটা টাকা সুদ হিসেবেও দেবো।

ইলিয়াস এবার বাজার থেকে দরকারী জিনিসপত্র কিনে লেগে গেলেন কাজে। কারখানার কাজের অবসরে রাতের বেলাই কাজ করতেন। তবু একদিন খাড়া করলেন একটা কল। কিন্তু গোল বাধালে মেসিনের সূচটা। সূচের ছিদ্রটা মাথায় থাকে, সেই ছিদ্রে সূতো পরিয়ে মেসিনের সাহায্যে সেলাই করতে পারলেন না। কত ভাবনা চিন্তা করলেন, কত ভাবে কত চেষ্টা করলেন, কত নতুন নতুন সাজ-সরঞ্জাম জুড়লেন, তবু বাগ মানাতে পারলেন না সূচকে।

কতদিন কেটে গেল। সূচকে মেসিনের আওতায় আনতে না পেরে যেন দিশেহারা হয়ে উঠলেন ইলিয়াস। রাতদিন কেবল চিন্তা, চিন্তা, আর চিন্তা। এতদিনে বন্ধুটি টাকার জন্য তাগাদা দিতে শুরু করলে। জানালে—টাকা না দিলে আদালতের সাহায্য নেবে সে।

ইলিয়াসের মাথায় যেন আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। এত টাকা কেমন করে শোধ দেবেন তিনি? হায় রে হায়! যদি মেসিনে সূচটাকে বাগে আনতে পারতেন!

সেদিন রাতে এক বীভৎস স্বপ্ন দেখলেন ইলিয়াস। বন্ধু টাকার জন্য আদালতে নালিশ করায় বিচারক তাঁর প্রাণদণ্ডের আদেশ দিয়েছেন। দুজন ইয়া-যণ্ডামার্ক গোছের লোক তাঁকে হত্যার জন্য তুলছেন দুটো ঝকঝকে বর্শা। এখনই তার বুকে বিঁধিয়ে এফোঁড় ওড়োঁড় করে দেবে।

কিন্তু একি? বর্শার ফলার সূচালো অংশে—এক একটা ছিদ্র না! ছিদ্রটা

যেন জ্বল জ্বল করে উঠলো ইলিয়াসের চোখের সামনে।

আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেল ইলিয়াসের। আর তক্ষুনি তড়াক করে একটা বুদ্ধি এসে গেল তাঁর মাথায়। সূচটার ডগার দিকে ছিদ্র করলে কেমন হয়?

পরদিনই ইলিয়াস লেগে গেলেন কাজে। এবার আর বেগ পেতে হলো না তাঁকে। সেলাই কল তৈরি করে যেমন অক্ষয় কীর্তির অধিকারী হলেন, তেমনই অল্প দিনের ভেতরে প্রচুর টাকার মালিকও হলেন।

বেনজিনের ফরমূলা :—

এক ছিলেন রসায়ন বিজ্ঞানী। নাম তাঁর কেকুলে। সদ্য আবিষ্কৃত বেন্‌জিনের গঠনমূলক সঙ্কেতকে নিয়ে খুব ভাবনা চিন্তা করছিলেন।

বেন্‌জিনকে বিশ্লেষণ করে দেখলেন, ওর একটি অণুতে আছে দুটি কারবন পরমাণু এবং দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু। অর্থাৎ এর আনবিক সঙ্কেত C_6H_6। কিন্তু অণুটার গঠন সঙ্কেত কী হবে? যোজ্যতা অনুযায়ী পরমাণুগুলোকে বিন্যাস করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে গেলেন। কিছুতেই নির্দেশ করতে পারলেন না।

বিজ্ঞানের রাজ্যে তো এমনটি হতে পারে না! যেমন করে হোক, ওর গঠনগত সঙ্কেতকে নির্দেশ করতেই হবে।

ভাবনা, ভাবনা, আর ভাবনা! রাত দিন সেই একই ভাবনায় একেবারে মশগুল। রাশি রাশি কাগজ ছিঁড়লেন, মডেল তৈরি করতে চেষ্টা করলেন, ছবির পর ছবিও আঁকলেন। না কিছুতেই পারলেন না বেঞ্জিনের গঠনকে নির্দেশ করতে।

কেকুলে এবার যেন মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু উৎসাহে তাঁর ভাঁটা পড়লো না। একদিন রাতে স্বপ্ন দেখলেন, আকাশ থেকে ইয়া লম্বা একটা সাপ ছুটে আসছে তাঁরই দিকে। বুঝিবা দংশন করবে তাঁকে। কিন্তু এ কি! কিছুদূর আসার পরেই শূন্যে কুণ্ডলী পাকাতে শুরু করলো। তারপর গোলাকার একটা রিং-এর মত হয়ে ঘুরতে লাগলো বনবন করে।

আশ্চর্যের পর আবার আশ্চর্য! সাপটা এবার লেজটা মুখে পুরে দিল আর দুকোণা হয়ে ধীরে ধীরে তাঁর দিকে এগিয়ে আসতে শুরু করলো।

ঘুম ভেঙ্গে গেল কেকুলের। কিন্তু এ কী দেখলেন তিনি। সাপটা বৃত্তাকার হতে হতে দুকোণা হয়ে গেল না?

তক্ষুণি কাগজ কলম নিয়ে বসে গেলেন। আর মুহূর্তের ভেতরেই আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন তিনি। পেয়েছেন, পেয়েছেন, পেয়ে গেছেন বেঞ্জিনের গঠনগত সঙ্কেত। এটি মুক্ত শৃংখল যৌগ নয়, বৃত্তাকার।

এই একটি আবিষ্কারই কেকুলেকে রাতারাতি মহান করেছিল। রসায়ন বিজ্ঞান কোনদিন ভুলতে পারবে না তাঁকে।

এমনই আরও কত স্বপ্নের বিবরণ আছে বিজ্ঞানে। শোনা যায়, মেণ্ডেলিফ তাঁর পর্যায় সারণীর সূত্র লাভ করেছিলেন স্বপ্নের মাধ্যমে এবং জর্জ বুলি—অঙ্কশাস্ত্রে

যাঁর অবিস্মরণীয় অবদান, তিনিও স্বপ্নকে অবলম্বন করে রচনা করেছিলেন আধুনিক বীজগণিতের অত্যাশ্চর্য শাখা "বুলিয়ান অ্যালজেব্রা"।

✪ বেরিবেরি রোগের প্রতিষেধক ✪

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। চীন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধ চলছে ভয়ানক ভাবে। নতুন শক্তিতে বলবান জাপানের কাছে কিছুতেই এঁটে উঠতে পারছে না চীন। বিশেষ করে নৌ-যুদ্ধে। তবু সাধ্যমত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে চীন। সামনাসামনি যুদ্ধকে পরিহার করে অতর্কিতে আক্রমণ চালাচ্ছে। যখনই কোন একক জাপানী যুদ্ধ জাহাজকে দেখতে পায় তখনই সর্বশক্তি নিয়োগ করে জাহাজটাকে ধ্বংস করার জন্য। জাপানীরাও কম সাবধানী নয়। তারাও দিচ্ছে যোগ্য প্রত্যুত্তর।

একদিন একটি জাপানী যুদ্ধ জাহাজের গোলন্দাজ বাহিনীর অধ্যক্ষ চোখে দূরবীন লাগিয়ে দেখলেন, দূরে-অনেকদূরে একটা চীনা যুদ্ধ জাহাজ তাঁদের জাহাজটাকে যেন অতি সন্তর্পণে অনুসরণ করছে। অধ্যক্ষ কর্তব্য স্থির করে ফেললেন। গোলন্দাজদের কামানের কাছে প্রস্তুত থাকার জন্য নির্দেশ দিলেন এবং নিজে দূরবীনের সাহায্যে শত্রু জাহাজের গতিবিধি লক্ষ্য করতে লাগলেন।

যা ভেবেছিলেন, ঠিক তাই-ই হলো। চীনা যুদ্ধ জাহাজটা যেন আক্রোশে ফুলতে ফুলতে এগিয়ে এলো তাঁদের দিকে। যখন দূরপাল্লার কামানগুলোর প্রায় আওতার মধ্যে জাহাজটা এসে গেল, তখনই অধ্যক্ষ আদেশ দিলেন কামান থেকে গোলা নিক্ষেপের জন্য।

উত্তেজনায় যেন কাঁপছেন অধ্যক্ষ। এক মিনিট—দু মিনিট অতিক্রান্ত হয়ে গেল, তবুও তাঁদের কামান গর্জে উঠলো না। ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন অধ্যক্ষ। তাঁর আদেশের অমান্য! রাগে গর গর করতে করতে ছুটে গেলেন কামানের কাছে। বজ্রকঠোর স্বরে আদেশ দিলেন—চালাও কামান।

কিন্তু এ কী! গোলন্দাজরা কাঁপছে থর থর করে। কিছুতেই কামান দাগতে পারছে না।

অধ্যক্ষ ভাবলেন, ওরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। বিশ্বাসঘাতকদের নিয়ে যুদ্ধ জয় সম্ভব নয়। তাই জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জাহাজ ফেরাবার নির্দেশ দিলেন এবং চীনাদের চোখকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে যেতে বললেন। তারপর বিশ্বাস-ঘাতকদের চরম শাস্তি দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন। নিজ হাতে গুলি করে হত্যা করবেন গোলন্দাজদের সবাইকে।

জাহাজ নিরাপদ দূরত্বে এসে যাওয়ার পর অধ্যক্ষ দাঁড়ালেন গোলন্দাজ বাহিনীর সামনে। কঠোর স্বরে বললেন—বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি কী-তা তোমরা

অবশ্যই জানো। তবু আত্মপক্ষ সমর্থনের একবার মাত্র সুযোগ দিচ্ছি। বল, কেন তোমরা দেশের সর্বনাশ করতে যাচ্ছিলে?

তখনও গোলন্দাজরা থর থর করে কাঁপছিল। একটা কথাও উচ্চারণ করতে পারলোনা।

অধ্যক্ষ আরও রেগে উঠলেন। বললেন—বুঝেছি, তোমরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে যাচ্ছিলে। না, বিশ্বাসঘাতকতার কোন ক্ষমা নেই। নাও, প্রস্তুত হও। একে একে সবাইকে গুলি করবো।

গোলন্দাজ বাহিনীর সবাই করুন চোখে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলো তাঁর দিকে। ঠোঁটগুলো নড়লো কিন্তু কথা বলতে পারলো না। কাঁপা হাত আরও কাঁপতে শুরু করলো কিন্তু উপরে তুলতে পারলো না। পাগুলোও যেন নিথর-নিষ্পন্দ।

কী ভেবে অধ্যক্ষ ডেকে পাঠালেন জাহাজের চিকিৎসককে। বললেন—আপনি পরীক্ষা করে দেখুন, ওরা কোন রোগগ্রস্ত কিনা! চরম শাস্তিদানের পূর্বে ওদের বিশ্বাসঘাতকতা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হতে চাই। না, দেরি করবেন না।

বয়স্ক ও অভিজ্ঞ ডাক্তার। একে একে সবাইকে পরীক্ষা করলেন। তারপর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—না, বিশ্বাসঘাতক ওরা নয়। সহসা এক ভয়ঙ্কর রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে সবাই!

অধ্যক্ষ ভ্রূযুগল কুঞ্চিত করে গাঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন—রোগটা কী ধরতে পেরেছেন? কী সেই রোগ!

ডাক্তার বললেন—বেরিবেরি। এ রোগটার কোন ওষুধ আজও আবিষ্কৃত হয়নি। ওরা এইভাবে পঙ্গু হয়ে থাকবে এবং তিলেতিলে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাবে।

অধ্যক্ষ কী যেন ভাবলেন মনে মনে। বললেন—পারবেন ওদের রোগমুক্ত করতে! খরচের জন্য চিন্তা করবেন না। দেশ তার মুক্তি যোদ্ধাদের জন্য সব রকমের ত্যাগ স্বীকার করবে।

ডাক্তার কিছুক্ষণ মৌন থাকার পর বললেন—আমি চেষ্টা করবো। তবে এই মুহূর্তে ওদের দেশের হাসপাতালে আমার তত্ত্বাবধানে রাখতে হবে।

দ্বিরুক্তি করলেন না অধ্যক্ষ। ডাক্তারের সঙ্গে ওদের পাঠিয়ে দিলেন। ডাক্তারও শুরু করলেন চিকিৎসা এবং ভাল ভাল পুষ্টিকর খাবার খেতে দিলেন।

বেরি বেরি রোগ থেকে একদিন মুক্তিলাভ করলো সবাই। সেই সঙ্গে ডাক্তারের নাম ও ছড়িয়ে পড়লো।

ডাক্তারের নাম টাকাকি। ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে তিনিই প্রথম যুদ্ধ জাহাজে অসুস্থ গোলন্দাজ বাহিনীর উপর পরীক্ষা চালিয়ে প্রমাণ করেন, একমাত্র পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবেই বেরিবেরি রোগটি হয়ে থাকে। আক্রান্তদের যদি ভাল ভাল খাবার খাওয়ানো যায় তাহলে রোগমুক্তি ঘটবে।

টাকাকি কিন্তু রোগের প্রকৃত কারণ এবং প্রতিষেধক কোন ওষুধ আবিষ্কার করতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর সেই গবেষণা অনেককে অনুপ্রাণিত করেছিল।

যার জন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যে মারাত্মক বেরি বেরির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রথমে বিজ্ঞানী আইখম্যানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় টাকিকি উদ্ভাবিত সত্য। তারপর বিংশশতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভে বহুজনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন বেরিবেরির প্রতিষেধক আবিষ্কারে। তাঁদের মধ্যে গ্রীনস্, ফ্লেচার, হপকিন্স, ম্যাক্কলম প্রভৃতি বিজ্ঞানীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের আবিষ্কারকে ভিত্তি করে ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে বিজ্ঞানী ফ্রাঙ্ক প্রমাণ করেন, খাদ্যে ক্রমাগত ভিটামিন বি, বা থিয়ামিনের ঘাটতি ঘটলে বেরিবেরি রোগটি হয়ে থাকে। ঐ রোগে আক্রান্ত হলে মানুষ শারীরিক ও মানসিক উভয় কর্মক্ষমতা হারায়। থিয়ামিন পর্যাপ্ত পরিমানে থাকে আলু, ধান, গম প্রভৃতির খোসার তলায় অতি সূক্ষ্ম এক আস্তরণরূপে। ঢেঁকি ছাঁটা চাল, যাঁতায় ভাঙা গম, খোসাসমেত সেদ্ধ আলুকে খোসা ছাড়িয়ে খেলে রোগটির সম্ভাবনা আদৌ থাকে না। এটি বেশ দুষ্প্রাপ্য ভিটামিন।

বর্তমানে অবশ্য থিয়ামিনকে কৃত্রিমভাবে প্রস্তুত করতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

✪ ইনজেকশনের সিরিঞ্জ ও সূচ ✪

আজকাল চিকিৎসকরা হামেশাই ইনজেকশনের ব্যবস্থাপত্র দিয়ে থাকেন। যে কোন কঠিন রোগে ইনজেকশন না হলে চলেই না। সরঞ্জামটাও ভারি সুন্দর। কাচের ফাঁপা নল, মাথায় সূচ পরানোর ব্যবস্থা, তলায় কাচের পিস্টন। সূচটা আবার ফাঁপা ও সরু এবং সূক্ষ্ম অগ্রভাগ বিশিষ্ট। কিন্তু এমন একদিন ছিল—যেদিন ইনজেকশনের আদৌ প্রচলন ছিল না। শুধু ওষুধই খাওয়ানো হতো রোগীকে।

ইনজেকশন দেওয়ার প্রথম প্রচলন শুরু করেন এক দরদী চিকিৎসক এবং ইনজেকশন দেওয়ার সরঞ্জামও তাঁরই আবিষ্কার। যদিও তাঁর উদ্ভাবিত ইনজেকশন প্রণালী ও সাজ সরঞ্জাম আজকের মত এত সুন্দর ছিল না। ভোঁতা ভোঁতা লোহার সূচ ছিল এবং সিরিঞ্জটাও ছিল লোহার। যেমন অমসৃন তেমনই বিদঘুটে। সে যন্ত্রে ইনজেকশন গ্রহণ করতে রোগীদের দস্তুর মত কষ্ট হতো। তবে এও মনে রাখতে হবে যে, আবিষ্কারের প্রথম লগ্নে কোন কিছুই তার নিজস্ব উন্নত রূপটা পায় না। দিনের পর দিন বহুজনের চিন্তাভাবনায়, চেষ্টা ও অধ্যবসায়ে উন্নত রূপ গ্রহণ করে থাকে। তবু সেই ভোঁতা যন্ত্র যিনি বুদ্ধি খাটিয়ে উদ্ভাবন করে থাকেন তিনিই প্রকৃত আবিষ্কারক। তাই চিকিৎসা ক্ষেত্রে নতুন সরঞ্জাম আমদানি করবার জন্য ডাক্তারটি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

এই ডাক্তারটির নাম চার্লস গাব্রিয়েল। তাঁর ইনজেকশন দেওয়ার পদ্ধতি আবিষ্কারের মূলে ছোট্ট একটা কাহিনী আছে। সে সময়ে ফ্রান্সের সিংহাসনে দিগ্‌বিজয়ী বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। নেপোলিয়নের যুদ্ধের নেশা যেমন প্রবল ছিল, তেমনই তাঁর একটা মহৎ গুণও ছিল। গুণীজনকে বিশেষ সমাদর করতেন এবং রাজ্যের মহান ব্যক্তিদের সব সময় সম্মান করতেন। এক সময় এক তরুণ প্রতিভাধরকে দেখে তিনি মুগ্ধ হন এবং তাঁকে নিয়োগ করেন সেনাবাহিনীর এক অফিসার রূপে। এই তরুণটিই চার্লস গাব্রিয়েল।

গাব্রিয়েল যুদ্ধকে পছন্দ করতেন না। তবু রাজশক্তির চাপে তাঁকে বাধ্য হয়ে এ কাজে যেতে হয়েছিল। যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎস দৃশ্য দেখে তিনি প্রচণ্ড ব্যথা অনুভব করেন। বিশেষ করে অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত সৈনিকদের আর্ত চিৎকার তাঁকে ভাবিয়ে তুলতো। সেই সময় তাঁর মনে হয়েছিল, সৈনিকদের ক্ষতস্থান থেকে ফিনকি দিয়ে বেড়িয়ে আসা রক্তকে যদি সহসা বন্ধ করার উপায় থাকতো তাহলে অনেক সৈনিক বেঁচে উঠতে পারতো।

একদিন নেপোলিয়নের পতন ঘটলো, যুদ্ধও বন্ধ হলো। গাব্রিয়েল ঘরে ফিরলেন কিন্তু ভুলতে পারলেন না যুদ্ধক্ষেত্রের ভয়াবহ দৃশ্যের কথা। তিনি ধরে নিয়েছিলেন, ক্ষমতার দম্ভ চিরকাল অব্যাহত থাকবে এবং অব্যাহত থাকবে যুদ্ধ জিনিসটা। তাই হতভাগ্য সৈনিকদের জন্য কিছু করা যায় কিনা—এ-বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য তিনি ডাক্তারী পড়তে শুরু করলেন।

চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন শেষে গাব্রিয়েল এবার মন দিলেন গবেষণায়। গবেষণার বিষয় ছিল ক্ষতস্থান থেকে নির্গত রক্তকে বন্ধ করা—যা তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

দীর্ঘকাল অক্লান্ত পরিশ্রমের পর গাব্রিয়েল আবিষ্কার করলেন ওষুধ। তাঁর ধারণা হলো, এই ওষুধকে শিরার মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারলে ক্ষতস্থানের রক্ত সহজে জমাট বেঁধে যাবে এবং অল্প সময়ের ভেতরে রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু শিরার ভেতরে কেমন করে ওষুধকে ঢোকানো যাবে?

আবার শুরু হলো চিন্তাভাবনা। শিরা ছিদ্র করে কেমন করে শিরার ভেতরে রক্তের সাথে মিশিয়ে দেবেন ওষুধ। শেষে ঠিক করলেন, পিচকারি এবং পিচকারির মাথায় ফাঁপা সূচ লাগিয়ে এই ব্যবস্থাটা করা যেতে পারে।

এবার শুরু করলেন পিচকারি তৈরি করতে। যেমন তেমন পিচকারী হলে তো হবে না! আবার সূচটাকেও হতে হবে বিশেষ ধরণের। পিচকারির মাথায় পরাবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও রাখতে হবে।

গাব্রিয়েল কী করলেন! বন্দুকের নলকে কেটে একটা পিচকারি খাড়া করলেন। তারপর সাধারণ এক মিস্ত্রীকে নির্দেশ দিয়ে বানিয়ে আনলেন লোহার সূচ।

নবাবিষ্কৃত ওষুধটি এবার প্রয়োগের পালা। প্রথম তো আর মানুষের দেহে প্রয়োগ করা যায় না! তাই গাব্রিয়েল এক ঘোড়ার উপরই চালালেন পরীক্ষা। যদিও ভোঁতা যন্ত্রে ইনজেকশন দিতে কষ্ট হলো, তবু ফল ভাল

পেলেন। বুঝতে পারলেন ওষুধটি মানুষের দেহে প্রয়োগ করলে কোন বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হবে না।

দিন যায়। গাব্রিয়েলের চিকিৎসা পদ্ধতি বেশ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তখন অন্যান্য চিকিৎসকরাও এগিয়ে এলেন গাব্রিয়েলের পদ্ধতিতে চিকিৎসা করতে। তাঁরাও সিরিঞ্জ বানালেন, সূচ বানালেন। কিন্তু গাব্রিয়েল যে সতর্কতা অবলম্বন করতেন—তা তাঁরা করতেন না। ফলে হিতে বিপরীত হলো। অনেক ক্ষেত্রে রোগীর প্রাণ নিয়ে শুরু হলো টানাটানি।

হবে নাইবা কেন, ? তাঁরা যে সূচ ব্যবহার করতেন, তাতে কয়েকদিনের ভেতরেই মরিচার আস্তরণ পড়ে যেতো। মরিচা ধরতো লোহার সিরিঞ্জেও। ভালভাবে পরিষ্কার করার কথা কেউ চিন্তা করতেন না। ফলে দোষী সাব্যস্ত হলেন গাব্রিয়েল। চিকিৎসকরা একযোগে প্রতিবাদ জানালেন, গাব্রিয়েলের পদ্ধতি ভুল এবং এই পদ্ধতিতে চিকিৎসা করলে রোগীর মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

পরিত্যক্ত হলো গাব্রিয়েলের পদ্ধতি। গাব্রিয়েলও একদিন ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করলেন। কিন্তু অজস্র দুর্নাম মাথায় করে বেঁচে রইলো তাঁর ইনজেকশনের সরঞ্জাম।

একদিন বিশ্ববিজ্ঞানের রঙ্গমঞ্চে দ্বাদশ সূর্যের দীপ্তি নিয়ে আবির্ভূত হলেন লুই পাস্তুর, পরিণত বয়সে আবিষ্কার করলেন জলাতঙ্ক রোগের সিরাম। কিন্তু এই সিরামকে রোগীর দেহে কেমন করে প্রবেশ করাবেন? সহসা তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো গাব্রিয়েলের সেই অবহেলিত পদ্ধতিটা। পাস্তুর শ্রদ্ধার সঙ্গে তুলে নিলেন সেই সরঞ্জামটা এবং নিজের মত করে নিখুঁত করে নিলেন। তারপর নিজেই শুরু করলেন ইনজেকশন দিতে।

এবার আর কেউ প্রতিবাদ করলেন না। সবাই স্বীকার করলেন, ক্ষ্যাপা কুকুর কামড়ালে সিরাম ইনজেকশন করা ছাড়া দ্বিতীয় কোন উপায় নেই।

এতদিনে ব্যবসায়ীরা লাভের গন্ধ পেলেন। বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংস্থা এগিয়ে এলেন পিচকারি এবং সূচ তৈরি করতে। তাঁদের হাতে পড়ে পিচকারী ও সূচ উভয়েরই রূপান্তর ঘটলো। তৈরি হলো ঝকঝকে মসৃণ ও সরু সূচ।

ডাক্তারদের ভেতরে যতই ইনজেকশন দেওয়ার সরঞ্জাম জনপ্রিয় হয়ে উঠলো, ততই ব্যবসায়ী মহলে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গেল যেন। জার্মানীর একটি বাণিজ্য সংস্থা টেক্কা দিল সবার উপরে। কাঁচের পিচকারি বা সিরিঞ্জ তৈরি করে ফেললো এবং তৈরি করলো অতি উন্নত মানের সূচ। বর্তমানে এই ব্যবস্থার আরও কত উন্নতি ঘটেছে। অথচ এর মূলে রয়েছে সেই মানব দরদী বিজ্ঞানী গাব্রিয়েলের অবদান। ইনজেকশন গ্রহণের সময় আমরা ক'জন বা তাঁকে স্মরণ করি?

✪ ফাউন্টেনপেন ও বলপেন ✪

'পেন' ইংরেজী শব্দ। এসেছে ল্যাটিন 'পেন্না' নামক শব্দটি থেকে। পেন্না অর্থে "পাখীর পালক"। সম্ভবতঃ কলম বা পেন হিসেবে দীর্ঘকাল পাখীর পালকের ব্যবহার অব্যাহত ছিল বলে অনুরূপ নামকরণ হয়েছে।

সভ্যতার একেবারে শুরুতে—যেদিন মানুষ তার ভাবনাচিন্তাগুলোকে লিপির মাধ্যমে ধরে রাখতে চেয়েছিল সেইদিনই পরিকল্পনা করেছিল কলমের। প্রথম প্রথম এই কলম ছিল পাথরের সরু সরু ফলক, সরু করে ছাঁটা গাছের ডাল, ইত্যাদি। তখনও অবশ্য কাগজ আবিষ্কৃত হয়নি। পাথরের উপর, মাটির ফলকের উপর, গাছের শক্ত ছালের উপর আঁচড় কেটে কেটে লিখতেন লিপিকররা। চীনের পণ্ডিতেরা আবার কচ্ছপের খোলের উপর লিখতেন।

প্রথম প্রাচীন মিশরই প্যাপিরাসের উপর লিখতে গিয়ে এক ধরণের কলম আবিষ্কার করেছিলেন। অনেকটা আজকের মত ব্রোঞ্জের নিব তৈরি করে গুঁজে দিতেন বা বেঁধে দিতেন কোন একটা সরু ও ছোট গাছের ডালের সঙ্গে। মধ্যযুগে কাগজ আবিষ্কৃত হলেই পাখীর পালককে কলম হিসেবে ব্যবহারের সূচনা হয়।

১৭৮০ খ্রীস্টাব্দেই সম্ভবতঃ প্রকৃত কলমের আবির্ভাব ঘটে। এই সময় কলমের ডগায় লাগানো হয় ইস্পাতের বা পেতলের নিব।

নিব কলমকে দোয়াতের কালিতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে লিখতে হতো। মাঝে মাঝে অসুবিধাও হতো। কাগজে কালি পড়ে যেতো, লেখা মোটা-সরু হতো, হাতে কালি লেগে যেতো, ইত্যাদি। এই অসুবিধাগুলোকে দূর করতেই ফাউণ্টেনপেনের পরিকল্পনা। যদিও বিংশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ পর্যন্ত নিব-কলমের ব্যবহার ব্যাপক ছিল। এখনও যে আদৌ চোখে পড়ে না এমন নয়।

ফাউণ্টেন পেন আবিষ্কৃত হয়েছে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দে। আবিষ্কারক এল. ই. ওয়াটারম্যান নামে জনৈক মার্কিন প্রযুক্তিবিদ। সেদিন ঐ ফাউণ্টেন পেনের নিবটা তৈরি হতো চল্লিশ ক্যারেটের সোনা দিয়ে এবং নিবের ডগায় এঁটে দেওয়া হতো ইরিডিয়ামের ছোট একটা বলের মত। এর দাম প্রচুর ছিল বলে সাধারণে ব্যবহার করতে পারতেন না। সেই অল্প দামের নিব-কলমটা চলে আসছিল।

পরের দিকে সস্তায় ফাউণ্টেন পেন তৈরির প্রচেষ্টা চলে। এবং সস্তায় ফাউণ্টেন পেন উৎপাদন করে জাপান। তারপর থেকে প্লাস্টিক শিল্পের উন্নতি হলে পেনে পেনে বাজার ছেয়ে যায়।

সস্তার ফাউণ্টেন পেনগুলোর অসুবিধাও ছিল। কালি ঝরতো, জামার পকেটে কালি পড়ে জামাকে বিশ্রী করে ফেলতো, হাতেও কালি লাগতো। অপর-দিকে কালির দোয়াতকেও বারে বারে ব্যবহার করতে হতো। তাছাড়া নিব ভাল

না হলে লেখাও ভাল হয় না। আর ভাল নিব এবং ভাল ফাউণ্টেন পেন কিনতে খরচও বেশী।

ফাউণ্টেন পেনের অসুবিধাগুলো দূর করতে বলপেনের পরিকল্পনা।

প্রথম বলপেন আবিষ্কার করেন একজন মার্কিন নাগরিক নাম জন লাউড। ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দেই আবিষ্কার করেছিলেন। একটা কৈশিক নলের মুখটাকে সরু করে পরিয়ে দিয়েছিলেন বল বেয়ারিং। নলটাকে কালিতে ভর্তি করে কাগজের উপর চেপে লিখতে গেলে বলটা ঘুরতো এবং কৈশিক আকর্ষণের ফলে ফাঁক দিয়ে কালি বেড়িয়ে আসতো কাগজে।

আসলে লাউড আবিষ্কৃত এই বল পেন দিয়ে ভালভাবে লেখা চলতো না। একেবারে ভোঁতা যন্ত্র। বলপেনের উপযোগী কালিও তিনি তৈরি করতে পারেন নি। লিখতে গেলে মোটা ধ্যাবড়া ধ্যাবড়া অক্ষর হতো, তরল কালিতে কাগজে জাব্‌ড়া হয়ে উঠতো, কালিও শুকিয়ে যেতো না। মোটামুটি কাগজে লেখার সম্পূর্ণ অযোগ্যই ছিল। কাপড়, চামড়া ইত্যাদির উপর লিখতে সুবিধে হতো বলে মাঝে মাঝে কেউ কেউ ব্যবহার করতেন।

লাউডের বলপেন কাগজে লেখার পক্ষে অযোগ্য হলেও কারিগরি কৌশলটা কিন্তু তাঁরই আবিষ্কার। তবে আজকে আমরা যে সব ডট পেন বা বল পেন ব্যবহার করছি তার আবিষ্কারক হাঙ্গেরীর দুই ভাই ল্যাজলো বিরো এবং জর্জ বিরো। ল্যাজলো ছিলেন শিল্পী আর জর্জ ছিলেন এক রসায়নবিদ। লাউডের পদ্ধতিটা ল্যাজলোর খুব মনে ধরেছিল। তাই ভাইকে বললেন বিশেষ ধরণের কালি তৈরি করতে যা কৈশিক নলের ভেতরে বেশ গাঢ় হয়ে থাকবে এবং কৈশিক আকর্ষণে প্রয়োজন মত বেরিয়ে আসবে। আর শুকিয়েও যাবে সঙ্গে সঙ্গে।

উঠে পড়ে লেগে গেলেন দুই ভাই। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তৈরি করে ফেললেন কাগজে লেখার উপযোগী বলপেন। পলিথিন দিয়ে তৈরি করলেন আরও সরু কৈশিক নল। মুখে লাগালেন ধাতুর তৈরি নিবের মত জিনিস এবং তার ভেতরে লাউডের তুলনায় অনেক অনেক ছোট বল। রাসায়নিক ছিলেন বলে জর্জ বিরোর তেমন ঘন ও আঠালো কালি তৈরি করতেও অসুবিধা হলোনা। দুভাই এবার ব্যবসা ফেঁদে বসলেন।

ইওরোপে যুদ্ধের তাণ্ডব যখন শুরু হলো তখন দু-ভাই নির্বিঘ্নে যাতে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারেন—তার জন্য চলে গেলেন আর্জেণ্টিনায় এবং সেইখানেই লোকজন লাগিয়ে উৎপাদন করতে লাগলেন প্রচুর পরিমাণে ডট ও ডট পেন। এর সুবিধা লক্ষ্য করে একেবারে লুফে নিল সবাই। বিশেষ করে মার্কিন সৈন্যবাহিনী লেখা-জোখার কাজে কোন কিছুকে ব্যবহার না করে ঐ পেনকেই তুলে নিলেন। সুবিধা কত! কালি বহন করার ঝামেলা নেই, লিখতেও আরাম, কালিও ঘন। কালি শেষ হয়ে গেলে আর একটা রিফিল তুলে নাও। দামটাও নামে মাত্র।

বল পেনের সুখ্যাতিতে এবার ভরে গেল দুনিয়া। সারা পৃথিবীতে শুরু হয়ে গেল ওর ব্যবহার। বর্তমানে ফাউণ্টেন পেনের ব্যবহার সীমিত আর বলপেনের

বাজার রমরমা। যতদিন যাচ্ছে, ততই ওর ব্যবহার বেড়ে চলেছে। এর থেকেও সুন্দর ও সহজে লেখার সরঞ্জাম আবিষ্কৃত না হওয়া পর্যন্ত ওর বাজার মন্দা হবে না।

✪ আয়না ✪

আয়না আমাদের নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলোর মধ্যে অন্যতম। এমন কোন ঘর খুঁজে পাওয়া যাবে না—যেখানে মুখ দেখার জন্য একটুকরা আয়না নেই। একে মানুষ ব্যবহার করেও আসছে দীর্ঘকাল।

পৃথিবীতে মানুষ যেদিন নগর সভ্যতার পত্তন করেছিল সেইদিনই নিজের অবয়বটাকে দেখার জন্য বিশেষ বিশেষ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল। আরন্যক যুগের তথা প্রস্তর যুগের মানুষ নিজের অবয়বটা দেখতো কোন স্থির জলাশয়ের জলে। উপুড় হয়ে জল খেতো বলে মুখের ছায়া পড়তো জলে।

নগর সভ্যতার যুগে প্রয়োজন অপেক্ষা বিলাসের তাগিদে তথা অঙ্গসজ্জার নিমিত্ত আয়না তৈরি হয়েছিল। সে আয়না তৈরি হতো ধাতু দিয়ে। বিশেষ করে রূপা, তামা বা কাঁসার মোটা মোটা পাতকে মসৃণ ও চকচকে করা হতো এবং একটা দণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করা হতো। ধনীরা ব্যবহার করতেন রূপোর আয়না।

কাচের আয়না কিন্তু অনেক পরের ঘটনা। যদিও কাচ আবিষ্কৃত হয়েছে বহু আগে। কবে, কীভাবে যে কাচ মানুষের হাতে এসেছে—তা বলার কোন উপায় নেই। অনেকের ধারণা, মানুষ নব্য প্রস্তর যুগেই কাচের সন্ধান পেয়েছিল। অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় সাত-আট হাজার বছর আগে মানুষ কাচকে আবিষ্কার করেছিল। পণ্ডিতদের অনুমান, সোডিয়াম লবণ মিশ্রিত বালুকাস্তূপের পাশে বজ্রপাতের ফলে সৃষ্ট কাচ দেখে মানুষ কাচ তৈরির অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল।

যাই হোক না কেন, কাচশিল্পে উন্নতি লাভ করেছিল প্রাচীন মিশর। তারা রঙীন কাচ তৈরি করতো বটে, তবে কাচের তৈরি প্রকৃত আয়না তারা প্রস্তুত করতে পারেনি।

কাচের তৈরি আয়না কে কবে যে তৈরি করেছিলেন তা সঠিকভাবে বলা যাবে না। তবে পরিকল্পনাটা অনেকদিনের। কোন এক সময়ে কোন এক শিল্পী স্বচ্ছ কাচখণ্ডের একদিকে টিনের পাত জুড়ে দিয়ে এবং তার উপর পারদ ঢেলে দিয়ে তৈরি করেছিলেন আয়না। তাতে টিনের পাতটা পারদের স্পর্শে গলে গিয়ে একেবারে লেপ্টে যেতো এবং এই ধরণের আয়নার প্রচলন ছিল প্রায় ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত। পরে ইতালীয় বিজ্ঞানী লিবিগ কাচখণ্ডের এক পাশে রূপার আস্তরণ ফেলে এবং ঐ আস্তরণটার উপর লাল রঙের প্রলেপ দিয়ে তৈরি

করেছিলেন আধুনিক আয়না। পূর্বাপেক্ষা এই আয়না প্রস্তুত সহজ ছিল এবং প্রলেপটাও হলো দীর্ঘস্থায়ী। ফলে ভেঙ্গে গেলেও আয়না আয়নাই থাকতো।

কথিত আছে, এই আয়নার চাহিদা হয়েছিল প্রচুর। তাই সেদিন ইতালি আয়না তৈরি করে প্রচুর অর্থ ঘরে এনেছিল। সারা পৃথিবীটা ছিল সেই আয়নার খদ্দের। দীর্ঘকাল ধরে চুটিয়ে ব্যবসা করার জন্য তৈরির কৌশলটা একেবারে গোপন রেখেছিল। কোন কারিগরের দ্বারা কৌশলটা যাতে ফাঁস হয়ে না যায় তার জন্য কঠোর ব্যবস্থাও অবলম্বন করেছিল। সাজা হিসেবে স্থির হয়েছিল মৃত্যুদণ্ড। আর যদি কোন কারিগর বিদেশে পালিয়ে যায় তাহলে তার পরিবারের সবার জন্য মৃত্যুদণ্ড বহাল হয়েছিল। আয়না তৈরিও হতো গোপনে—একটা দ্বীপে।

এত করেও ইতালি পারেনি আয়না তৈরির কৌশলকে নিজেদের ভেতরে চেপে রাখতে। আয়নার যখন রমরমা বাজার, তখনই অনেক দেশ ইতালির অনুরূপ আয়না প্রস্তুত করতে সচেষ্ট হয়। সেই সব দেশের মধ্যে ফ্রান্স ছিল অন্যতম। হাজার চেষ্টা করেও যখন পারলোনা, তখন ভেনিসে ফ্রান্সের রাষ্ট্রদূতের কাছে গোপনে খবর গেল, যেমন করে হোক দু-একজন আয়না তৈরির কারিগরকে ফ্রান্সে পাঠাতে হবে।

রাষ্ট্রদূত চিন্তিত হলেন বটে, তবে হাল ছাড়লেন না। প্রচুর অর্থ দিয়ে বস করলেন এক কারিগরকে। রাতের অন্ধকারে সেই কারিগরের পরিবারের সবাইকে এক ফরাসী নৌকা তুলে নিয়ে চলে গেল ফ্রান্সে। বলা বাহুল্য ফ্রান্সও এবার শুরু করলো আয়না তৈরি করতে। তবে ইতালির মত সে কৌশলটাকে চেপে রাখতে চেষ্টা করেনি। অচিরেই সেই কৌশল ছড়িয়ে পড়ে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে।

✪ পেনসিল ✪

অনেক—অনেকদিন আগেকার কথা। ইংলিশ লেক জেলায় পাহাড় আর বনে ভরা একটা অঞ্চল ছিল। অঞ্চলটার নাম বারডেল। সেখানে লোকবসতি তেমন ছিল না। রাখাল বালকরা দৈনিক মেষ চরাতে যেতো সেখানে।

একবার হলো কী! অঞ্চলটার উপর দিয়ে বহে গেল প্রবল ঝড়। কত গাছের ডালপালা ভেঙ্গে গেল এবং কত গাছ গাছালি শেকড় সমেত উপড়ে পড়ে গেল মাটিতে।

ঝড়ের পরে রাখাল বালকরা বনে মেষ চরাতে গিয়ে এক জায়গায় দেখলে, মস্ত বড় একটা গাছ শেকড় বাকড় উপরে তুলে শুয়ে আছে মাটিতে আর তলায় সৃষ্টি হয়েছে একটা গর্তের মত। সেই গর্তটার ভেতরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে

অজস্র কালো অথচ চকচকে কী সব পদার্থ। রাখাল বালকরা এমন জিনিস কখনো দেখেনি। তারা কৌতূহলী হয়ে বেশ কয়েকখানা কুড়িয়ে আনলে। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলে, পাথরের গায়ে ঘষে ঘষে পরখ করলে, হাতেও ঘষলে কেউ কেউ। খুব তেলতেলে এবং মসৃণও।

রাখাল বালকরা জিনিসটাকে সনাক্ত করতে পারলে না। তবে বুঝতে পারলে, সোনারূপার মত মূল্যবান কিছু নয়। শুধু কোথাও ঘষলে চমৎকার কালো দাগ পড়ে এবং সে দাগকে সহজে মুছে ফেলা যায় না। তখন বুদ্ধি করে তারা দু-একটি করে সংগ্রহ করলে আর পরস্পরের ভেড়াদের যাতে সনাক্ত করতে অসুবিধা না হয় তার জন্য যে যার ভেড়ার গায়ে ইচ্ছে মত এক একটা করে চিহ্ন এঁকে দিলে।

ব্যাপারটা ঘটেছিল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর দিকে। পরে ঐ রাখালদের মাধ্যমে অদ্ভুত সেই জিনিসটার কথা ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। তখন শিল্পীরাই ছবি আঁকার জন্য লুফে নিলেন জিনিসটাকে।

এইভাবে চলে আসছিল অনেককাল। কেউ নাম জানতো না, সম্ভবতঃ কেউ জানারও চেষ্টা করেননি। পরে রসায়নবিজ্ঞানের উন্নতি ঘটলে মানুষ বুঝতে পারলে, চকচকে কালো ও মসৃণ এই পদার্থটি কয়লারই একটি রূপভেদ। ওর সাহায্যে লেখা যায় বলে নাম স্থির হলো গ্রাফাইট। এটি গ্রীক শব্দ এবং শব্দটির অর্থ 'আমি লিখি'। কতকাল পরে মাত্র ১৭৮৯ খ্রীস্টাব্দে নামকরণ হয়েছে। ওকে আগে বলা হতো 'ব্ল্যাক লেড' বা কালো সীসে। সীসে অবশ্য ধাতু। দেখতে নীলাভ সাদা এবং সীসে যে কোন জায়গায় কালো দাগ ফেলতে পারে। সীসের মত এটিও কালো দাগ রেখে যায় এবং কালো রঙের, তাই অনুরূপ নামকরণ হয়েছিল।

প্রথম প্রথম গ্রাফাইটের ঐ একটি গুণ ধরা পড়লেও পরের দিকে ওর অজস্র গুণের কথা প্রকাশ পায়। মাটির পাত্রের উপর চকচকে প্রলেপ দিতে, মরিচা রোধের জন্য লোহার পায়ে আস্তরণ ফেলতে, তাপসহা ধাতুগলনের পাত্র তৈরি করতে, তড়িৎ দ্বার হিসেবে, ইত্যাদি অনেক ক্ষেত্রে গ্রাফাইটের ডাক পড়লো। প্রতিটি দেশ এবার বুঝতে পারলে, গ্রাফাইটের খনি জাতীয় সম্পদ বিশেষ। হেলা ফেলার বস্তু নয় এবং খেয়াল খুশি মত ওকে ব্যবহার করাও উচিত নয়। তাই যেখানেই গ্রাফাইটের খনি আবিষ্কৃত হলো, সেইখানেই সংরক্ষণের কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হলো।

এতকাল মানুষ এক একটা আস্ত গ্রাফাইটের টুকরাকেই লেখার কাজে ব্যবহার করতো। কিন্তু চাহিদা বাড়ায় এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা হওয়ায় আর সহজলভ্য হলো না। কিনতে গেলে দামও লাগলো যথেষ্ট। তাই বলে লেখার এমন এক সুন্দর উপাদানকে পরিত্যাগ করতে পারলে না। প্রচেষ্টা চললো কম গ্রাফাইট খরচ করে লেখার এই উপাদানটাকে ঠিক রাখা। আর তখনই শুরু হলো পেনসিল তৈরির ভাবনা।

প্রথমে পেন্সিল উৎপাদন করেছিল জার্মানীর নুরেনবার্গের একটি ব্যবসায়িক

সংস্থা। গ্রাফাইট চূর্ণ করে সালফার বা গন্ধকের সাথে মিশিয়ে তৈরি করেছিল সরু ও লম্বা শিষ। শিষটা যাতে লিখতে লিখতে ভেঙ্গে না যায়—তার জন্য ঐ শিষটাকে কাঠের আবরণের ভেতরে আঠা দিয়ে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। অনেকটা আজকের পেন্সিলের মতই দেখতে ছিল।

সব দেশে লেখার এই সহজ সরঞ্জামটার চাহিদা ছিল প্রচুর। অফিসে-আদালতে, স্কুলে-কলেজে এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও ওর ডাক পড়লো। নেপোলিয়নের রাজত্বকালে সব সময় যুদ্ধবিগ্রহ চলতো বলে দরকার হতো রাশি রাশি পেন্সিল। কিন্তু এত পেন্সিলের উপাদান সেই গ্রাফাইট পাওয়া যাবে কোথায়?

নেপোলিয়ন নিজেই চিন্তিত হলেন। নিকোলাস জ্যাক্স্ বাঁতে নামে এক বিজ্ঞানীকে নির্দেশ দিলেন, যেমন করে হোক নামে মাত্র গ্রাফাইট খরচ করে তিনি যেন লেখার পেন্সিল উদ্ভাবন করেন।

বাঁতে নেপোলিয়নের আদেশ এবং আর্থিক সাহায্য পেয়ে শুরু করলেন পরীক্ষা নিরীক্ষা। অবশেষে স্বল্প গ্রাফাইট চূর্ণের সঙ্গে এক জাতীয় কাদা মিশিয়ে এবং পরে পুড়িয়ে নিয়ে তৈরি করলেন এক অনবদ্য পেন্সিলের শিষ। ওতে লেখা আরও ভাল হলো এবং গ্রাফাইটের খরচও কমলো।

বাঁতের পদ্ধতিকে নিয়ে পরের দিকে গবেষণা করেন ভিয়েনার হার্টমুথ নামে এক বিজ্ঞানী। তিনিই কাদা এবং গ্রাফাইট চূর্ণের অনুপাত বাড়িয়ে ও কমিয়ে তৈরি করেন হার্ড পেন্সিল ও সফ্‌ট পেন্সিল।

✪ রক্ত পরিশোধন বা ডায়ালিসিস ✪

মানবদেহের একটি অপরিহার্য অঙ্গ তার কিডনী। প্রত্যেকেরই দেহের কিডনীর সংখ্যা দুই। তবে একটিও কারও কারও থাকতে পারে। দুটির বদলে মাত্র একটি কিডনী থাকলেও শরীরের কোন অসুবিধা হয় না।

কোন কোন সময় কঠিন কোন রোগের আক্রমণে মানুষের দুটি কিডনীই অকেজো হয়ে যায়। এর ফলে রক্তে বর্জ্য পদার্থের পরিমাণ ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে এবং রোগীও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। এই নিয়ে চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা দীর্ঘকাল মাথা ঘামিয়ে আসছিলেন। পরিশেষে শল্য চিকিৎসার অভূতপূর্ব উন্নতি ঘটলে তাঁরা কোন সুস্থ দেহের দুটি কিডনীর একটিকে নিয়ে রোগীর দেহে অধিরোপন করার কথা ভাবেন।

পদ্ধতিটিকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে গিয়ে নানা অসুবিধার সম্মুখীন হলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। প্রথমত মানবদেহে একটি কিডনী যথেষ্ট হলেও কেউ কিডনী দান করতে সম্মত হন না। দ্বিতীয়ত একের কিডনী অন্যের দেহে অধিরোপন করা হলে রোগীর দেহে অধিকাংশক্ষেত্রে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়া হয়। তার

ফলে সংযোজিত কিডনীটা যেমন নষ্ট হয়ে যায় তেমনই রোগীও মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। কেবলমাত্র সমকোষী যমজের ক্ষেত্রে এমনটি হয় না।

অতঃপর বিজ্ঞানীরা অধিরোপনের পরিবর্তে বিকল্প ব্যবস্থার কথা চিন্তা করেন। তাঁরা স্থির করলেন, কিডনীর পরিবর্তে কোন কৃত্রিম উপায়ে যদি রক্ত থেকে বর্জ্য পদার্থগুলোকে নিষ্কাশন করে নেওয়া যায় তাহলেও কাজ হবে। অর্থাৎ এমন এক কৃত্রিম কিডনীর পরিকল্পনা করতে হবে—যার সাহায্যে রক্তের বর্জ্য পদার্থগুলোকে সরিয়ে নেওয়া যাবে এবং রক্ত পরিশুদ্ধ হবে।

এর জন্য অর্থাৎ কৃত্রিম কিডনী যন্ত্র তৈরির জন্য একটা বিশেষ পর্দার কথা চিন্তা করলেন বিজ্ঞানীরা। এমন এক অর্ধভেদ্য পর্দা হবে, যা জল ও বর্জ্য পদার্থ-গুলোর ক্ষেত্রে হবে ভেদ্য, অথচ রক্তের ক্ষেত্রে হবে অভেদ্য।

বিস্তর খোঁজাখুঁজির পর তেমন একটা পর্দার হদিস পেলেন বিজ্ঞানীরা এবং ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে বিভিন্ন প্রাণীরদেহে পরীক্ষামূলকভাবে রক্ত পরিশোধণ বা ডায়ালিসিস করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন তাঁরা। ব্যর্থ হওয়ার বড় কারণ ঐ পর্দাটাই। অর্থাৎ যেমনটি আশা করেছিলেন তেমনটি হলো না। অভেদ্য থাকলো না রক্তের কাছে এবং রক্ত তঞ্চনও বন্ধ করতে পারলেন না।

বিজ্ঞানীরা কিন্তু ব্যর্থতা বরণ করে থেমে গেলেন না। বরং ব্যর্থতা ঢাকতে নব নব প্রচেষ্টার সূত্রপাত করলেন। তারপর ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে হেপারিন আবিষ্কৃত হলে তাঁরা কিছুটা আলোর সন্ধান পেলেন। রক্ত তঞ্চন বন্ধ করার কাজে হেপারিন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করলো। ঠিক তারই পরের বছর অর্থাৎ ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে আবিষ্কৃত হলো অর্ধভেদ্য পর্দারূপে সেলুলোজ মেমব্রেন।

পদ্ধতিটি কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পর ১৯৪৩ খ্রীস্টাব্দে প্রথম মানবদেহে প্রয়োগ করলেন বিজ্ঞানীরা। এবার ব্যর্থ হতে হলো না। রোগী আরোগ্য লাভ করলেন। এবং অতি অল্পদিনের ভেতরে ডায়ালিসিস জনপ্রিয় হয়ে উঠলো।

বর্তমানে পর্দার আরও উন্নতি হয়েছে। এখন ব্যবহার করা হচ্ছে সেলুলোজ অ্যাসিটেট, পলি অ্যাসিটেট কোলাজেন প্রভৃতির অর্ধভেদ্য পর্দা। আবিষ্কৃত হয়েছে ডায়ালিসিস করার দুটি কৃত্রিম কিডনী যন্ত্র। একটির নাম কলফ ডাবল কয়েল কিডনী এবং অপরটি কিল ফ্ল্যাট প্লেট কিডনী। তবে হ্যাঁ, কোন পদ্ধতি স্থায়ী ব্যবস্থা নয়। রোগীকে প্রতি সপ্তাহে একবার করে রক্ত পরিশোধন বা ডায়ালিসিস করতে হয়।

✪ কাঠের মণ্ড থেকে কাগজ ✪

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় এক গবেষণা পাগল মার্কিন রসায়নবিদ বাধ্য হয়ে যুদ্ধে যোগদান করেছিলেন। নাম তাঁর বেঞ্জামিন টিলঘ্‌ম্যান।

যুদ্ধ শেষ হলো ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে। ঘরে ফিরলেন ট্রিলঘ্‌ম্যান। কিন্তু গবেষণার নেশা এত প্রবল ছিল যে, যুদ্ধ থেকে ফিরেই শুরু করেছিলেন গবেষণা। আগে থেকেই ঘরে একটা ছোট্ট ল্যাবোরেটারি তৈরি করে নিয়েছিলেন, তাই গবেষণার কোন অসুবিধা হলো না। অপরদিকে যুদ্ধক্ষেত্রগুলোতে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর যেন অবসাদ এসেছিল। তাই তিনি নির্জনতাকেই বেছে নিলেন। অনেকটা উদ্দেশ্যবিহীনভাবে রাসায়নিক পদার্থগুলো একটিকে অন্যটির সাথে মিশিয়ে লক্ষ্য করতেন কোন পরিবর্তন আসে কিনা।

ট্রিলঘ্‌ম্যানের এক ভাই ছিলেন। নাম তাঁর রিচার্ড। রিচার্ডও এককালে রসায়ন নিয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। কিন্তু গবেষণার দিকে তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না। তিনি ছিলেন বেশ আমুদে এবং দাদার প্রতি শ্রদ্ধাও ছিল যথেষ্ট। তাই দাদার ল্যাবোরেটারিতে মাঝে মাঝে ছুটে আসতেন আর জুড়ে দিতেন গল্প। দাদাও রিচার্ডকে দেখলে হাতের কাজ ফেলে রেখে মুখোমুখি হতেন।

সেদিন সন্ধ্যায় ট্রিলঘ্‌ম্যান একটা কাচের পাত্রে সালফিউরাস অ্যাসিডের সঙ্গে একটু একটু করে চুন মেশাচ্ছিলেন এবং সরু একটা কাঠি দিয়ে নাড়ানাড়ি করছিলেন। ঠিক সেই সময় রিচার্ড এসে হাজির। ট্রিলঘ্‌ম্যান খুশি হয়ে ভাইয়ের দিকে ফিরে বসলেন। কাচের পাত্রে পড়ে রইল সালফিউরাস অ্যাসিডে গোলা চুন এবং কাঠিটা।

গল্প করতে করতে ট্রিলঘ্‌ম্যান ভুলে গেলেন তাঁর পরীক্ষার কথা। এক সময় ঘরের ভেতর থেকে খাওয়ার ডাক এলো। ভাই-র সাথে সমানে গল্প করতে করতে ট্রিলঘ্‌ম্যান বসে গেলেন খাওয়ার টেবিলে। এবার ট্রিলঘ্‌ম্যানের স্ত্রীও যোগ দিলেন গল্পে।

গল্পে গল্পে রাত হলো। ট্রিলঘ্‌ম্যান আর ল্যারোরেটারিতে ঢুকলেন না। সোজা বিছানায় শুয়ে পড়লেন।

পরদিন সকালে কাচপাত্রটাকে পরিষ্কার করতে গিয়ে অবাক হলেন ট্রিলঘ্‌-ম্যান। এখানে থকথকে সাদা মণ্ড এলো কেমন করে? গতকালের কথা ভাবলেন মনে মনে এবং মণ্ডটার সম্বন্ধেও চিন্তা ভাবনা করলেন। এক সময় বুঝতে পারলেন, সালফিউরাস অ্যাসিড, চুন আর সেই নাড়াচাড়া করার কাঠিটা—সব মিলে তৈরি হয়ে গেছে মণ্ড।

যে সময়কার কথা বলা হচ্ছে, সে সময় কাগজ সহজ লভ্য ছিল না। হাতে তৈরি কাগজের প্রচলন ছিল এবং সে কাগজ তৈরি হতো ছেঁড়া কাপড় ইত্যাদির মণ্ড থেকে। ট্রিলঘ্‌ম্যানের ধারণা হলো, এই মণ্ডটাও অনেকটা সেই কাগজের মণ্ডের মত এবং এই মণ্ড থেকেও কাগজ তৈরি সম্ভব।

উত্তেজনায় যেন কাঁপতে লাগলেন ট্রিলঘ্‌ম্যান। ডাকলেন ভাই রিচার্ডকে। খুলে বললেন সব কথা। অবশেষে বললেন, যদি নরম কাঠের কুচিকে এইভাবে মণ্ড তৈরি করে নেওয়া যায় তাহলে খুব কম দামে কাগজ বাজারে ছাড়তে পারা যাবে। লাভও হবে প্রচুর।

এবার দু-ভাই লেগে গেলেন পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে। সেই সালফিউরাস অ্যাসিডের সাথে চুন মিশিয়ে নরম নরম কাঠের টুকরো ফেললেন। কাঠ গলে গিয়ে মণ্ডের আকার ধারণ করলো। এবার মণ্ডটাকে পরিষ্কার করতে গরম বাষ্প পাঠালেন এবং অতিরিক্ত অ্যাসিডকে বার করে আনতে জলে ধৌত করলেন। মণ্ডটি তেমনই থেকে গেল এবং পরিষ্কারও হলো।

এবার মণ্ড থেকে কাগজ তৈরির পালা। দুভাই বুদ্ধি খাটিয়ে একটা যন্ত্র এবং ভারি একটা রোলার তৈরি করে নিলেন। তারপর রোলারের তলায় মণ্ডটা রেখে যন্ত্রের সাহায্যে রোলার ঘোরালেন।

ট্রিলঘ্‌ম্যানের আশা পূর্ণ হলো। তৈরি হলো আধুনিক কাগজ এবং একই সঙ্গে প্রচুর পরিমানে। সভ্যতার এক নব যুগের ও সূচনা হলো ট্রিলঘ্‌ম্যানের হাতে।

কাচের পাত্র ক্ষয়ে যায় বলে পরের দিকে ওঁরাই সিমেন্টের পাত্র গ্রহণ করে-ছিলেন এবং আরও পরে বহুজনের ও বহু ব্যবসায়ী সংস্থার হাতে পড়ে বিভিন্ন কাজের উপযোগী নানা ধরণের কাগজ তৈরি হয়েছে।